সাহিত্য অঙ্গন
ISSN : 2394 4889
Vol. : VI,
Issue : XI,
January-June 2020
মুখ্য সম্পাদক : জয়গোপাল মন্ডল

সা হি ত্য অ ঙ্গ ন

(SAHITYA ANGAN)
ISSN : 2394 4889
Vol. : VI, Issue: XI, January-June 2020

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক : জয়গোপাল মন্ডল

জয়গোপাল মণ্ডল

অভিষেক টাওয়ার, ব্লক – এ, ৪র্থ তল, ফ্ল্যাট নং-২

কোলাকুশমা, থানা – সরাইঢেলা

ধানবাদ – ৮২৮১২৭

SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literacy Tri-lingual Peer-reviewed Journal
ISSN: 2394 4889
Vol. : VI, Issue: XI, January-June 2020

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A,
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127

© **Jaygopal Mandal**

Cover @ Krishnadhan Acharya

Price : Rs. 100.00

Published By :
Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A,
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127
Phone : 09830633202 / 09570217070
E-mail :joygopalvbu@gmail.com, sahityaangan@gmail.com
Website : www. sahityaangan.com

Advisory Board :

Prof. (Dr.) Tapas Basu, (Retd. Prof.) Kalyani University and Guest Faculty of C.U., Kolkata

Dr. Seema Sinha, H.O.D., Department of English & Dean of Humanities, BBMKU, Dhanbad

Prof.(Dr.) Bikash Roy, University of Gour Banga, Malda, W.B.

Prof. (Dr.) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.

Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata

Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam

Dr. K. Bandyopadhyay, R. S. P. College, Jharia, Jharkhand

Tapas Roy (Poet), Kasba, Kolkata

Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata

Members from the other Countries :

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh)

Md. Masud Mahmud (Dhaka, Bangladesh)

Professor Himadri Sekhar Chakraborty (USA)

Professor Barsanjit Mazumder (USA)

Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

Assistant Editor :

Dr. Kutub Uddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College, W.B.

Dr. Samaresh Bhowmik, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata

Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia

Working Editorial Board :

Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata

Dr. Sampa Basu, Asst. Prof., Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure

Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.

Dr. M. K. Pandey, Department of English, BBMKU, Dhanbad

Dr. Indrajit Kumar, Department of English, BBMKU, Dhanbad

Dr. M. K. Singh, Department of English, BBMKU, Dhanbad
Dr. B. N. Singh, Dept. of Com., B.B.M.K. University, Dhanbad
Dr. R. Pradhan, Dept. of Chem., P. K. R. M. College, Dhanbad
Dr. Sanjay Kumar Singh, Dept. of Hindi, P. K. R. M. College, Dhanbad
Dr. N. K. Singh, Dept. of Hindi, R. S. P. College, Jharia
Dr. D. K. Singh. Dept. of Physics, B.B.M.K. University, Dhanbad
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata- 84
Dipankar Arosh, Assistant Professor, Asansol B. C. College
Panchanan Naskar, Guest Professor, Pathar Pratima Mahavidyalaya
Swapan Pramanik, Guest Professor, Magrahat College

সূচি :

প্রসঙ্গ -- ৯

@ ছোটগল্প

কাযান শহরে এলেন তিনি ------ অমর মিত্র / **১৩**
সনিয়ার সাবান --------ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৮
দেশ গঠনের কাজ -- সৌমিত্র চৌধুরী / ২৬
ফাঁদ ------ গৌতম দে / ৩৪
রাঙিয়ে দিয়ে যাও -- তাপস রায় / ৪৩

@ কবিতা – ১ / ৫১ - ৬১

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় / বীথি চট্টোপাধ্যায় / সায়ন্তনী ভট্টাচার্য / শঙ্কর ঘোষ / বিজয় সিংহ/ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / দিশা চট্টোপাধ্যায় / খেয়া সরকার / স্নেহাংশু বিকাশ দাস / নির্মল সামন্ত / মলয় পাত্র / শান্তনু চক্রবর্তী

@ প্রবন্ধ - ১

লেখকদের খেয়াল -- রবীন বসু / ৬২
কাঙাল কবি ----- সোমা মুখার্জি / ৬৮
জীবনের ভাঙা-গড়াঃ কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় ------ স্বপন প্রামাণিক / ৭২
কবি গণেশ বসুর জীবন : এক ছিন্নমূল মানুষের লড়াই--- নিখিল চন্দ্র মাহাতো/ ৮৪

@ কবিতাগুচ্ছ -১ / ১০৬ - ১২২

গণেশ বসু / মধুশ্রী সেন সান্যাল / নৃপেন চক্রবর্তী / কুমারেশ চক্রবর্তী / মিনতি গোস্বামী / তাজিমুর রহমান

@ প্রবন্ধ - ২

সঙ্গ নিঃসঙ্গতার আখ্যানকার আফসার আমেদ ----- তরুণ মুখোপাধ্যায় / ১২৩
আফসার আমেদের গল্প : নারীর কথা ---- নিরুপম আচার্য / ১২৮
আফসার আমেদের ছোটোগল্প : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে যাত্রা ---- পঞ্চানন নস্কর / ১৩৮
প্রেমে অপ্রেমে আফসার আমেদের গল্প ----- সুবোধ মণ্ডল / ১৪৪
বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চায়েতিরাজ : আফসার আমেদের 'ধ্যানেজ্যোৎস্না'--- অসীম হালদার /১৫৭
আফসার আমেদের ছোটগল্পে অন্তঃপুরের উদভাস -----মনোরঞ্জন নস্কর / ১৬২
বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা : ধর্মমোহ জনশ্রুতি ও মুসলমান সমাজের অন্তরমহল--- চিত্তরঞ্জন নস্কর / ১৮৪

@ কবিতা – ২ / ১৯১ - ২০৩

রবীন বসু / উদয়ন ভট্টাচার্য / তরুণ মুখোপাধ্যায় / সুশীল মণ্ডল /
সুস্মেলী দত্ত / সুমন গুণ / তাপস রায় / বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় /
সৌমিত বসু / দেবারতি ভট্টাচার্য / তনুজা চক্রবর্তী / মজিদ মাহমুদ (বাংলাদেশ)

@ ছোটগল্প - ২

অনুভবে তোমাকে যে চাই ---- দেবযানী বসু কুমার / ২০৪
মিষ্টিমাসির বৌমা ---------চুমকি চট্টোপাধ্যায় / ২০৮
ধারা–বিবরণ-------অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় / ২১২

@ কবিতা – ৩ / ২২০ - ২৩২

সুদীপ্ত মাজি / অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় / সুলেখা সরকার / সুব্রত দাস /
অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় / অরুণিমা / অঞ্জনা দেব রায় / সমরেশ ভৌমিক /
সাহানারা খাতুন / মহ: কুতুবুদ্দিন মোল্লা

@ প্রবন্ধ -৩

স্থির পৃথিবীর খোঁজ : বদলি বসত------------ দীপঙ্কর আরশ / ২৩৩
জঙ্গলমহলের লোকজীবন ও সংস্কৃতি : প্রসঙ্গ নলিনী বেরার গল্প--- উজ্জ্বল প্রামাণিক/ ২৪০

@ কবিতাগুচ্ছ -২ / ২৫০ - ২৭৫

অংশুমান কর / পাপড়ি দাস সরকার / স্বপন রায় / মন্দাক্রান্তা সেন / ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য
/ পাপড়ি ভট্টাচার্য / মঞ্জুশ্রী সরকার /নির্মল করণ / জয়গোপাল মন্ডল / বনশ্রী রায় দাস

@ প্রবন্ধ - ৪

শিল্প ও বিজ্ঞান (লেখক : অ্যাইস্যাক অ্যাসিমভ) -----অনুবাদ : সৌমিত্র চৌধুরী / ২৭৬
বাঙালি মুসলমান সমাজ ইতিহাসের ঘুমভাঙ্গা------ হাবিব আর রহমান / ২৮১

@ মুখোমুখি

সিজার বাগচির মুখোমুখি : প্রসঙ্গ নলিনী বেরা ----মুখোমুখি : উজ্জ্বল প্রামাণিক / ২৯৫

প্রসঙ্গ :

এ এক কঠিন সময়। শুনশান পথঘাট। বটের ঝুরি নিঃসঙ্গ, পাকা পাকা লাল ফল গোটা গোটা। কোনোও পথিকের পদচিহ্ন পড়েনি। নদীতীরে শুয়ে আছে একা নৌকা। নয়নতারার চোখে জল টপটপ করছে। রজনীগন্ধার গন্ধে কেউ উ আহ বলে না। কামিনী একা, একেবারে একা। রাস্তার পিচ এই গরমে বুকে কাউকে পায় না সোহাগ করার মত। আকাশ কিন্তু পরিস্কার। বাতাসে কোনো দুর্গন্ধ নেই, কেবল নিয়ম না মানার উন্মত্ত খবর। পৃথিবী কাঁদছে তার সন্তানদের দুর্দশায়, শ্রেষ্ঠ প্রাণীর দুরবস্থায়। টগর ফুটছে অসংখ্য, পূজারি কই। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর অভাব। নবান্ন উৎসব আছে। নবান্ন থেকে অন্নের সংবাদ প্রচারিত হয়। লক্ষীপেঁচা কোথায় যে ঘোরে তার ঠিকানা পাই না। চামচিকে ঝুলছে ঘরের চৌকাঠ জুড়ে। আতঙ্কের চাদর পরেছে সবাই। চাঁদ ধীরে ধীরে ভাঙছে। শেষে ঘন অন্ধকার। কুচকুচে অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষ। এরপরেই শুক্লপক্ষ। আবার চাঁদ জ্যোৎস্না দেবে। জ্যোৎস্না উঠোনে নাচবে। প্লেগ-এ মরেছিল কোটি মানুষ। এ আর কত কী করবে! ঝড় থেমে যাবে।

সবাই বলছে, ভয়াল মহামারির কবলে পৃথিবী। জীবনানন্দও দেখেছিলেন 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ' (অদ্ভুত আঁধার), 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'(সুচেতনা), 'পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম' (আবহমান) । আহ্নিক গতিতে পৃথিবী গতিশীল। চলতে চলতে কখনো মানুষ হোঁচট খায়। নদী জোয়ারের জলে কখনো উন্মাদ, কখনো ভাটার টানে ফিরে যায় সমুদ্রে। তার মধ্যে ছন্দপতনও ঘটে। এ তো প্রাকৃতিক। যুগে যুগে সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, আবার গড়ে নিয়েছে নিজেকে। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, মানুষের তৈরি। কম ক্ষতি করেছিল? পৃথিবীতে আবার শান্তি এসেছে। বিশ্বায়ন ঘটেছে। এও দিন-রাতের খেলা :

"তবু আলো পৃথিবীর দিকে
সূর্য রোজ সঙ্গে ক'রে আনে
যেই ঋতু যেই তিথি যে-জীবন যেই মৃত্যুরীতি
মহাইতিহাস এসে এখনও জানেনি যার মানে" (যাত্রী / জীবনানন্দ দাশ)

সব ঠিকঠাক চলছিল। কফি হাউসের আড্ডা, রাজনৈতিক তর্জা, হানাহানি, খুনখারাপি। তখন কেউ হিসাব করেনি মৃত্যুর। তখন চলত কেবল দোষারোপ, ঠেলাঠেলি।

আমারও পরিকল্পনা ছিল, বাংলা সাহিত্যের (একালের) অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার অমর মিত্রের পরামর্শ মতো এ সংখ্যা হবে কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদকে নিয়ে। হঠাৎ ঝড় উঠেছে।

উথাল-পাতাল পৃথিবী। দিশেহারা সভ্যতা। সারা বিশ্ব ঘরবন্দি। নানাজনে নানাভাবে দিনগুজরান করছেন। কেউ বলছেন, গার্হস্থ্য সম্পর্কে শুরু হয়েছে হিংসা, কেউ বলছেন, দাম্পত্যশীতে জমছে জীবন। কেউ কেউ হতাশা, বিষাদে। অসংখ্য কাজহারা খেটেখাওয়া দিনমজুর অনাহারে। বিভিন্ন দেশে চলছে সহমর্মিতার নানান চেষ্টা। তার মধ্যে চলছে বিশ্ব-রাজনীতির খেলা, এ দেশেও তথা বঙ্গেও চলছে রাজনৈতিক নোংরামি।

সময় ছেপে রাখে কেউ মনে, কেউ মননে। কবি-সাহিত্যিকরা এক অভিনব পন্থা নিয়েছেন। কেউ লিখছেন 'করোনার ডাইরি', কেউ কবিতা, কেউ বা গল্প। ভাগ্যিস এ সময় মোবাইল নামক যন্ত্রটি এ্যানড্রয়েড। আর সস্তার নেটওয়ার্ক। তরুণ–তরুণী খেলছে অনলাইন গেম, কবি-শিল্পী গান ছাড়ছেন অডিয়ো–ভিডিয়োয়, কবি সম্মেলন করছেনও। কেউ কেউ ফেসবুক-হোয়াটস এ্যাপে কাটাচ্ছেন সময়। নইলে এই কঠিন পরিস্থিতিতে কী হতো? এই দীর্ঘ অবসরে সমকালীন সাহিত্যচর্চার সম্ভারকে একতায় আনার প্রয়াসে এই সংখ্যা বদলে গেল। অধিকাংশ কবিতা করোনা-কালে নানা বিতর্ক, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও নাটুকেপনা -- ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে লেখা। বলা যায় সমকালীন সময় সমাজের প্রতিবিম্বন কবিতাগুলি। এছাড়া পত্রিকার সমৃদ্ধির জন্য গল্প, প্রবন্ধ নেওয়া হয়েছে। আর দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের গল্প–উপন্যাস সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হচ্ছে। সৌজন্যে আমার ছাত্র ও গবেষক পঞ্চানন নস্কর।

আফসার আমেদের উপন্যাস 'ধানজ্যোৎস্না' অবলম্বনে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন 'আমার ভুবন' সিনেমাটি নির্মাণ করেন। অসাধারণ সিনেমাটি যখন দেখি নন্দনে, চোখে ঘোর লেগে যায়। অবাক বিস্ময়ে ভেবেছি এ কোন চিত্রপট। মিষ্টি ভাষায় সহজ গভীরতায় গড়া এ সৃষ্টি। যার সূচনা চমকে দেয়। জীবনের মাঝপথে ছন্দপতন যেন আবার অন্য কোনো ছন্দে জ্যোৎস্নালোকিত হচ্ছে :

"ফাল্গুনের মিষ্টি দুপুর গড়িয়ে পড়ছিল সখিনার সংসারের উঠনে। তার ওপরে হামা দিয়ে ন্যাতা দিতে থাকে সে। এক প্রাণস্পর্শ ছিল তার সযত্ন ভঙ্গিতে। পেছনের সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে সখিনা। উপুড় হয়ে ফিরে দেখল প্যান্ট শার্ট পরা কে একজন রাস্তা থেকে সাইকেল টেনে এসেছে তাদের উঠনে। দেখে চিনতে পারে না সখিনা। উঠে দাঁড়ায় সখিনা। মাথায় কাপড় টানে। ঘোমটা টানে। দেখে লোকটা দাড়িওয়ালা, চশমা

পরা ভাল জামা-প্যান্ট পরে আছে। সাইকেলটা রেখে তাদের উঠনেই উঠে আসছে। মুহূর্তমাত্র বিদ্যুতায়িত নাড়া খায় সখিনা । তার আগের স্বামী নুর। উঠনতলা মাড়িয়ে উঠনে উঠে আসছে। যার সঙ্গে চোদ্দ বছর আগে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। এবং ছাড়াছাড়ির কয়েক মাস পরে সখিনার বিয়ে হয়ে যায় নুরেরেই খালাতো ভাই মেহের আলির সঙ্গে।" - - - এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট তাঁর গদ্যে গ্রামীণ ভঙ্গি, কোথাও কোথাও একই কথার পুনরাবৃত্তি আর বাংলার সমাজব্যবস্থার এক নিপুণ ছবি, একই সঙ্গে লেখক প্রকৃতি ও সংস্কৃতির ছোপ রেখেছেন চালচিত্রে।

আফসার আমেদের গল্প-উপন্যাস যেন আমাদের পরিচিত যাপনের ছবি। কখনো বহমান নদীর বুক থেকে উথলে ওঠা, কখনো বা মানুষের কথা মানুষের স্বরে প্রতিধ্বনিত। তাঁর সৃষ্ট নামকরণে যাদু আছে, অদ্ভুত শীতলতায় জড়িয়ে নেয় পাঠকমন। কখনো কখনো নামকরণে লেখকের উদ্দেশ্য প্রতিভাত : 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি ও হলুদ পাখির কিসসা', 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক', 'দ্বিতীয় বিবি', 'মেটিয়াবুরুজে কিসসা', 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিসসা' প্রভৃতি।

লক্ষণীয়, 'কিসসা' শব্দটির অর্থে যে কোনো সম্মান বা সম্ভ্রম বাঁচে না, তথাপি লেখক দ্বিধাহীন চিত্তে সচেতন প্রজ্ঞায় প্রয়োগ করেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে এভাবেই অবলীলায় গড়ে উঠেছে 'গ্রামীণ জীবন, মুসলমান জীবন' । অধ্যাপক মোস্তাক আহমেদের সাথে মুখোমুখি উত্তরে অকপট স্বীকারোক্তি দিয়েছেন লেখক :

"জন্মগতভাবে আমি মুসলমান। আমি মুসলমান সমাজে বড়ো হয়েছি। অনিবার্যভাবে আমার লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে মুসলমান জীবন। আমি যাঁদের জানি না তাঁদের কথা লিখব কেমন করে ? তাছাড়া এই জীবন বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে সামান্যই। মুসলমান হিসেবে নয়, আমার প্রতিবেশের প্রতিফলন আমার লেখার উপাদান। পাশাপাশি অমুসলমান সমাজ উঠে এসেছে, দেখা-জানার ভেতর ভেতর দিয়ে। মুসলমান সমাজ এসেছে 'মানবিক' অন্তর্মূল সন্ধানের দিক থেকে। আমার লেখায় মানুষ হিসেবে অভিন্ন বাঙালি আত্মপরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েছি। তথাকথিত সমাজ বিভাজনে আমার আপত্তি আছে।" (গাধা / ৫বৈশাখ,১৪২৪ / পৃষ্ঠা – ২৪২)।

সত্যি তো, 'মুসলমান সমাজ' কি বাংলার সংস্কৃতির অভিন্ন অঙ্গ নয়? নাকি যে পল্লী-বাংলার রূপমাধুরী প্রসঙ্গক্রমে উপন্যাসের অন্তর্দেহে অঙ্কিত হয়েছে তা কি আমাদের চেনা নয়? আজও কেন বৃহত্তর দুই সমাজব্যবস্থার মাঝে একটা বিভেদের রেখা অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হয় সে তো চিন্তার। হয়তো দু'তরফের দোষ আছে। আধুনিক সভ্যতার স্বার্থে এ পাঁচিল ধ্বংস করা প্রয়োজন। আর সেজন্যই আফসার আমেদের সৃজন-পাঠও অনিবার্য ।

অগ্রজ কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র তাঁর এই অনুজ ও 'প্রিয়জন প্রিয় লেখক' সম্পর্কে বলেছেন, "আফসার প্রতিভাবান লেখক। ওর গল্প, উপন্যাসে এই বাংলার বাঙালি মুসলমানের হৃদস্পন্দন টের পাওয়া যায়। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় আফসার আমেদ

যেভাবে রচনা করেছেন, আর তা নমস্য লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখায় পেয়েছি। পড়লে মনে হয় ও যেন বাঙালি মুসলমানের জীবন-সমুদ্র মন্থন করে তুলে এনেছে অমৃত ও গরল।"(ঐ/পৃষ্ঠা – ২১২)

খেদ রয়ে গেল, লকডাউনের অছিলায় এ কাজ সম্পূর্ণ করার মহতি উদ্যোগ ব্যর্থ হলো। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া ভালো, ওয়ার্ড ফাইলে কাজ করতে গিয়ে কিছুটা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। যেমন পূর্ণ ড্যাস বা সেমিকোলন এই যতিচিহ্ন দুটি এই সংখ্যায় অমিল। এজন্য আমার অক্ষমতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। হার্ডকপি যখন তৈরি হবে সংশোধনের চেষ্টা করব। প্রতিটি লেখক যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালে ছোট করা হয়। এ যেন তাঁদেরও দায়বদ্ধতা। লকডাউন সমাপ্ত হলেই এর বাস্তবিক প্রকাশ ঘটবে। আপাতত পত্রিকার ওয়েবসাইটে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

জয়গোপাল মন্ডল
১৫. ০৫. ২০২০

@ ছোটগল্প

অ ম র মি ত্র
কাযান শহরে এলেন তিনি

ইতালির ভেনিস নগরে লকডাউন চলছে। একটি ভিডিও পেয়েছিলাম মাসখানেক আগে। দুপুর ২-৩০ নাগাদ নগরে একটিও মানুষ নেই। নিস্তব্ধ নগরে শুধু কিছু পায়রা। গির্জার ঘন্টাধ্বনি। মার্কো পোলো ভেনিসের মানুষ। ভূ-পর্যটক। যে নগর জনপদ পেরিয়ে সে এল, তার কথা শুনুন মেয়র মহোদয়।

নগরে মানুষ নাই। কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরোন মাসাধিক কাল বন্ধ। পৃথিবীতে লকডাউন চলছে। সেই খবর নিয়ে মার্কো এখন তাতার দেশের কাযান শহরের মেয়রের মুখোমুখি।

মেয়র মহোদয়, আমি কাযান শহরে পৌঁছেছি কত নগর, জনপদ পেরিয়ে। ভোলগার ওপার থেকে দেখেছি অপরূপ এই নগর। উপাসনালয়, রঙ্গালয়ের শীর্ষ... কোন পথে এখানে এল মার্কো, তা সে নিজেই জানে না। মার্কো শুধু পৃথিবীর পথে হেঁটেছে। শুনুন মেয়র স্যার, কোন মার্কো পোলো তা আমি জানি না। ৫০০ বছর আগের, না পরের? আমি ছেলেবেলায় ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলাম, টাইফয়েডে ভুগেছিলাম, আর বসন্ত তো ছিলই। জল বসন্তে ঘরের ভিতরে ঘর, মশারীর ভিতরে ছিলেন বিদ্যাধর। তখন পেনসিলে আমি খবরের কাগজ লিখতাম। সেই আমার প্রথম লেখা। লেখার চেষ্টা। একটা বিমান আঁকলাম, তার নিচে খবর লিখলাম, বিমান দুর্ঘটনায় এতজনের মৃত্যু। হ্যাঁ, সেই সময় প্যান আমেরিকান বিমান দমদমে অবতরণ করতে গিয়ে কৈখালির কলাবনে আছড়ে পড়েছিল। অনেক জীবনহানি হয়েছিল। আমি এত বয়সে এসে সেই খবরের কাগজ লিখছি...। করোনার দিনগুলির খবর। মেয়র মহোদয়, শুনুন,এই যে মৃত্যুভয়, এই ভয় এই প্রথম নয়। হিরোসিমা নাগাসাকি পার করেছে জাপান, চেরনোবিল পার করেছে পূর্ব ইওরোপ, প্লেগ, স্প্যানিস ফ্লু, ফ্রেঞ্চ ফ্লু...কত মহামারিতে মরেছে মানুষ। কালান্তক ভাইরাসের ভয়ে মশারির ভিতরে আত্মগোপন করে আমি আমার মতো করে খবর লিখছি। বিমান বাহিত হয়ে এই অদৃশ্য

ঘাতক মহাদেশ থেকে মহাদেশে ঢুকে পড়ে মানুষ মারছে। ছেলেবেলায় মা শীতলার এমন অদৃশ্য পরিভ্রমণের কথা শুনেছি। ঠিক এই সময়ে। এই চৈত্রদিনে, যখন শিমুল পলাশ ফোটে, বাতাসে কাপাস, শিমুল তুলো ওড়ে, আমের মঞ্জরীতে দশদিক ম ম করে, গাজনের সন্ন্যাসীরা মহাদেবের চরণের সেবা লাগি...ডেকে ডেকে গ্রামের পথে হাঁটে, তখন শেতলাবুড়িও খর রোদের ভিতর হাঁটে মানুষের খোঁজে। পথের কুকুর গন্ধ পেয়ে লেজ গুটিয়ে বাগানে, ঝোঁপেঝাড়ে ঢুকে পড়ে জিভ মেলিয়ে হ্যা হ্যা করতে থাকে। আমি এখন করব কী ? মশারির ভিতরে বসে খবর লিখছি। সারাজীবন ধরে কত খবর পেয়েছি, এখনো পেয়ে যাচ্ছি, রয়টার, পি,টি,আই, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস(এ, পি), নিজস্ব সংবাদদাতা...যেমন খবর পাঠাত সেই পৃথিবীতে, তেমন খবরই আমি দেব, আমি বুড়ো খবরিয়া বলছি সেই অদৃশ্য ঘাতকের কথা। ডাকিনির ঝাঁটায় উড়ান দিয়ে সে পৌঁছে গেছে মহানগরে। মহানগর থেকে গাধার পিঠে চেপে মফঃস্বলে গেছে। তেহট্ট, চন্দননগর, শিলিগুড়ি, নিউইয়র্ক, ভেনিস, সিডনি, দিল্লির মহাসড়ক থেকে অলিগলিতে।

কাযান শহরের মেয়র এই প্রথম মার্কোর দেখা পেলেন। ভূপর্যটক মার্কো পোলো ৫০০ বছর আগে এই শহরে এসেছিলেন তাতার সম্রাটের কাছে। ইনিও মার্কো পোলো। পিছনের ৫০০ বছর হেঁটে এসেছেন, নাকি তাঁর পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছেন? মেয়র দেখলেন মার্কোর গায়ের রঙ রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে, সোনালি চুলে ধূসরতা। মেয়র মার্কোর যে ছবি দেখেছেন, তার সঙ্গে এই প্রবীণের মিল কম। শুধু চিবুকের গড়নে কিছু মিল দেখা যায়, ঈষৎ ছুঁচোল তা। মুখে অনেকটা দাড়ি জমেছে নিয়মিত খেউরি না হওয়ার কারণে। মেয়র নিজে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। মস্ত চেহারা। তিনি মধ্যবয়সী। মেয়রের কত কিছু জানতে হয়। শহরে একজন বিদেশি এসেছে, সে নাকি সেই কত বছর আগে, কত শত বছর আগে দূর পাশ্চাত্য ভেনিস নগর থেকে এসেছিল এই নগরে। মেয়রের মনে হচ্ছিল, লোকটার গায়ে বহু দেশ, বহু জনপদের ধুলো, বহুদেশ বহু জনপদের বাতাস, বহু বর্ষের স্মৃতি আর স্বপ্ন। লোকটা বলছে, ঘুরতে ঘুরতে সে ভুলেই গিয়েছিল এই জনপদের কথা। সে ঘুরতে ভালোবাসে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন আচমকা দেখতে পেল আঙিনায় মানুষ নাই, সড়কে মানুষ নাই। অশ্বগুলির মুখে লাগাম, পিঠে জিন নাই, কিন্তু তারা বনের ঘোড়া নয়, তারা বন থেকে মানুষের কাছে এসে পোষ মেনেছিল। তারা প্রভু

পেয়েছিল। কিন্তু এখন একেলা ঘুরছে হেথা হোথা। খাদ্যের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। গৃহে অন্তরীন প্রভুরা তাদের ত্যাগ করেছে।

মেয়র শুনতে শুনতে অবাক হলেন, বললেন, এমন তো শুনি নাই, এই নগরে এমন ঘটে নাই।

মহামান্য মেয়র, নগরাধিপতি, অন্যত্র ঘটেছে। আমি ভেনিস নগরের ফিরতে ফিরতে ঘুরুয়া বাতাসে ভুল পথে গিয়ে, আবার পথ পরিবর্তন করে, কাযান শহরে এসে পৌঁছলাম।

নগরাধিপতি মার্কো পোলোকে দেখছিলেন। মানুষটার চোখমুখে ভয়ের চিহ্ন। মার্কো বলল, মহারাজ আমি বহু জনপদ ঘুরে আসছি, মানুষ এখন মানুষের মুখের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে।

স্বাগত মার্কো পোলো, ভেনিসীয় পর্যটক, কী দেখেছেন বলে যান। মেয়র তাঁকে বললেন।

মার্কো বললেন, খবরিয়ার কথা শুনুন:

গত ১৪-ই মার্চ থেকে আমি মেলা-মেশা বন্ধ করেছিলাম করোনা ভাইরাসের ভয়ে।

অতঃপর দুটি দিন, ১৫ এবং ১৬-ই মার্চ ঘরে বসে কাটল। কিন্তু কলকাতা আছে কলকাতাতেই। বাসে ট্রামে মানুষজনের ভীড়। টেলিভিশনে ভয়ের কিছু দেখলাম না তেমন। তবে এক অদৃশ্য ঘাতক এসে গেছে এই শহরে তার ইঙ্গিত আসছিল। ১৭-ই মার্চ দিনটি ছিল রৌদ্রালোকিত। সেদিন লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু, অরিন্দম বসু সকাল নটায় খবর দিল। সুব্রতর মৃত্যু আমাকে আবার বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল। প্রখর হয়েছে রোদ্দুর। রোদে হাঁটতে হাঁটতে মেট্রো ষ্টেশন। মেট্রো ছিল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, তবুও গা ঘেষাঘেষি করে যেতে হলো। মুখে মাস্ক। অস্বস্তি হচ্ছে। কবি নজরুল ষ্টেশন থেকে অটোয় করে সোনারপুর চললাম। গড়িয়ার ব্রিজ পার হইনি তখনো, পথের ধারে কী এক মন্দিরে দেখছি বেজায় ভীড়, লম্বা লাইন গায়ে গা, কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ঘেষে, রমণীরা দেবীর জন্য সিধে এনেছেন। নারিকেল, মিষ্টান্ন, ইত্যাদি। দেবী শীতলা কিংবা কালী হবেন। কাঁসর ঘন্টা বাজছে। এমন কেন ? ভয় নেই। অটো থেকে দেখছি কোথাও কোনো ব্যত্যয় নেই।

দোকানপাট খোলা, বেচাকেনা চলছে। ব্যাগ হাতে লোকে হাঁটছে। গাড়ির অবিশ্রান্ত হর্ন শুনতে পাচ্ছি। সবুজ জামা নীল প্যান্ট তরুণ সিভিক পুলিশ লাঠি হাতে যান নিয়ন্ত্রণ করছে। তার মুখে কাপড়ের মাস্ক। লোকজন রাস্তা পার হচ্ছে, ভবঘুরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঠিক করতে পারছে না কোন দিকে যাবে। আমি তো মৃত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ব্যারাকপুরের সুব্রত সোনারপুরে লিভার ফাউন্ডেশন হাসপাতালে গত রাত ১১টা ৫৫মিনিটে মারা গেছে। আমাকে ডাকছে, আয় বন্ধু, আমাকে দেখে যা। সোনারপুর যেতে যেতে দেখছি সমস্ত শ্যামলিমা উধাও। কংক্রিট আর কংক্রিট। এত বহুতল, ফ্ল্যাটের পর ফ্ল্যাট...কত মানুষ এইটুকু জায়গায়।

লিভার ফাউন্ডেশন হাসপাতালে যেতে সোনারপুরে অটো বদল করতে হয়। সোনারপুরে অটো হাঁকছে, বাস হাঁকছে, রিকশা প্যাঁক প্যাঁক করছে। থিক থিক করছে মানুষ। সবাই কাজের ভিতর আছে। সব রকম বয়সের সব রকম মানুষের সব রকম কাজ থাকে। খর রোদে হাঁটছি। রেললাইন পার হয়ে অটো স্ট্যান্ড কম দূর নয়। রাস্তা দিয়ে চলা যাচ্ছে না এত মানুষ পথে। কেউ যেন জানেই না কিছু, জানে না অদৃশ্য ঘাতক কার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে। সোনারপুর বদলে গেছে। মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগে এক বর্ষার দুপুরে গাড়ি নিয়ে সোনারপুর হয়ে কলকাতার দিকে যাচ্ছিলাম। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, গাড়ি আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। নিঝুম রাস্তা দিয়ে হেলেদুলে নিশ্চিন্তে কতক কই মাছ হাঁটছে। নিশ্চিন্ত মৎস্য রাস্তা পার হচ্ছিল। সেই অবারিত মাঠ, হোগলাবনের সোনারপুর এখন নেই, সব মুছে গেছে। রেল লাইন পার হয়ে অনেকটা হেঁটে আবার অটো। ১১-৩০ হয়ে গেল পৌঁছতে। খুব কষ্ট হয়েছিল সুব্রতকে দেখে। রূপবান বন্ধুর মুখ কালো হয়ে গেছে। রাজ্যের ধুলো এসে পড়েছে যেন মুখখানির উপর। যেমন হয়েছে এই সোনারপুর। গরম হাওয়ায় বালি উড়ছে বাতাসে।

শুনতে শুনতে মেয়র বললেন, অস্বাভাবিক কিছু তো দেখলাম না এই বিবরণে, বন্ধুর মৃত্যুতে বন্ধু যাবে, জনপদ স্বাভাবিক থাকবে, সেই জনপদে একবার বর্ষার দিনে কতক মৎস্য পার হয়ে যাচ্ছিল এক পথ থেকে আর এক পথে, সেই মৎস্য কত বড়?

মার্কো শুনেছেন কথাটি। অটো রিকশার ভিতরে বসেই বাকি তিনজনের কথোপকথনে শুনেছেন সেই মাছটির কথা। মাছটির নাম কৈ।

মেয়র বললেন, আপনি জিজ্ঞেস করেননি, যে মাছ একদিন বৃষ্টি হয়ে গেলে ডাঙায় হেঁটে বেড়ায়, সেই মাছের কি দুটি পা আছে, নাকি সে তার পুচ্ছ ভর করে লম্ব ভাবে হেঁটে বেড়ায়, নাকি পাখনা দিয়েই হাঁটে, আমি এমন মৎস্যের কথা শুনিনি কখনো।

আমি শুনেছি, একদিন এমন ছিল, এখন এমন নেই, পুষ্করিণী ভরাট হয়ে হর্ম্য শ্রেণী মাথা তুলেছে।

সেই মৎস্য কোন দিকে চলেছিল, পুব থেকে পশ্চিমে?

মার্কো বললেন, হয়ত পুবে, এখন পুব বন্ধ হয়ে গেছে মস্ত প্রাচীরে, কাঁটাতারে।

মেয়র জানালার শার্সির ভিতর দিয়ে দেখছিলেন বাইরে তুষারপাত শুরু হয়েছে। তুষারপাতের শেষ নেই, শীত গিয়ে বসন্ত আসার সময় হয়েছে, কিন্তু এবার শীত অতি দীর্ঘ, তিনি ভাবছিলেন এই ভূপর্যটক দাবা খেলতে জানেন কি না। মেয়র সাজাতে লাগলেন তাঁর সৈন্য সামন্ত। মার্কো সেই মাছটির কথা ভাবছিলেন। আসলে এমন হতে পারে ঐ মাছের কথা সত্য নয়। কত সত্য মিথ্যা যে ভেসে বেড়াচ্ছে এখন জনপদে জনপদে। জলের মাছ ডাঙায় হেঁটে বেড়ালে, সে মৎস্যকুমার কিংবা কুমারীও হতে পারে যাদের কেউ কখনো দ্যাখেনি। তিনিও দ্যাখেননি, অতএব মিটে গেল সমস্যা। কিন্তু জল থেকে বেরিয়ে তারা কি অন্য জলাশয়ের দিকে যাচ্ছিল, নাকি চিরকালের মতো পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। আর জল, বায়ু, আলো, অন্ধকার দরকার হবে না তাদের বেঁচে থাকার জন্য। এসব ছাড়াই শক্তিমান হয়ে উঠবে অন্ধকারের জীব । মার্কো চমকে উঠলেন। সেই যে ভাইরাস, সে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি এই কথাই শুনেছেন পথে পথে। কোভিড-১৯ কি এমনি?

ঋ ড়ে শ্ব র চ ট্টো পা ধ্যা য়

সনিয়ার সাবান

(১)

পাকা প্রাচিরে ঘেরা মস্ত এই আবাসনে স্ট্রীট নাম্বার বারোর ডাইনে বামে পর পর চারতালা বাড়িগুলো তো দাঁড়িয়ে ।পুরনো আবাসিকরা অনেকে হাঁটতে হাঁটতে পকেট ফাইভের এই বিল্ডিংটার দিকে একবার চোখ ফেলে। সিঁড়ি বারান্দায় কি আচমকা বেড়ে-ওঠা কিশোরীরা স্বল্প পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকে ? তাও না । পাশে সদ্য যুবতীরা বাড়ির হাত কাটা হালকা ম্যাকসি, হট শর্টস পরে, গায়ে গেঞ্জি... বুকের ওপর লেখা ‘হট টু টাচ’, সেরকমও নয়। ফুল ফুটে থাকা টবও পাশাপাশি বসানো, তেমন তো নয় । তবুও পথ চলতি রমণী পুরুষ কিশোর কিশোরী একবার বেখেয়ালে তাকায়। স্কুল ফেরত বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের পিঠের ব্যাগ মায়েদের কাঁধে। তারা হাঁটতে হাঁটতে থমকে আঙুল তুলে দেখায়, ‘মা, সেকেণ্ড ফ্লোরে বি সিক্সটি টু’

এক তরুণী মায়ের নিম্ন কণ্ঠস্বর , ‘ এমন করে বলতে নেই বাবু’

আর এক মা চোখ কটমট করে তাকায় বাচ্চাটার দিকে, ‘আমি এর আগে বারণ করেছি তো, এমন আঙুল তুলে বলবে না। তবুও তুমি...?’

পাশেই এক মা হাঁটার গতি কমিয়ে একটু তাকায়, ‘কেন ওইটুকু মেয়েকে এত বকছেন ভাই? সত্যিই তো, বি সিক্সটি টু এমনভাবে রাখে কেন ?’

সেকেণ্ড ফ্লোরে উদ্দিষ্ট রুমটার পুব দিকে জানালায় পাল্লা খোলা। এক পাশে পর্দা সরানো। কাঁচাপাকা চুলে সত্তর বচ্ছুরে পুরুষ সুকান্তর ফর্সা ভাঙা মুখের পাশে, চৌষট্টি পঁয়ষট্টির মহিলা মঞ্জিমার আধফর্সা গোল ভারী মুখ। মাথায় রঙ করা কোঁকড়ানো কালো চুল হাওয়ায় অল্প স্বল্প নড়ে। বাচ্চাগুলোর অমন হাত মুখ

নড়াচড়া আবার মায়েদের সতর্কতা দেখেও বাচ্চাদের মন হালকা করতে মঞ্জিমা হাত নাড়ায়, 'টা... টা...' কব্জি ঘিরে শাঁখা নোয়ায় মৃদু ঠুন ঠান শব্দ ।

প্রত্যুত্তরে বাচ্চাগুলো হাত নাড়াতে গিয়ে মায়ের সামনে বিপন্ন। এক মা সেটুকু টের পেয়ে বলে, 'বাবু ওই ওপরের দিদাকে টাটা জানাও'

ফুলহীন সোনাঝুরি গাছটার ক'খানা ডাল পালায় এখন সবুজ পাতা। ছোট চেহারায় সোনাঝুরি গাছটার ডগা ছাড়িয়ে তো সেকেণ্ড ফ্লোরে পুবের জানালাটা !

(২)

ভোরের নিয়মে ভোর হয়। ভোরের নরম কাঁচা রোদ্দুর ক্রমে পাক ধরে সকালের রঙ পায় আকাশের গায়ে। গাছগাছালির পাতা নাতায় রোদ গড়ায়। রোদ বিছিয়ে থাকে আবাসনের পাকা পথের পিচ খোয়া পার্কের ঘাসে ঘাসে। ঘাসে দাঁড়িয়ে মোবাইলে নম্বর টেপে তেইশ চব্বিশের ডালিয়া। সকালের হালকা হাওয়ায় ওড়নার প্রান্ত এক আধবার কাঁপে তখন ওপার থেকে মঞ্জিমা সাড়া দেয়, 'হ্যালো ?'

'মাসিমা, আমি। ও এখনও শুয়ে আছে ?'

'দাঁড়াও একটু, দেখে বলছি, 'হাতে মোবাইল ধরে লোহার ফ্রেমে রডের গায়ে স্টীলের শিট লাগানো দরজার কাছে আসে মঞ্জিমা। দেওয়ালের গায়ে গর্ত থেকে হুকটা সাবধানে টানে। মুখ বাড়িয়ে দেখে সাব্যস্ত করে ভাঁজ করা পলিথিন শিটটা একদম ফাঁকা। হুকটা পুনরায় সামান্য লাগিয়ে বলে, 'ন। ও এখন নেই, লিফটে চলে এসো। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি'

ডালিয়ার হাতে বোতল ব্রাশ গাছের সরু ডাল লাঠির কাজ করে। বোতল ব্রাশের সরু ডালটা শক্ত করে ধরে ডাইনে বামে তাকায় সারারাত পারকিং প্রাইভেটগুলোর

তলার দিকে। ভিজে ন্যাকড়া হাতে ফর্সা বউটা কাছেই গাড়ির কাচ মুছতে এগোবে, ডালিয়াকে দেখে বলে, 'এমন লাঠি আগে নিলে ভালো হ'ত তো ?'

'তা ভালো হ'ত। আর যাতে বার বার না ঘটে তাই লাঠি। তোমার বর ভালো আছে?'

'আছে। ওরোগের ওষুধ জোগাড় করতেই হিমসিম। তবু ছোসাইটি, বাবুদের এই গাড়ি মোছার কাজ দিছিল, তাই একটু সুসার। দেশে থাকলে আর দেখতে হতুনি...!'

'নারে রুপা, মন্ত্রীবাবু নেতারা ইচ্ছা করলে তোর বরের চিকিচ্ছা খরচ দিতে পারে। ফোন করনা গেরামে, পঞ্চায়েতে ?

'দুস। সে গেরামে, পাশ গেরামে ভোটই হয়নে...একজন ছাড়া আর কেউ দাঁড়ায় নে। কী সব কোট কাচারির গোলমাল...অনেকগুলো গাড়ি মোছা বাকিরে বোন', বলেই গাড়ির সামনে পেট বুক রেখে হাত বাড়িয়ে কাচ মোছে। সাফ করে।

ডালিয়ার বাম হাতে ছোট্ট পার্সের মধ্যে পাঁচ-সাত টাকার নোট, কয়েন আর মোবাইল। ডান হাতে বোতল ব্রাশের সরু ডালটা। সস্তা চটিতে ঘাস পাড়িয়ে যেতে যেতে ডাইনে বামে তাকায় ডালিয়া, কোনও দেশী কুকুর তেড়ে আসছে কি না ! ফ্ল্যাটে ঢোকার পিচ ঢালাই সরু পথের পাশে গোল করে গোড়া বাঁধানো লোহার লাইট পোস্ট। পোস্টের গায়ের কাছে দুএকটা লোম-চটা ঘিয়ে কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। সেকথা মনে হতেই ডালিয়া পায়ের চাপে চটির শব্দ দমিয়ে সাবধানে সিঁড়ির দিকে এগোয়। ওপাশে গাড়ি-বারান্দা থেকে হঠাৎ পকেট ফোরের পাঁশুটে রঙের কুকুরটার চিৎকার, ঘেউ...ঘেউ...

সে শব্দে ডালিয়ার হাতে লাঠিতে মুঠি শক্ত হয়। ভাবে, ইস যদি আগে থেকে এমন লাঠি সঙ্গে থাকতো... তাহ'লে কি মাসিদের কালুটা অমন করে..., লিফটটা থামতেই জিন্স প্যান্ট গেঞ্জিতে এক যুবতী বেরিয়ে আসে এক ঝলক তীব্র প্রসাধনি বাস। কাঁধে

কারুকার্যময় হ্যাণ্ডব্যাগ। ডালিয়ার অতি সস্তা পোশাকের দুর্গন্ধ রুখতে নাকে রুমাল চেপে জুতো খটমটিয়ে বেরিয়ে যায় আই টি কোম্পানির পিক আপ বাস ধরতে ।

আর তো পাশে কেউ নেই সুতরাং লিফটে একলা ডালিয়া। প্রথমে শাটার টেনে বন্ধ করে তারপরে লিফটের কোলাপসিবল বন্ধ করে বাটন টেপে ‘দুই’ । একটু দমকা দিয়ে লিফট উঠতেই ডালিয়ার বুকের মধ্যে আর এক দমক! লাঠিটা বগলে গুঁজে বাম পায়ের চুড়িদার খানিক টেনে বিড় বিড় করে , ‘ ...সেদিন সকালে কেন যে মাসিমাদের বুড়ো কালুটা চার হাত পা উঁচিয়ে ঘিরে ধরে পায়ের তিন জায়গায় কামড় বসালে...! সাদা ধারালো দাঁত বসাতেই ঝুঁঝিয়ে রক্ত... জ্বালা...’ এখন সেই পায়ের পাতায় মাশল গোছে হাত বোলায় ডালিয়া, ‘পাঁচখানা ইঞ্জেকশানের দাম, এক মাস ছুটি ফল মিষ্টি পাঠাতো। এক মাসেই পাঁচ মাসের মাইনে ধরে দিয়েছিল এমনি এমনি। খেটে শোধ করতে হবে না। একটাই অনুরোধ, আমাদের কালুটা কামড় দিয়েছে, এটা আর কাউকে বলিসনি মা। একদম না...। তোদের দিদির কুকুর। কুকুরটাকে মারলে, দিদি কাঁদবে...’

সেকেণ্ড ফ্লোরে লিফট থামে তখন নীচে কেউ বোতাম টেপে উপরে উঠবার জন্যে। লিফট থেকে বেরিয়ে কোলাপসিবল টেনে শাটার বন্ধ করে ভাবে ডালিয়া, দিদিটাকে... সনিয়াদিকে বিয়ে দেয় না কেন মাসি? পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়েস হয়ে গেল? মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো অমন ঝাঁকড়া চুল...বড় বড় চোখ নাকে ফর্সা গা বুক...।

দেওয়ালে কলিং বেল টিপতেই ভেতরে শব্দ, ওঁম ওঁম...

সাড়া আসে, যাই...ই

ঘরে ঢুকে ছোটো সোফা পাশ কাটায়। রান্নাঘরের দিকে গিয়ে ডালিয়া বলে, ‘আজ আবার কামড়েছে

'কে ? কালু ? আবার তোকে?'

শোয়ার ঘর থেকে মুখ বাড়ায় সত্তর বছরের সুকান্তবাবু। তখনও থমকে তাকিয়ে মঞ্জিমা ! দুই মানুষের উৎকণ্ঠা কাটাতে ডালিয়া বলে, 'না না। পকেট ফোর'য়ে এক কাজের মেয়েকে'

'কেন? গায়ে লেজে পা তুলে দিয়েছিল মেয়েটা ?'

'না। এক বিল্ডিং থেকে কাজ সেরে, দেরী হয়ে গেছে বলে একটু দৌড়ে সামনের বিল্ডিংইয়ে যাচ্ছিল রান্না বসাতে। দিয়েছে কেটে কুকুরটা একদম পিছনে পাছার মাংসে...'

'ইস । বেচারা...! পয়সা খরচ...।'

'তার বর অটো এনে তাকে নিয়ে গেল হাসপাতাল খাজা গাঁওয়ে'।

'কেন্দ্রিয় আবাসনে কুকুর চাড্ডি খানেক... ' ,বলে কথা কেটে নেয়। নিজের দরজার সামনে কালুর কথা মনে পড়ে । ভাবে, কালুটা এখন কোথায় । এই আবাসনের কোনদিকে পটি ...হিসি করতে গেছে..., কে জানে! পরক্ষণে রান্নাঘরের বেসিনের কাছে যায় মঞ্জিমা, 'ডালিয়া ?'

'মাসিমা'? বলে বাসন মাজাটা থামায় ডালিয়া।

'পকেট ফোরের দিকে কি আমাদের কালুকে দেখেছ ?'

'আমি ফোরে যাইনি মাসিমা। আসার পথে আর একজনের মুখ থেকে শুনলাম'

মঞ্জিমা তখন জানালা থেকে আবাসনের পথ, পার্ক, ডাল-পালা কাটিং করা গোলাকার পাণ্ডা গাছগুলোর নীচে চোখ ফেলে খানিক দ্বিধায় বিড়বিড় করে, 'কেন সে রাতের

বর্ষায় ভেজা কুকুর বাচ্চাটাকে একখণ্ড খবর কাগজ পেতে দিয়েছিলাম দোর গোড়ায়...’!

(৩)

বেলা এগারোটার রোদ কমপ্লেক্সের খোয়া পিচের রাস্তায়। ঝাঁকড়া চুলে ফর্সা চোখ মুখে সনিয়া। নারসিং হোমে ফ্লোর ম্যানেজারের ডিউটি সেরে টানা অটো ভাড়া করে আবাসনের গেটে ঢোকে। আবাসনের পাকা পথে বেশ খানিকটা চাকা গড়াতেই কালো লোমে ভারী চেহারায় কুকুরটা পিছন পিছন দৌড়ায়। সে দৃশ্যে দুএকজন পথ চলতি সম্মুখবর্তী আবাসিক দাঁড়িয়ে পড়ে, আঙুলের দিশায় বলে, ‘ ম্যাডাম ,ইয়োর ডগ ?’ ‘মাই ডগ...!’ বলে পিছনে তাকায়। চোখে আন্দাজ পড়তেই অটো ড্রাইভারের পিঠে টোকা মারে, ভাই রুখো’

অটোর গতি কমতেই কুকুর কাছে দাঁড়ায়। ‘কালু তুই কোথায় ছিলিস ? আয়...আজাও’ বলতেই ভারী চেহারায় কালু লাফিয়ে অটোতে উঠে পায়ের কাছে বসে সনিয়ার হাঁটুর উপর মাথা রাখে। কালুর মাথায় দুএকবার হাত বুলিয়ে দেয়।

(৪)

শর্টস আর লাল সাদায় ডোরা কাটা গেঞ্জি গায়ে ছাদের ট্যাপ খোলে সনিয়া। ডান হাতে কালুর কানটা আলগা টান দিতেই জলের কাছে দাঁড়ায়। ডগ সোপটা ঘষে কালুর গায়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কী আদরে যে প্রাণীটার গায়ে সাবান মাখায়। যেন এক বাথরুমে সম বয়েসি পুরুষের পিঠ সাফ করে দিচ্ছে...! সেই ঘোরে হঠাৎ বিড় বিড় করে, ‘ আদরের পুরুষ পেলুম কই...! বরং এক বিছানায় দু দুজন আদর করে কথা রাখলো কোথায়...!’ হাতের গতি কমতেই কালু অস্থির। তাকে হাঁটুর কাছে টেনে পিঠ থেকে সাবান হাত পেটের কাছে নামে, সে হাত জনন অঙ্গের কাছে যেতেই কালুর তলপেট সিঁটিয়ে ওঠে। সিঁটিয়ে শিহরিত উষুম কাঁপন সনিয়ার শর্টসে

উরু জংঘা তলার পেট বেয়ে থলমলে গা বুকের স্নায়ু তন্তুতে...! কালুটা আরও কাছে আবেশে !

পিছনে মা এসে দাঁড়ায় , 'সুনু ?'

'বলো'

'একজন কাউকে বিয়ে টিয়ে আর কবে করবি, বল ?'

'মা তোমার এই থায়রয়েড হেভী সুগারের মেয়েকে কে আর বিয়ে করবে? দেখি যখন সেরে উঠবো তখন..., 'পেটের কাছে রমণী হাত থামতেই কালু মৃদুস্ফীত উপাঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ তোলে... ।

(৫)

বিকাল তিনটে চারটের রোদে খানিক নেতিয়ে গাছগাছালির পাতা। বিল্ডিংগুলোর কার্নিশের ছায়া পার্কের ঘাসে ঘাসে। মানুষের বেররুমে জানালা দরজা খানিক আভ্জানো। হঠাৎ আবাসন চত্ত্বরে কুকুরগুলোর চিৎকার আর প্রাণপণ দৌড়। লম্বা লাঠির ডগায় লোহার বড় রিংয়ে মোটা নায়লন সুতোর জাল বানানো। পাঁচ-ছ'জন ক্যাচার ছোকরা সে লাঠি-জাল নিয়ে কুকুরগুলোর পিছনে ছুটে জালের ফাঁদে আটকে দেয়। আবদ্ধ কুকুরের যে কী চিৎকার ! সে আওয়াজে অন্য কুকুররা গোপণ আস্তানা খুঁজতে ছোটে। রডের খাঁচা ঘেরা গাড়িটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে। আবাসনের বাসিন্দারা বারান্দা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখে।

কালুটা ছুটে এসে লোহার দরজা আঁচড়াতে ,খুলে দেয় মঞ্জিমা। কালু ছুটে গিয়ে কাঠের আলমারির তলায় ঢুকে জিব বের করে শ্বাস টানে। এই বিল্ডিংয়ের দুতিন জন বাসিন্দা জাল হাতে ক্যাচারের পিছু পিছু। তারা মঞ্জিমাকে দেখে বলে, 'হ্যাঁ এ

ঘরে ঢুকেছে কুকুরটা। আগে কাউকে কাউকে কামড়েছে। এ ঘরে আছে, ধরে নিয়ে যান।'

'না ঢোকে নি'

'ঢুকেছে।কুকুর নিয়ে ঠুকে ঠুকে কথা, আমাদের নাকি পশু পাখির প্রতি মায়া নেই। কিন্তু কুকুর গুলো কামড়ায় যে... বাচ্চারা খেলতে গেলে দু তিন জনকে কেটেছে', আবাসিক দুজন বলে।

ছোট ছোট বাচ্চা ক'জনকে দরজার নিরাপত্তায় রেখে মায়েরা বলে 'ধরে নিয়ে যান'। সনিয়ার মনে হ'ল, মা বাবার মুখে... গায়ের ত্বকে কত মাস বছর আঁচড় কেটেছে... আর কতদিন কাটবে কে জানে...! সম্মুখের রুমে চোখ ফেলতেই হাওয়ায় ভেসে আসে, ওঘরে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কচি কণ্ঠ...! তাদের সামাল দিতে যুবক দেহের ভারী-স্বর, সনিয়া কান পেতে নাকে পায় পুরুষ গন্ধ..............................! ফর্সা রঙে থলমলে ভারী চেহারায় সনিয়া। শর্টস'য়ের উপর গেঞ্জি চাপিয়ে একদম ফাঁকা। মাথা-ভর্তি কোঁকড়ানো চুল আলগা। মাংসল দুহাতে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। সামনেই লাঠির ডগায় রিংয়ে বাঁধা মোটা নাইলন সুতোর ফাঁসে জাল হাতে ছোকরা ক্যাচার। ক্যাচার ঢুকতে উদ্যোগি হতেই ডানহাতের তর্জনী উঁচিয়ে সনিয়ার কড়া গলা, 'খবরদার ,অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার চ্যারিটিকে এখনই রিপোর্ট করবো। ইনহিউম্যান বিহেভ...! ও আমাকে...'।

সৌ মি ত্র চৌ ধু রী

দেশ গঠনের কাজ

চিচিং ফাঁক। সকালবেলা ম্যাজিক দেখছি যেন। হঠাৎ ঘরের বন্ধ দরজা নড়ে উঠল। দেখতে দেখতে চোখের সামনে... অবাক কাণ্ড। একটু একটু করে খুলে গেল লৌহকপাট। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার গোল গোল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল মিয়াও। আমি ফোকলা দাঁত বের করে ফিক করে একটু হাসলাম। তারপর তৈরি হয়ে নিতে বাথরুমে ঢুকলাম।

আয়নায় নিজের মুখটা আজ অন্য রকম। বাচ্চাদের মত গোটা মুখ জুড়ে খুশি খলবল করছে। বাইরে বেরোবার মজাই আলাদা। বাইরে বলতে বাথরুমের কাছে একফালি জায়গা আর মাথার উপর খন্ড নীল বা কালো আকাশ। এই এতদিন দেখে এসেছি। আজ তাহলে বড় আকাশ দেখবো। বড় গেটের বাইরে যাবো। কত কি দেখব। ভাবতেই মনের মধ্যে নাচন শুরু হল। কি আনন্দ কি আনন্দ!

সাদা দাড়িতে ঢাকা নিজের মুখটা বাথরুমের ছোট্ট আয়নায় আবার দেখলাম। একটা জেল্লা ফুটেছে। চকচকে তাজা ভাব। এই বয়সে তো চোখমুখে জেল্লা থাকে না। ম্যারম্যারে মুখে একটা কালচিটে ভাব লেপ্টে থাকে। ক্লান্তি জড়ানো ঝুঁকে পড়া শরীর। কোন রকমে লাঠি হাতে ধুঁকতে ধুঁকতে পথ হাঁটে বৃদ্ধ।

আমিও বৃদ্ধ। অনেক বয়স। কত, ঠিক বলতে পারি না। মনে থাকে না অনেক কিছু। কী নাম। কোথা থেকে এলাম। বয়সের হিসেবটাও। কেউ জানতে চাইলে বলি, একশ পার করেছি। সেই তখন দুনিয়া জুড়ে চলছিল মহামারি। এন্ডেমিক। দেশে দেশে পটাপট মানুষ মরতে লাগল। আমি মরিনি। একটা প্লেনে চাপিয়ে আমাকে অন্য দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল সরকার। তখন আমার বয়স আশি ছুঁই ছুঁই। একটু একটু মনে পড়ে। টান টান শরীর ছিল। একটা চনমনে ভাব

থাকতো। এখন সে সব কোথায়? ভাঙা শরীর। বুকে বল নেই। হাতে পায়ে জোর পাই না। 'চিমসে গায়ে ঠুনকো হাড়'। কথা না বলে বলে বোধ হয় বোবা হয়ে গেছি। কুড়ি পচিশ বছর বন্দী রেখে এরা কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছু।

তবে একটা কথা বলতেই হয়। তখন শরীর ঠিক থাকলেও মনের মধ্যে একটা অশান্তির কাঁটা খচ খচ করত। কাজের জায়গায় সম্মান শ্রদ্ধা জুটত না। দিন রাত খাটতাম তবু জুটত অচ্ছেদা আর অবহেলা।

এখানে অবশ্য তেমন অসম্মান অবহেলা কেউ করে না। এখানকার মানুষজন তেমন খারাপ নয়। খেতে পড়তে দেয়। বকাঝকা চোটপাট, সে সব খুব একটা করে না। অনেক বন্দীর মত আমাকেও যত্ন করে। একবার জেলের বাইরে নিয়ে গিয়ে আমার পুরানো কিডনি বদল করে দিয়ে কৃত্রিম কিডনি লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে বেশ ভালো আছি।

এরা সময় মত লঙ্গর খানায় খাবার পাঠিয়ে দেয়। কয়েকটা নাম না জানা ফল। ফলগুলো নাকি, এক বন্দী বলেছিল, থ্রি ডি প্রিন্টারে বানানো। ফল ছাড়াও খেতে দেয় কিছু সেদ্ধ তরকারি আর কয়েকটা ট্যাবলেট।

মাঝে মাঝে এরা আদেশ করে। সাউন্ড বক্সে কর্কশ চিৎকার ভেসে আসে। শুয়ে পড়, খেয়ে নাও। ঘুমাও। কেন রে বাবা! নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারবো না? পারবো না। নিজের ইচ্ছায় চলবার হুকুম নেই এখানে। বুঝতে পারি। আসলে ওদের অ্যাপে যা ঠিক করা আছে, আমাকে তাই করতে হবে।

তাই করছি। বুড়ো বয়সে অশান্তি করা কি মানায়? সব কিছুই মানিয়ে নিয়েছি। আগে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে প্রশ্নের খোঁচা টের পেতাম। কে আমি? কোথা থেকে এলাম। ইদানীং সে সব চাপা পড়ে গেছে। মাথার মধ্যে প্রশ্নগুলো ভুরভুরি কাটে না আর। সব মিলিয়ে তেমন কোন কষ্ট নেই এখন। তবে সমস্যা একটা আছে। একটা খিঁচ। আমার কথা এরা বুঝতে পারে না। কথা বললে বা কিছু চাইলে হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর কথা বুঝবার আপ্রান চেষ্টা করে। হাতের ফোনটার উপর ক্রমাগত আঙুল চালাতে থাকে। কোন্ অ্যাপে ঢুকে যে কথার মানে বুঝবে, থৈ পায় না। যেমন আমার বয়স জিজ্ঞেস করেছে অনেক বার। বার বার আমার একই উত্তর। সেবার সেই বিশাল মহামারীর ছোবল পৃথিবী জুড়ে। দেশে দেশে মৃত্যু মিছিল। দুনিয়ার অর্ধেক মানুষ রোগে অক্কা পেল...। রোগের ছোঁয়াচ লাগা মানুষ গুলোকে অনেক দেশ গুলি করে মেরে দিল। আমার বয়স তখন ছিল এই... আশি। এখনকার বয়স, যোগ বিয়োগ করে তোমরা বুঝে নাও।

এরা বুঝতে পারে না। অবুঝের মত মাথা নাড়তে থাকে। বুঝতে পারি, এরা যোগ-বিয়োগ জানে না। অন্যের লেখা পড়তে পারে তবে লেখার মানে মাথায় ঢোকে না। সব কাজ সারে মোবাইল অ্যাপে। অ্যাপ মানে যে অ্যাপলিকেশন, আমি জানতাম। এখানে এরা সব কাজ করে সেই অ্যাপের সাহায্য নিয়ে।

আজ নতুন একটা অ্যাপের মাধ্যমে আমাকে মুক্তি দিল। প্রথমে বুঝতে পারি নি। আমার ঘরের বাইরে এসে হাতে ধরা মোবাইল ফোনটা উঁচু করে ধরে দাঁড়াল মিয়াও। আসল নাম জানি না মেয়েটির। ফর্সা রং। পুতুল পুতুল দেখতে। মেয়েটি রোবট না মানুষ, তাও বুঝি না। দিন দিন বুদ্ধি বাড়ছে মেয়েটার। বয়স বাড়লে রোবটের কি বুদ্ধি বারে? জানি না বাপু। জিজ্ঞাসু মুখে মিয়াও-এর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ওর চোখ দুটো বিড়ালের মত। তাই আমি মিয়াও বলে ডাকি। মিয়াও এবার নিঃশব্দে ওর মোবাইল ফোনের এক জায়গায় আঙুল ছোঁয়াল।

তারপরেই ঘটল ঘটনাটা। ঘরের বন্ধ দরজা চোখের সামনে ধীরে ধীরে খুলে গেল। আমার গোল গোল চোখের দিকে তাকিয়ে ওর ফোনের আরেক জায়গায় আঙুল রাখল মিয়াও। তারপর পরিষ্কার আওয়াজ ভেসে এলঃ ‘তৈরি হয়ে নাও। মেন গেটের তালা খুলে যাবে’। আমি কান খাড়া করতেই স্পষ্ট শুনলাম, ‘তুমি যেতে পারবে জেল প্রাচীরের বাইরে। ফিরে আসবার সময় হলে সিগন্যাল পাবে’।

সাউন্ড বক্স বেশ জোরে আওয়াজ করল। শব্দটা কানে ঢুকতেই প্রথমে হকচকিয়ে গেছিলাম। তারপর মুখে ফুটল চওড়া হাসি। যাক, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। কী আনন্দ কী আনন্দ! একটা যেন সুর ফুটল গলায়। কৃতজ্ঞতা।

যদি পালিয়ে যাই? মনের মধ্যে কথাটা ভুরভুরি কাটতেই উত্তর ভেসে এল, ‘আমাদের ড্রোন তোমার উপর নজর রাখবে সব সময়’। তারপরে আবার ঘোষনা, ‘সাবধান! যদি বেয়াদফি কিছু করতে চাও, আমাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সট করে ধরে ফেলবে’।

ঘাড় নেড়ে মনে মনে বললাম, ঠিক আছে বাবা, পালাবো না। জেলের বাইরে তো পা রাখতে পারবো। বাথরুমের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে একটা ভেংচি কাটলাম। আনন্দ উথলে উঠছে মনের চোরা গোপ্তা খাঁজে। মাথায় ভুরভুরি কাটছে কথা আর কথা। হাততালি দিয়ে কবিতা বলতে থাকলাম, ‘ডাক্তার ফস্টার, ইস্কুল মাষ্টার। বেত তার চটপট, ছাত্রেরা ছটফট’। আহা কি আনন্দ। মুক্তির আনন্দ।

জেলের বাইরে পা রাখবো। অনুমতি এসে গেছে। অনুমতি পেতে সময় লাগল ঠিকই। লাগবারই কথা। অনেক প্রক্রিয়া। ধাপে ধাপে এগোল। প্রথমে আমার হাতে লেখা দরখাস্তের একটা ছবি তুলেছিল ওরা। তখন মিয়াও-এর কপালে ভাঁজ দেখে বুঝেছিলাম, গোটা পাতা জুড়ে লেখা দরখাস্ত আগে দেখে নি ও। এবার সেটা দেখে একটা ছবি তুলল। তারপর অনেক খুট খাট করে কয়েক দিনের চেষ্টায় একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তৈরি করল। এবার লেখাটার কী মানে, কোন ভাষায় লেখা বুঝে নিতে আরেকটা অ্যাপ্ তৈরি করে উপর মহলে পাঠাল। সেখান থেকে আরেকটা নতুন অ্যাপ তৈরি হয়ে আসতে কেটে গেল অনেক গুলো বছর। অ্যাপ তৈরি করতে মিয়াও খেটেছে খুব। ও বুদ্ধিমতী। সপ্রতিভ চোখ মুখ। কিন্তু কথা বলে না।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে বললাম, ‘থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ’। মিয়াও মাথা নাড়াল। কোন উত্তর দিল না। দেবে কী করে! হয়ত ও একটা রোবট।

আবার মানুষ হলেও কথা না বলে বলে জিভটা মোটা হয়ে গেছে। তবে আজকে দেখলাম মিয়াও-এর মুখে হাসি। আমার মুখে আনন্দের ছাপ দেখে মিয়াও ঠোঁট ফাঁক করল। ওর সাদা দাঁতের ফাঁক গলে যেন মুক্তা ঝরল। আমি ওর দেওয়া দামি জ্যাকেটটা জামার উপর চাপালাম। তারপর দেরী না করে অন্য বন্দীদের হাত নাড়তে নাড়তে রাস্তায় পা রাখলাম।

শীতের হালকা রোদ্দুর। ধীর পায়ে হাঁটছি। মনে আনন্দ হচ্ছে খুব। যেন মুক্ত এক খঞ্জনা পাখি। চঞ্চল। খুশিতে অনবরত লেজ নাড়ছে। ফুড়ুৎ করে উড়ে যাচ্ছে দূরে। দূরের আকাশে চোখ মেললাম। কার এক কবিতার লাইন উঁকি মারল মনের ভিতর, ‘আকাশের ময়দানে বাতাসের ভরে, ছোট বড় সাদা কালো কত মেঘ চরে’।

খুশীতে ডগমগ। চারদিকে তাকাচ্ছি। ফাঁকা রাস্তার দু’ধারে নাম না জানা কত গাছ। রাস্তায় সাঁই সাঁই গাড়ি ছুটছে। গাড়ির চালক হাত গুটিয়ে বসে আছে। গাড়ির আওয়াজ নেই। কাছে দূরে কোথাও কোন শব্দ নেই। গাছের ডালে পাখির কিচির মিচির নেই। একটু দূরে দেখলাম একটা বড় মাঠ। অনেক ছেলে মেয়ে। শীতের রোদ্দুর মেখে খেলছে। কী খেলা বুঝতে পারছি না। আমি একটু জোরে পা চালিয়ে একটা খোলা গেট পেরিয়ে মাঠের মধ্যে ঢুকলাম।

অনেক মানুষ আমাকে দেখছে। অবাক চোখ মুখ তাদের। কিন্তু কথা বলছে না কেউ। আমি এগিয়ে গেলাম। দেখি অনেক ছেলে মেয়ে। তাদের বাবা–মা। সব ছোট ছেলে-মেয়েদের হাতে বল। খেলছে না। বল হাতে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে।

এরা কি বল নিয়ে খেলতেও জানে না? একবার ভেবে আমি এক বাচ্চা ছেলের দিকে এগিয়ে গেলাম। কত বয়স বোঝা দায়। চোখ মুখ পাথরের মত। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘যাও বলটা নিয়ে খেল। গোলে শট লাগাও’। কোন উত্তর নেই। জানি কথা বলবে না। তবু আমি বললাম। তারপর আরেক জনের কাছ থেকে হাতের ইশারায় বলটা চেয়ে নিলাম। কী সুন্দর বল। নরম চামড়া দিয়ে তৈরি।

দেখলেই খেলতে ইচ্ছে করে। বলটা মাথার উপর ছুড়ে দিয়ে মাটিতে পড়বার আগেই কিক করলাম। গোল পোষ্টে ঢুকে বলটা জালে আঁটকে গেল।

হাত তালির আওয়াজ পেলাম শুধু। একটা ছেলে টলমল পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে এল। এরা কেউ দৌড়াতে পারে না। বুঝলাম, দ্রুত হাঁটতেও পারে না ও। কিন্তু বাচ্চা ছেলেটা বলে একটা শট মারল। একটু গড়িয়ে থেমে গেল বলটা। আরেকটি ছেলে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। ওদের মায়েরাও দেখি এগিয়ে এসে বলে লাথি মারছে। আর হাসছে। হা হা হি হি শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে সারা মাঠে।

নিস্তব্ধ শহরে হাসির শব্দ! অবাক কাণ্ড। এদের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে! তার মানে চেষ্টা করলে কথা বলতে পারবে এরা। আমার আনন্দ বেড়ে গেল অনেকটা। মজা পেয়ে মাঠের ধার দিয়ে বল পায়ে নিয়ে দৌড়াতে লাগলাম। কিছুক্ষণ দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়লাম। আগের মত কি দম আছে!। বয়স হয়েছে মানতে তো হবেই। বিশ্রাম নেবার জন্য এপাশ ওপাশে ঘাড় ঘুরালাম। চোখে পড়ল একটা বাড়ি। ধূসর রঙ। বেশ পুরানো। বারান্দায় চেয়ার পাতা। চেয়ারে বসতেই ভিতরের দেওয়ালে টাঙানো বোর্ড চোখে পড়ল। কী লেখা বুঝলাম না। তবে মনে হোল, এটা অন্য রকম বাড়ি। একটা জাদুঘর। স্পোর্টস মিউজিয়াম।

পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ডান দিকের প্রথম ঘরটাতে ঢুকলাম। মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়। কী নেই সেখানে! ফুটবল আছে। ছোট বল, ক্রিকেট বল সব আছে। ব্যাট কয়েকশ রকমের। দেওয়ালে টাঙানো বর্শা তির ধনুক। টেবিলে রাখা রিমোটে ক্লিক করলে এগুলোর ইতিহাস শোনা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ওই ঘরে কাটিয়ে পাশের ঘরে মুখ বাড়ালাম। দেখি শয়ে শয়ে সাইকেল। ছোট বড়। এক চাকা দো চাকা তিন চাকা। লাল নীল হলুদ। কত রকমের রঙ আর ডিজাইন সাইকেলের। স্ট্যান্ডে সুন্দর করে সাজানো।

আমি একটা সোনালী রঙের সাইকেল বের করে মাঠে এসে দাঁড়ালাম। সিটে বসে হ্যান্ডেলের দু'দিকে হাত রাখতেই মনে হোল যেন মোষের পিঠে চেপেছি।

মোষ, কালো কুচকুচে তেজী জানোয়ার। ঐ জানোয়ারটা বোধ হয় লুপ্ত হয়ে গেছে। হতেই পারে। এখানে একটাও পশু, এমন কি কুকুর বিড়াল দেখিনি। এরাও বোধ হয় দেখে নি। আমাকে একটা অজানা জন্তু ভেবে অনেক ছেলে মেয়ে ঘিরে ধরেছে। অবাক চোখ মুখ তাদের। চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি ওদের পাশে দাঁড়িয়ে সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলাম। যন্ত্রটা একটু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করল। তারপর চলতে লাগল। প্রথমে ধীরে তারপর একটু জোরে।

আনন্দ হচ্ছে খুব। হঠাৎ একটা কবিতা ভুরভুরি কাটল মাথার ভিতর। আমি মনের আনন্দে কবিতা বলতে বলতে প্যাডেলে চাপ দিচ্ছি। মাঠের সবুজ ঘাসে সোনালী সাইকেলের চাকা ঘুরছে। ছেলে-মেয়েদের অবাক চোখ মুখ। কিছু একটা বলতে চাইছে। কথা বেরচ্ছে না। মুখে শুধু গোঁ গোঁ শব্দ।

আমার জ্যাকেটের পকেটে রাখা জেলখানার দেওয়া ফোনটা বেজে উঠল। ইচ্ছে করছে কিছুক্ষণ আরও থাকি এখানে। কিন্তু উপায় তো নেই। আমাকে ফিরে যেতে হবে। সাইকেলটা জাদুঘরে পৌঁছে দিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম। মাঠের ছেলে মেয়েরা আমার পথ আঁটকে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ফোনে পাওয়া ম্যাসেজটা দেখালাম। ওরা কী বুঝল, জানি না। আমার সঙ্গে হাঁটতে লাগল। কষ্ট হচ্ছে তবু হাঁটছে ওরা। জেলখানার গেট অবধি এল। ওখানে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল বোধহয়।

জেল কতৃপক্ষ মোবাইল অ্যাপে টেপা টিপি করে কী বুঝিয়েছিল, জানি না। পরদিন ঘটল অন্য ব্যাপার। সকাল বেলা আগের অ্যাপ দিয়েই ঘরের দরজা খুলে দিল। আমি মুখ তুলতেই মিয়াও ওর মোবাইলে একটা বোতাম টিপল। সম্ভবত নতুন কোন অ্যাপ। মেয়েলি কণ্ঠে বাংলা ভাষায় মিষ্টি আওয়াজ ভেসে এলঃ তুমি মুক্ত। জেলের বাইরে কাজ করবে। দেশ গঠনের কাজ।

কী কাজ রে বাবা! বুড়ো বয়সে আবার আমি কিছু পারবো নাকি? প্রশ্নটা মনে উঁকি মারতেই নতুন অ্যাপে উত্তর ভেসে এলঃ তোমাকে একটা চাকরী দিয়েছি আমরা। দেশ গঠনের কাজ। ছোট ছেলে-মেয়েদের শেখাবে। তুমি টিচার।

বুঝে গেলাম এখানে ছেলে মেয়েদের খেলা শেখাতে হবে। আর কবিতা। দুলে দুলে কবিতা পড়বে ছেলে মেয়েরা। আর মাঠে ছুটবে। বল নিয়ে খেলবে।

চাকরি পেলে মনটা ভালো হয়ে যায়। আগেও দেখেছি। টাকা তো শুধু নয়। চাকরি মানে স্বাধীনতা। বুক টানটান করে কথা বলতে পারা। মনটা আনন্দে নেচে উঠল আমার। আর মনে পড়ে গেল অনেক কথা। কে ছিলাম আমি?

পুরনো কথা মনে পড়ছে একটু একটু। অনেক ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। মনে পড়ল আমি ছিলাম গরীব দেশের এক মাষ্টার। অস্থায়ী শিক্ষক। শিশুদের খেলা শেখাতাম। ওদের সাথে দুলে দুলে কবিতা বলতাম। কাজটাতে মাইনে পেতাম কম। সম্মানও জুটত না। অথচ ওটাই নাকি এখানে দেশ গঠনের কাজ! অবাক কান্ড। আমি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলাম।

আজ থেকে সেই কাজটাই করবো। মনটা আমার ময়ুরের মত পাখা মেলছে।

গৌ ত ম দে

ফাঁদ

-জানেন তো পূর্ণিমার রাত হলেই এই বাঁশবনে জমাটি আসর বসে...। নটবর মিত্তিরের এই কথায় দোলগোবিন্দবাবু চমকে ওঠেন। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলেন, ধুস তাই হয় নাকি!

-হ্যাঁ মশাই, আমি ঠিক বলছি।

-আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? দোলগোবিন্দবাবু বিরক্তির সঙ্গে জিগ্যেস করেন।

-দেখেছি বলেই তো আপনাকে বলছি।

-কী রকম...কী রকম...? এবার আগ্রহ ভরা জিজ্ঞাসা দোলগোবিন্দবাবুর চোখে মুখে।

-সে এক অদ্ভুত দৃশ্য মশাই। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবেন না।

-তাইনাকি!

-হুম।

-কী সব আজেবাজে কথা বলছেন নটবরবাবু। দোলগোবিন্দ চাকলাদার বাজারের পথে আরও দু'পা বাড়িয়ে বলেন-আপনার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো! যা সব ভুল বকছেন...!

-আরে মশাই, আমার মাথা ঠিক আছে। নটবর মিত্তির আরও দু'পা এগিয়ে এসে দোলগোবিন্দবাবুর শরীর ঘেষে ফিসফিস করে বলে-একটুও মিথ্যে বলছি না মশাই।

-পূর্ণিমার রাতে এই বাঁশবনে জমাটি আসর বসে তাই তো...! ফুঁৎকারের সুর দোলগোবিন্দবাবুর গলায়।

-হ্যাঁ ঠিক তাই।

-যত্ত সব গুলগাপ্পা। বলে দোলগোবিন্দবাবু রাগে দাঁত কিড়মিড় করে ওঠেন। তারপর ডান হাতের তালুতে নাক কঁচলে আবার বলেন-পথ ছাড়ুন তো দেখি। আমার অফিস দেরি হয়ে যাচ্ছে...।

-আরে মশাই, আমিও তো অফিস যাব। নটবর মিত্তির নিজের লম্বা লম্বা দু'হাত উপর নিচ করে আবারও প্রশ্ন করে-মাকড়সা দেখেছেন?

-না দেখার কী আছে মশাই? ঘরেই তো প্রচুর আছে।

-সে তো আমার বাড়িতেও আছে।

-তাতে হয়েছেটা কী? দোলগোবিন্দবাবু বেশ জোর গলায় খেঁকিয়ে ওঠেন।

-সেটাই তো মূল কথা। নটবর মিত্তির খুকখুক করে হেসে নেয় খানিকক্ষণ। হাসি থামলে গম্ভীর গলায় একরকম ফিসফিস করে আবার বলে-পূর্ণিমার আলোতে এই বিশাল বাঁশবনটা বিষাক্ত মাকড়সা হয়ে ওঠে তা জানেন!

-তাই হয় নাকি!

-আমি নিজের চোখে দেখেছি যে...বিশ্বাস করুন!

-আপনার নির্ঘাত মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

-একটুও না। আপনি নাইবা বিশ্বাস করতে পারেন। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। নটবর মিত্তির ঝট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাঁশবনের দিকে তাকিয়ে ফের বলে-সেদিন রাতে ঘরের বাইরে বাথরুম করতে গিয়ে চমকে উঠেছি মশাই। স্বপ্নেও ভাবিনি অমন দৃশ্য দেখব...!

-কী দেখেছেন? দোলগোবিন্দবাবু গালে দু'দিনের বাসি দাঁড়িতে ডান হাতের তালু চুলকে নটবর মিত্তিরের কথার মাঝে জিগ্যেস করেন।

-দেখলাম, বাঁশবনের প্রতিটা বাঁশ যেন বিষাক্ত মাকড়াসার ঠ্যাং হয়ে উদভ্রান্তের মত ড্যাং ড্যাং করে নাচছে...আর ওই সরু সরু কঞ্চিগুলো যেন সব লোম... ভয়ংকর বিষাক্ত লোম... তারপর...।

-তারপর কী?

-দেখলাম টোটাল বাঁশবনটা একটা বিশাল মাকড়সা হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এ তল্লাটে...। নটবর মিত্তিরের কথা মাঝপথে থামিয়ে ভুস করে শ্বাস ছেড়ে চোখজোড়া কুঁচকে দোলগোবিন্দবাবু বলেন- আপনাকে অনেকবার বলেছি, লালজলের মাত্রাটা

একটু কমান। বয়স তো অনেক হল...কালকে একটু বেশি মাত্রায় হয়ে গেছে বোধহয়...।

-কি যে বলেন দোলগোবিন্দবাবু, অন গড, কাল রাতে একটুও লালজল পেটে পড়েনি। নটবর মিত্তির আগের মত দু'হাত উপর নিচ করে হাসতে হাসতে অমায়িকভাবে বলে-জানতাম, আপনি, আমার এই কথা বিশ্বাস করবেন না। শুধু আপনি কেন...অনেকেই বিশ্বাস করবে না। তবে এ কথা সত্য, ওই মাকড়সার ঠ্যাং আমার দাওয়া অবধি চলে এসেছিল। আসতে দেখেছি বিশ্বাসবাবুদের বাড়ি। সত্যবাবুদের বাড়িতেও স্পষ্ট দেখেছি। আপনার বাড়ির উঠানে যে যায়নি তা কে বলতে পারে...!

-থামুন তো নটবরবাবু। সত্যি দেখছি, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দোলগোবিন্দবাবু এবার সত্যি সত্যি রেগে যান। ধমক দিয়ে ওঠেন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বাঁশবনের দিকে তাকিয়ে আবারও বলেন-এই তো চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বাঁশবন।

-সে তো আমিও দেখতে পাচ্ছি। আমি কিন্তু তা বলছি না মশাই।

-অনেক কাঁচা পাকা বাঁশ মাটির দিকে ঝুঁকে আছে। আর আপনি কিনা বলছেন, রাত হলেই এই বাঁশবন মাকড়সার মত জীবন্ত হয়ে এর বাড়ি ওর বাড়ি তার বাড়ি ঘোরাফেরা করে...আশ্চর্য তো!

-হ্যাঁ দোলগোবিন্দবাবু। ঠিক তাই। একদম ঠিক কথা। আপনি ঠিক ধরতে পেরেছেন।

-তাও আবার পূর্ণিমার রাতে! অন্য সময় নয় কেন?

-অমাবস্যা রাতেও দেখা যায়। নটবর মিত্তির খুকখুক করে খানিকটা হেসে আবারও বলে-তবে কী জানেন, গাঁয়ের রাত। হঠাৎই গভীর আর ঘন হয়ে ওঠে...তা তো জানেন। তখন ঠিকঠাক সব কিছু দেখা যায় না।

নটবর মিত্তিরের এই কথাগুলো দোলগোবিন্দবাবুর কানে যায় না। তিনি এক দৃষ্টিতে ওই বাঁশবনের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে অফিস যান। বাজারেও যান এই পথে। এটাই তো মূল রাস্তা ফেরিঘাট কিংবা রেলস্টেশন যাওয়ার। গাঁয়ের সবাই এই পথ ধরে। এমনভাবে বাঁশবনটাকে পর্যবেক্ষণ করেননি কোনও দিন। আজ যেমন করছেন। পূর্ণিমার রাতে এই বাঁশবন নাকি জেগে ওঠে! 'মাকড়সার মত' হাঁটাচলা করে গ্রামের প্রতিটা বাড়িতে। নটবর মিত্তির বলছে। বলছে তারও দাওয়ায় কিনা বিষাক্ত মাকড়সার ভয়াল পায়ের আগমন ঘটেছে। আশ্চর্য! আশ্চর্য লাগে তার! এ কি করে সম্ভব! কালে কালে কত রকমের ঘটনা, কতরকমের কথা যে শুনতে হবে এই মধ্য বয়সে এসে, তা ভাবলেই অবাক হয়ে যান দোলগোবিন্দ চাকলাদার।

এত দিন এই বাঁশবনের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি এসেছেন। অফিসে গেছেন আর পাঁচজনের মত। তখন তো এক হাত চওড়া কাঁচা রাস্তা ছিল। বৃষ্টির জলে রাস্তা কাদায় প্যাঁচপেঁচে হয়ে যেত। তার মধ্যে দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হত। তারপর বাড়িতে গিয়ে জমা কাদা ধুয়ে সাফ করতে হত। সেসব দিনগুলো এখন ইতিহাস। কোনও কোনও দিন রাত হয়ে যেত বাড়ি ফিরতে। তখন এই বাঁশবনের ঠান্ডা বাতাস তাকে দু'দন্ড তৃপ্তি দিত। এখন ঢালাই রাস্তা। সাঁইসাঁই করে সাইকেল, ভ্যানো ছোটে। ছোটে বিকট শব্দ করে মোটর সাইকেল। তখন বুক কেঁপে ওঠে।

এই মুহূর্তে একটা আতঙ্ক জেগে উঠেছে নটবর মিত্তিরের কথায়। চাঁদনি রাতে এই বাঁশবন নাকি মাকড়সা হয়ে খুল্লামখুল্লায় মেতে ওঠে। এসব কী সত্যি? সত্যি কি নটবর মিত্তির মাকড়সার মত কিছু একটা দেখেছে? যদি সে সাপ-টাপের কথা বলত, তাহলে বিশ্বাস করতেন। কিংবা পোকামাকড়। ওই পোকামাকড়ে বহু মাকড়সা আছে। বিচিত্র কিছু নয়। ঘরেও আছে। বাইরেও আছে।

ঘরে তার কলেজে পড়া মেয়ে আছে। শুধু তার কেন? এই গাঁয়ের প্রতিটা ঘরে আছে। এই রাস্তা দিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সেও সাইকেল চালিয়ে ফেরিঘাটে যায়। সেখান থেকে ভুটভুটিতে চেপে নদী পার হয়। তারপর যে যার ইস্কুল বা কলেজে

পৌঁছায়। পরিচিত রাস্তা তাদের। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই বাঁশবন। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের মত ছোট ছোট খাদ আছে। তবে গভীর নয়। হলদে খয়েরি রঙা মরা পাতাগুলো আলো আঁধারিতে নাম না জানা ফুলের মত মাটিতে পড়ে আছে। কয়েকটা খেজুর গাছ বেঁটে মানুষের মত পর্যাপ্ত আলোর অভাবে অনেক কষ্টে বেঁচেবর্তে আছে। অনেক পাখিও আছে। সবই তার চেনা পরিচিত। ওই তো ডাকছে। কি যেন নাম! এই মুহূর্তে মনে করতে পারছেন না। বৃষ্টির জলে টইটই হয়ে ওঠে এলোমেলো খাদগুলো। রাশি রাশি মরা পাতা পচে গিয়ে অদ্ভুত গন্ধ ছড়ায়। অন্য সময় উত্তরের বাতাসে সেই মরা পাতা ঢালাই রাস্তার উপর এসে পড়ে। এখনও ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে।

বাঁশবনটা সনৎ মাইতির। এই গাঁয়ের প্রাচীন বাসিন্দা। বহু জমিজমা আছে এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। পয়সাওলা। তার দুই ছেলে। শহরে থাকে। নামকরা ডাক্তার। তিনতলা আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি। বর্ধিষ্ণু পরিবার যাকে বলে।

মফসসল থেকে অনেক লোক আসে বাঁশ কিনতে। তখন কিছু বাঁশ কাটা হয়। ধুপধাপ, ধপাস শব্দে বাঁশগুলো মাটিতে আছড়ে পড়ে। এক দুই তিন করে পঞ্চাশটা বাঁশের গাঁটরি ঠেলায় বোঝাই করে ক্রেতারা নিয়ে যায়। সনৎবাবু এসব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করেন। কঞ্চিগুলো দড়িতে বেঁধে, মরা পাতাগুলো বস্তায় ভরে, সাঁওতাল মেয়ে-বউরা বাড়ি নিয়ে যায় জ্বালানির জন্য। জায়গায় জায়গায় অন্ধকার ক্ষণিকের জন্য ফিকে হলেও আবার কদিন যেতে না যেতেই যে কে সেই। আলো আঁধারির আলপনা মাটিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দিনের বেলায়ও। তারপর সূর্য ডুবলে বাঁশবনের ভিতর অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে। এক অদ্ভুত শব্দের উচ্চারণে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে বাতাস। কত চেনা জানা পাখি যে ডাকে তার ইয়ত্তা নেই। সন্ধে হলেই সেইসব পাখিদের শব্দ-সুর বাতাসে ভাসতে ভাসতে গাঁয়ের প্রতিটা ঘরে পৌঁছে যায়। একটু জোরে বাতাস বইলে অমনি মরা পাতাগুলো এক জায়গা থেকে

আরেক জায়গায় গিয়ে পড়ে। শিরশির শব্দ হয়। বাঁশগাছের ডগাগুলো মাথা দুলিয়ে আগুপিছু করে।

নটবর মিত্তির সেদিকে তাকিয়ে আবারও বলে-দেখছেন...দেখছেন...!

-কী?

-অনেকটা মাকড়সার পায়ের মতো। কেমন সব হেঁটে বেড়াচ্ছে...!

দোলগোবিন্দবাবু আর দাঁড়ান না। বাজারের পথ ধরেন। তারপর নিজের মনেই গাল দিয়ে ওঠেন। কাকে দেন? নটবর মিত্তিরকে? নাকি সনৎ মাইতিকে?

তখনও নটবর মিত্তির বলে চলেছে-আমার কথা বিশ্বাস হল না আপনার...আমি স্পষ্ট দেখলাম পূর্ণিমার রাতে...!

২

মেয়েদের শরীরের মতো মেয়েদের সাইকেলের শরীর নরম কী? পদ্মার মনে প্রশ্ন জাগে হঠাৎ। কেন জাগল তা বলতে পারবে না। যখন দিয়েছিল সাইকেলটা তখন কী সুন্দর ছিল। ঝাঁ চকচকে। নীল রং। সাইকেলের রিঙে দিনের আলো পড়তেই চিকচিক করে উঠত। মনে হত, সাইকেলের চাকা বুঝি তাদের মতোই হাসছে। ফিকফিক করে। চিকচিক শব্দ করে।

-তোমার নাম কি?

-পদ্মা। পদ্মা নস্কর।

-বাবা কি করেন?

-চাষবাস।

-কোন ক্লাসে পড়ো?

-নাইন।

-বাঃ! দেখে তো মনে হয় না...।

-কোন ইস্কুল?

-পীতাম্বর বালিকা বিদ্যালয়।

-মন দিয়ে পড়াশোনা করো। তোমরাই তো দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত...।

পদ্মা সেদিন খুব খুশি হয়েছিল। মনে মনে হেসেছিল খুব। তারপর প্রশ্ন কর্তা বলেছিল- সাইকেল চালাতে পারো?

-হ্যাঁ। পারি।

-বেশ...বেশ।

সেই নীল রঙা সাইকেলের একটা চাকা গাড্ডায় পড়তেই হুড়মুড়িয়ে রাস্তায় পড়ে গেল পদ্মা। রাস্তার ধারে কাটা গাছের গুড়িতে সামনের চাকার কয়েকটা স্পোক পটপট করে ভেঙে গেল অমনি। বাঁ হাতের তালু ছড়ে গেল। বাঁ পায়ের হাঁটুও রক্ষা পায়নি। পুট করে রক্ত ধুলো ভেদ করে উঁকি দেয় হাঁটুতে আর তালুতে। বন্ধুরা বুঝতেও পারে না এই দুর্ঘটনা। সাঁইসাঁই করে তারাও ছুট লাগায়। বাড়ি ফেরার পথে সবাই প্রতিযোগী হয়ে ওঠে তখন। কে আগে বাড়ি ফিরবে?

পদ্মা একটু থুতু ডান হাতের চেটোয় ফেলে হাঁটুতে আর তালুতে ঘষে নেয়। জ্বালা জ্বালা করে। তালু ইউনিফর্মে চেপে রাখে খানিকক্ষণ। তারপর সাইকেলে ওঠে। প্যাডেলে পা মারতেই সাইকেলের সামনের চাকার কভারে খটাখট শব্দ হয়। শব্দটা বাড়তে থাকে। টুক করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে পদ্মা। তারপর আগাপাশতলা পরীক্ষা করে সাইকেলের। কোথা থেকে শব্দ হচ্ছে? কেন হচ্ছে? সামনের চাকার চার চারটে স্পোক ভেঙে গেল এরই মধ্যে! যাচলে!

এইতো কদিন আগে জাঁকজমক অনুষ্ঠান করে সাইকেল অনুদান দিয়েছে। পদ্মার মতো অনেকেই পেয়েছে। এখনও নতুনের মতো ঝকঝক করছে। খুব খুশি হয়েছিল সেদিন। এখন সেই খুশিটা রাগ হয়ে জমতে থাকে মনের গহ্বরে। এখন অনেকটা পথ সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে যেতে হবে তাকে।

সন্ধ্যা হয় হয়। ঢালাইয়ের রাস্তা। অনেকেই তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। সবাই একই ইস্কুলের উঁচু-নিচু ক্লাসের ছাত্রী। লিপিকা চলন্ত সাইকেল থামিয়ে জিগ্যেস করে-কী হলো রে, তোর সাইকেলে?

-পড়ে গেছিলাম। চারটে স্পোক ভেঙে গেছে।

-এখন তো হেঁটেই বাড়ি যেতে হবে।

-সে তো যাচ্ছি। দেখতেই তো পাচ্ছিস।

-আয় তাহলে। বলেই লিপিকা মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়।

ইস্কুলের ব্যাগটা সাইকেলের হ্যান্ডেলের কেরিয়ারে রয়েছে। একটু দাঁড়ায় পদ্মা। ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে দুই ঢোঁক জল খায়। তারপর আবার চলতে শুরু করে।

ক্রমাগত নির্জন হয়ে যাচ্ছে রাস্তা। বাঁশবনের কাছে আসতেই অন্ধকারটা যেন আরও বেশি করে মনে হয় তার। গা ছমছম করে পদ্মার। এদিক সেদিক তাকায়। কেউ কোথাও নেই। একেবারে সুনসান। তারপর আরও দ্রুত পা চালায়। মনে হয়, কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। একবার্...দুবার...তিনবার।

পদ্মা দাঁড়ায়। পিছন ফিরে তাকায়। আবারও তার নাম ধরে কে যেন ডাকছে! মাটির দিকে ঝুঁকে পড়া বাঁশের ডগাগুলো হারমোনিয়মের রিডের ওপর চলে বেরানো আঙুলের মতো মাটির মধ্যে নড়াচড়া করছে। চলাফেরা করছে। পদ্মার মনে হয়, কারা যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। অজস্র হাত আর পায়ের বাঁধনে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়ছে। চিৎকার করতে পারছে না। মাকড়সার ফাঁদে পড়া পোকার মতো ছটফট করছে।

৩

-ও দোলগোবিন্দবাবু শুনছেন? নটবর মিত্তিরের ডাকে দোলগোবিন্দবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। লুঙ্গিটা কোনও মতে কোমরে জড়িয়ে ঘরের বাইরে আসেন। তারপর জিগ্যেস করেন-কী ব্যাপার!

-গিলে খেয়েছে মশাই...গিলে খেয়েছে!

-কী গিলে খেয়েছে!

-মানুষকে। তখন তো আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করছিলেন না...এখন তো বিশ্বাস হল!

-সকালবেলায় কেন ফালতু কথা বলছেন?

-দোলগোবিন্দবাবু, আমি মোটেও ফালতু কথা বলি না...পূর্ণিমার রাতে ওই বাঁশবন বিষাক্ত মাকড়সা হয়ে ওঠে তা তো বলেছি আপনাকে...এখন ওই বিষাক্ত মাকড়সার পেটে গেছে মেয়েটা।

-কার মেয়ে?

-হরিরাম নস্করের মেয়ে...পদ্মা...পদ্মাবতীর কথা বলছি...শুধু সাইকেলটা খেতে পারেনি। পড়ে আছে। বলতে বলতে নটবর মিত্তির দোলগোবিন্দ চাকলাদারের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে আবারও বলে-যাবেন নাকি দেখতে!

-না।

নটবর মিত্তির চলে যেতেই ঘরের দরজা বন্ধ করেন দোলগোবিন্দবাবু। দক্ষিণ দিকের জানলা খুলতেই চমকে ওঠেন। জানলার শিকে বিষাক্ত মাকড়সার জাল ছেয়ে আছে।

পাশের ঘরে যান। ভরন্ত মেয়ে মায়ের পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। মায়ের মতোই দেখতে সুন্দর। শ্যামলা রং। চোখজোড়া পদ্মর পাঁপড়ির মত। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ছে। ফাইনাল ইয়ার। অঘোরে ঘুমাচ্ছে মা-মেয়েতে। সেদিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর আরেকটা জানলা খুলতেই আবারও ভীষণ ধাক্কা খান। মনে পড়ে নটবর মিত্তিরের কথা...।

দোলগোবিন্দবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে রাস্তা। বহু মানুষ পড়িমড়ি করে হাঁটছে। চিৎকার করছে। করুণ সুরে কাঁদছে। গন্তব্য বাঁশবন। আচমকা স্ত্রী এবং মেয়ের ঘুম ভেঙে যায়। তারাও দোলগোবিন্দবাবুর পাশে এসে দাঁড়ায়।

৪

আবার সেই চেনা পাখিটা ডাকছে। কী যেন নাম! এই মুহূর্তে মনে করতে পারেন না...।

তা প স রা য়
রাঙিয়ে দিয়ে যাও

কুড়ি টাকা থেকে দু'শ টাকা দরে পূর্বপল্লীর পাশের লাল মোরাম পথ জুড়ে পলাশফুলের মালা কেনার তুমুল উত্তেজনা। কাঁচাঘুম ভেঙে উঠে আসার যে বিরক্তি তা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। মেয়েদের চুলের বিনুণি, খোঁপা, হলুদ শাড়ি, মাটির গয়না আর ঠোঁটের রক্তাভায় বসন্ত হুড়মুড় করে চলে এসেছে এখানে। ছেলেরাও জান-প্রাণ দিয়ে পাঞ্জাবী আর পাজামা বা ধুতির সাদায় চরাচর শুভ্রতায় ভরিয়ে দিতে চেয়েছে। মানে একটু বাদের রাঙিয়ে দেবার ক্যানভাস তৈরি করে ফেলেছে।

আমার আস্তানা ট্যুরিস্ট লজে। সেখান থেকে হেঁটে গেলেই হত। মেরে-কেটে দেড় কিলোমিটার পথ। কিন্তু রিক্সায় উঠেছি ভোরের সৌন্দর্য উপভোগ করব বলে। দেখতে দেখতে যাব ছাতিমতলা, উপাসনাগৃহ, প্রকৃতিভবন। রাস্তার ভিঁড়-ভাট্টার চিন্তা রিক্সাওয়ালার মাথায় দিয়ে আমি ফুরফুরে থাকতে চাই। আজ শুধু বসন্তের উচ্ছ্বাসে ডুবে থাকব।

প্রভাত সরণী দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হত। কিন্তু আমি চাইছিলাম পথ দীর্ঘতর হোক, অপেক্ষা গাঢ়তর হোক। যেতে যেতে বনস্থলীর দিকে চেয়ে থাকব। আমের বোলের উপরে যে পাতলা সবুজ ছুঁয়ে আছে, যেন টের পেতে পারি সেই সবুজ আমাকেও ছুঁয়ে আছে। পাহাড়ি ঝর্ণার পাশে বসে যেভাবে অঞ্জলি ভরে তৃষাতুর তৃষ্ণা মেটায়, ঠিক সেরকম দশা হোক আমার। চৈত্র হাওয়া সকাল সকাল আমার পাঞ্জাবীকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আমাকেও খানিকটা উড়িয়ে নিতে চাইছে যেন।

রিক্সাওয়ালা দীনু সর্দার দু'দিন ধরে আমাকে দেখছে। ওর রিক্শাতেই গত দু'দিন শান্তিনিকেতনে এদিক-ওদিক ঘুরছি। সে বলল, " দাদা, আজ একদম ঝাক্কাস লাগছে আপনাকে।"

"হ্যাঁ, সত্যি বলছ ভাই?" নিজের পাঞ্জাবীটা একটু টানাটানি করি। চুলে আলতো হাত চালাই। পাঞ্জাবীর হাতা দুটোর ভাঁজ সমান হয়েছে কিনা ফের চেক করি। গড়িয়াহাটের নামী দোকানের পাঞ্জাবী, জানি বেশ ভালোই হয়েছে।

দীনু সর্দার প্যাডেলের চাপ হালকা রেখেছে। বেশি জোরে ছুটলে তো রাস্তা ফুরিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। তখন সওয়ারি ভাববে এত কাছে, আর কত বেশি টাকা নিল! সে সওয়ারির সাথে ভাব করে নিয়ে তার মনের ভেতর ঢুকে পড়তে চায়। দীনু সর্দার বলে, " দাদা, সঙ্গে আবির লিয়্যাছেন তো?"

আমি বললাম, " না। আমি আবির কিনব কেন? আবির কাকে মাখাব! আমার তো পরিচিত কেউ নেই।"

"সে কি দাদা! হেথায় ওসব লাগে না। হোলির মাঠে সব্বাই আপন, লিজের। ইখ্যানটোতে এমন আলতো করে কপালে মুখে রং লাগায়, যে মনে হব্যে সব্বাই সাত জন্মের লিজের লোক গো।"

আমি মনে মনে শিহরিত হলাম। তাহলে এই যে এত সুন্দরী মেয়েরা চলেছে দোল উৎসবের মাঠের দিকে, এদের কেউ না কেউ আমাকেও আবির মাখাতে পারে! আর যদি মাখায়, তখন আমারও তো একটুকু রং দিয়ে ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করবে নাকি! বললাম, " না তো, আবির তো নেয়া হয়নি। তাহলে উপায়?"

"আরে ঘাবড়ান ক্যান! মুই আছি না। মুই দীনু সর্দার। সেই হাফপ্যান্ট থিকা রিক্সা চাল্যাই হেথা। মুই সব জানি কুন মটকায় রং নিয়ে বস্যে দুকানী। সিখানে রিক্সা লাগিং দুবো।"

দূর থেকে যেন গান কানে ভেসে আসছে। আমি বললাম, "এ মা, দোল যে শুরু হয়ে গেল!"

দীনু পেছনে ফিরে আমার বিষণ্ণ মুখের উপর চোখ ফেলে বলল, "ধ্যুর, আশ্রমের ছেল্যেরা সব্যে প্রথম গানটি ধইরল। হেথাকার পড়ুয়ারা এই গানে

লিজেরাও গলা মিল্যাবে। কত শত্তবার যে গেয়ে গেয়ে মাঠের ভেতর ঢুইকবে, তার ইয়ত্তা নাই!"

বলতে বলতে ও রিক্সা থামিয়ে দেয়। আর নাকি রিক্সা ঢুকবে না। কিন্তু দীনু আমাকে ছাড়ে না। সে বলে,

২

"দাদা, এঁটকে দিছ্যে। হেথা দাঁড়ান, মুই রিক্সাটাকে ওই সরানে তালা দিয়ে ফেল্যা তুমার সাথে আইসছি।।"

"না না আমার সঙ্গে আসতে হবে না। আমি একা একা ঠিক পৌঁছে যাব। তুমি বরং অন্য সওয়ারি দেখ গে যাও।"

সে একটু থমকাল। আমি ওয়ালেট থেকে টাকা বের করছিলাম। ওর মুখের দিকে তাকাইনি। সে মিনমিন করে বলল, " আসলে দাদা, তুমার সাথে গেলে মুই টুকুস দেখতুম ক্যামন সাজিং দিছে সব।"

আমি ঝট করে ওর দিকে তাকালাম। শুধু ওর স্বরে নয় ওর মুখের রেখাতেও বেদনা ভাঙচুর হচ্ছিল। দীনু মাথা নিচু করে বলল, " কত্ত কত্ত দেশ থিকা মানুষ আসে,রং খেলে, আনন্দ নেয়। মুই দেখি বিটিছেল্যারা ব্যাটাছেল্যাদের ক্যামন রং লাগাইছে। কেমন ঝমঝম করে লিজের বুকের ভিতর থিক্যে বসন্ত বের কইরছে। হাওয়ায় সেসব উড়ান দিচ্ছে। ইচ্ছা লাগে। পেছু পেছু যাই । আর ঘুরান আসি। মনরে সামলাই। কই, থুঙ দে। ইসব তুকে মানায় না। ইসব ঋতু তুদের জন্য লয়। গ্রীষ্ম তুদের। তুরা রোদে পুইড়বি। বর্ষা তুদের। তুরা জলে ভিইজবি ...।"

আমি টাকা দিয়ে ওকে বিদেয় করব ভাবছিলাম। ঘুরে ঘুরে সব দেখব। ছেলে মেয়েদের সাজ দেখব, ন্যাচ দেখব। আবির ওড়ানো দেখব। বিশ্বভারতীর ছেলে-মেয়েরা দারুণ রবীন্দ্রগানে নাচে,দেখব। একা একা বলে কিছু নেই। এই ভিড়ের ভেতর ভিড় হয়ে ঠিক এনজয় করে নেব।

দীনু সর্দারের কথায় আমাকে থমকাতে হয়। ভাবছিলাম আমি একমাত্র, যার রং খেলার কেউ নেই, অথচ রঙের উৎসবে এসেছি। কিন্তু দেখলাম, এই ছেলেটিও যে সেরকম বলছে। তবে ওর ভেতর যেন না-থাকা নিয়ে তেমন হাহাকার নেই। একটা দার্শনিক শূন্যতাই ভর করেছে। জগতে আনন্দ যজ্ঞে ওর নেমন্তন্ন নেই, ও জানে। কিন্তু চায় সেখানে জড়িয়ে পড়তে।

খোলের উপরে চাটির শব্দ আলাদা হয়ে উঠছে। সম্মিলিত কণ্ঠের গান 'স্থলে, জলে বনতলে লাগল যে দোল' কানে আসছে বটে, কিন্তু অত কণ্ঠের মাধুর্যকে ছাপিয়ে ওই ঠিন্ ঠিন্ ঠিন্ ঠিন্ মিঠে শ্রীখোলের শব্দ আলাদা হয়ে কানে আসছে। একটু আগের রিক্সাচালক দীনুর কথাও যেমন আলাদা করে হোলির উচ্ছ্বসিত আবহ ছাপিয়ে উঁচু হয়ে এসেছে।

"তোমার বাড়িতে আর কে কে আছে?" আমি শহুরে ভদ্রতায় ওই সরল সাধারণ ছেলেটিকে একটু একাত্ম দেখাতে চাইলাম। কত আর বয়স হবে তার, বছর ত্রিশের বেশি নয়। আমার যদি চল্লিশের আশে-পাশে হয় তো ওর তাই হবে। মনে হয় মা-বাবাকে দেখার চাপে হয়ত বিয়ে-টিয়ে করতে পারেনি। আমার যেমন।

"বাড়িতে আমার বউ আর দুটো গেঁড়ে গেঁড়ে ব্যাটা আছে।"

ভাবনার সাথে মিলল না বলে নিজের মনেই অসহিষ্ণু। বললাম, " বিয়ে করেছ, তা বউ ছেলে-পিলে নিয়ে এখানে এলেই তো পারো!"

"কী যে বল্যেন দাদা! গরীবের ঘোড়া রোগ! মোর বউ রোজ পাঁচশ বিড়ি না বাঁইধলে মোদের দু'বেলা হাঁড়ি চড়তে লাড়বে। ভাড়া করা রিক্সা চালাই। মালিককে রোজ শত ট্যাঁকা দেবার পর কত্ত আর থাইকবে যে দুটো ব্যাটাকে লিয়ে সংসার চইলবে! বঊ পাঁচশ বিড়ি বেঁধে রোজ পঞ্চাশ ট্যাঁকা ঘরে আনে। দুটো ব্যাটাকে দিনভর সামলায়। মোদের কি রঙে ভাইসলে চল্যে!"

"চলো চলো আমার সাথে আজ চলো। তুমি থাকলে আমার সুবিধা হবে। বলতে পারবে এই পাইন গাছটা রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন। এই আমগাছে

তাঁর বৌঠানের দোলনা দুলত। তুমি আমাকে বলে দিতে পারবে রবীন্দ্রনাথ ঘুম থেকে ভোরবেলায় উঠে রামকিঙ্করের বানানো কোন সাঁওতাল মেয়েকে দেখে বলেছিলেন, কিচ্ছু হয়নি। তুমি থাকলে আমার সুবিধা, চলো চলো।”

৩

দীনু সর্দার খুব খুশি হয়। সে রিক্সায় তালা লাগিয়ে প্যান্টের নীচের দিকের গোটানো অংশ খুলে দিয়ে জামা-প্যান্ট হাত দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে একটু বাবু হয়। তারপর বিড়ি ধরাতে গিয়ে মনে পড়ে কলকাতার দাদাবাবু, পছন্দ নাও করতে পারে। সে বিড়ি আবার বুক পকেটে চালান করে দিয়ে মনের সুখকে জানান দিতে গান ধরে ফেলে।

রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আমি পুরোটা দেখছিলাম। বেশ বড় গলায় ধরেছিল গান। ফলে কানে এসেছে।

সে গাইছে,

“পাঁচভেয়্যাদের একান ভারী
তার উধারে বংশীধারী,
বংশীধারীর আছে হনু
তার উধারে বাবুর তনু। ”

চলতে চলতে রঙের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে দীনু। আমার ভেতর থেকে সেই কেনার ইচ্ছেটা ফুরিয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন সাদা-কালো বোধ খেলা করছে। চোখের উপর দিয়ে রঙীন মেয়েরা হেঁটে কলকল করতে করতে চলেছে, কিন্তু যেন ছুঁচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে এই বসন্তেও দীনুর বউকে তো বাড়ির উঠোনে বসে বিড়ি বাঁধতে হচ্ছে। উঠোনের মাটিতে খালি গায়ে, সর্দি ঝরা নাকের দুই ছেলেকে মুড়ির বাটি দিয়ে বসিয়ে রেখে সে নিজের কোমরের ব্যথা ভোলার জন্য দুলে দুলে বিড়ি বাঁধছে। তার স্থির জীবনের ভেতর ওইটুকু

দুলুনি নিজের জন্য নিতে পেরেছে। তার সামনে কোনোদিন রঙের এই আশ্চর্য উৎসব এসে দাঁড়াবে না।

রাস্তার উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে নানা রং ভর্তি প্লাস্টিকের প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে। কিনতে গিয়েও মনে পড়ল সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে কাঁপছে। আর ভারতবর্ষের বাজার পুরোটাই তো চিনের দখলে। এই রং চিনের দেশ থেকে আসেনি তো!

দোকানি জানাল, শান্তিনিকেতনে কখনই কোন খারাপ রং বিক্রি হয় না। এখানে শুধু আবির। আর তার আবির ভেষজ। মানে ফুল থেকে তৈরি হয়েছে। এই হলুদ আবির গাঁদা ফুল থেকে।

আমি বললাম, " তবে ভাই আমাকে দু'প্যাকেট দাও।"

একটা প্যাকেট ছিঁড়ে আবির নিয়ে খুব যত্ন করে দীনুর দুই গালে মাখিয়ে দিলাম। দীনু বোকার মতো কাঁদতে লাগল। বললাম, " চলো উৎসবের মাঠের দিকে যাই, কত লোক এসে গেছে। আমাদের অনেক পেছনে দাঁড়াতে হবে। কিছুই দেখতে পাব না।"

দীনু কাঁদতে কাঁদতে বলল, " সেই কোন ছোটবেলা থেকে রিক্সা চালাই। হেথায় রবি ঠাকুরের আপন দেশে কত্ত মানুষ আসে, উৎসব হয়। উৎসব হলেই আনন্দ। আনন্দ হয় ভাড়া বেশি খাইটতে প্যারি। বেশি পয়সা হয়। আর কিছু লাই। কত্তবার দেখ্যাছি ইখ্যানটো থিকে সোন্দর সোন্দর বিটিছেল্যারা রং মেখ্যে ফিরছে। ওই সরানে কুনো ছেল্যেকে দেখে দাঁড়াইন গিছে। তার গালে রং ঘঁষে ঘঁষে দিছে। মোরও মনে হইছে যদি কেউ কুনুদিন মুকেও রং লাগায়! কিন্তু সেসব তো স্বপন। কয়েক পলক দেখেই প্যাডেলে পায়ের চাপ লাগাই আর সিখান থিক্যা সটকে পড়ি। দাদা, আজ তুমি মোর ওই স্বপন সত্যি করে দিলেন গো!"

ওর কান্না থামাতে এ ছাড়া আর আমার কিছুই করার ছিল না। আর আমি ভাবছিলাম, এখানে কে এমন চেনা লোক বেরিয়ে পড়বে যে সে এসে আমাকে রং

দেবে! তারচে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ফেলে লাভ কী। দীনুই লাগাক আমার মুখে আবির। যে কোনো একজন লাগালেই হল। রং যেন মোর মর্মে লাগে ...।

আমি ছেঁড়া প্যাকেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে বললাম, “ নাও, এখান থেকে আবির নিয়ে আমার মুখে লাগাও। আর হ্যাঁ এই আস্ত প্যাকেটটা তোমার প্যান্টের পকেটে রাখো। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে তোমার বউকে মাখিয়ে দিও। ”

দীনু সর্দার শিশুর মতো আমার চোখে তাকিয়ে তার জীবনের বসন্ত যেন খুঁজে পেল। তার চোখে আমিও দেখে ফেলি রঙের ছড়াছড়ি। সে আমার গালে হলুদ আবির মাখিয়ে দেয়। আমিও ওর মাথার চুল হলুদ করে দিই।

৪

দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে হচ্ছিল এসব। আমি সব রঙের আবিরের প্যাকেট কিনি। দীনুকে বলি, “ তুমি আমার সাদা পাঞ্জাবী সব আবিরের রঙে রাঙিয়ে দাও।”

বলতে বলতে আমি নিজে দীনুর সারা মুখে গায়ে মাথায় নানা রঙের আবির লাগাতে থাকি। হোলি খেলার মাঠের কাছেই চলে এসেছিলাম আমরা। গান হচ্ছিল। বিশ্বভারতীর মেয়েরা গাইছে,“ ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল।”

@ কবিতা - ১

কে ষ্ট চ ট্টো পা ধ্যা য়

করোনা

আজ বিশ্ব জুড়ে অন্ধকার
চারিদিকে মৃত্যুর মিছিল
কার দোষে সংকট প্রবল
লুপ্ত হয় আকাশের নীল।

এ বিবাদ তুচ্ছ করো আজ
গান দাও নিত্য জীবনের
ছন্দে আনো বিশ্বে স্বাভাবিক
কাছে যেন যেতে পারি ফের।

ধরো হাত চলো ভাই সাথে
যাক বয়ে উতলা পবন
আসুক বিমুক্ত নীলাকাশ
কেটে যাক এ বন্দি-জীবন।

বী থি চ ট্টো পা ধ্যা য়

কবি ও পাঠক

গল্পগুচ্ছে জমে আছে বহু অনাদরভরা ধুলো ;
ঝরে পড়ে থাকে উদ্ধৃতি আর কাব্যগ্রন্থগুলো।

কলেজস্ট্রিটের ভিড়-কোলাহল ; প্রেসিডেন্সির গেটে
রবি ঠাকুরের পাতা উল্টোয়; ফুটপাত হেঁটে হেঁটে।

অনেক কিছুই ভুলে যেতে পারি শহরের পথে নেমে
হে কারুবাসনা, জীবন মরণ নিঃশেষ প্রেমে প্রেমে।

কী বলেছিলেন গীতাঞ্জলিতে আমাদের মনে থাকে?
কড়ি ও কোমল অন্ধকারের আড়ালে নিজেকে ঢাকে।

ফ্লাই ওভারের দিগন্ত ছুঁয়ে শহরের উচ্ছ্বাসে,
রবি ঠাকুরকে সত্যি ক-জন মন থেকে ভালবাসে?

সা য় ন্ত নী ভ ট্টা চা র্য

ছেঁড়া শালপাতা

কান্না পর্যন্ত যেতে যেতে কান্না পর্যন্ত যেতে যেতে
আমার ধূসর গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। এইসব বেড়ালের রক্ত মেখে
ঢের বেঁচে আছি। চোখ মরে গেছে কবে! বারান্দায়
ইঁদুরের মশকরা উড়ছে আর ঝুমঝুম করছে রোদ্দুর
কান্নায় আমার বাড়ি হেসে উঠছে। একটু দেরি হবে। রাত্তির নামবে
নিমফুলে আকাশ ঢেকে যাবে। হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে
ভাবব যুঁইফুলের গন্ধের কথা, নদীর মোহ আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে
ফিকে রঙের তারা, হাত খসে যাচ্ছে, পা খসে যাচ্ছে
মাথায় জোনাকি উড়ছে। জোনাকির কারসাজি। মিটমিট মিটমিট
দূরে গঞ্জের বাজার। কান্না পর্যন্ত যেতে যেতে, অন্ধ হবার আগে
এসব বিদূষী খড়কুটো আমি আঁকড়ে ধরব। আমার হাত ভর্তি ভোর

শ ঙ্ক র ঘো ষ

কোভিড-১৯ গল্প

গ্লোবালাইজেশন এখন ছপ্পর ফাড়কে
করোনা-বাতাসে
প্রাচীন আধুনিক মিলিয়ে
বিচিত্র রোমাঞ্চকর জগতে
দিন কাটছে.......

বিশ্বসময়ের গল্প তর্জনী তুলে
ক্রিমিনাল বানিয়ে আমাকে - - - আমাদের বন্ধুকেই
ভয়ঙ্করভাবে আঘাত করেছে....

দিচ্ছি রাষ্ট্রের অপবাদ - - রাজ্যের অপবাদ
আইন অপবাদ, ঠিক মোকাম্মেলের
সেলাই মেশিনের মতোন
ভাঙা দরমার ঘরে
বিদঘুটভাবে......

অথচ, ফাটা তাপ্পিতে তালি দিয়ে
আবার মর্মস্পর্শী অভিনয়ও করছি, আর সেই নবজাতক
ঘাড় কাত করে অদ্ভুত বিস্ময়ে
এই অজানা অগ্নিপথে আত্মজনকে খুঁজে চলেছে
ম্লামচাঁদের আলোয়...... পাশাপাশি নদী আর চুল্লি
পোড়াচ্ছে তখন নাভিকুন্ডলী
প্রাগৈতিহাসিক জরায়ু ভেঙে......

বি জ য় সিং হ
বোন

(তিন দিন হেঁটে পথেই মৃত্যু চন্ডীশগড়ের বালিকা / আ. বা. প. ২২.০৪.২০)

অন্ধ মোষ, তার পিঠে সম্পূর্ণ আমার বোন...; গাছ
সরে ঢিলা সরে মাটি পাল্টে নেয় শাড়ি চুড়ি টিপ
অতিরিক্ত ভাই আমি কাঠ হয়ে আছি; এই দ্বীপে
একদা মানুষ ছিল মানুষ ও পশুর কোলাজ

এখন গীতিকা আছে বীণাপাণি নদী আছে, নদী
বুক উপড়ে হাহাকার করে মুখে কালো রক্ত, ঠোঁটে
বিষ, বিষ থেকে প্রেম প্রেম থেকে রক্তমুখী গোটা
ছড়িয়েছে পাখি-দেহে পাখি থেকে অন্ধে বধিরেও

বধির গুল্মেরা, পথ যম নির্দিষ্ট ও চিহ্নহীন
ও বাউলিয়া ও পেগান - - একযুগ মিশেছে একদিনে
গুহ্যতত্ত্ব থেকে এই একদিন নৈঃশব্দে জড়িয়েছি

রুগ্ন বোন তারই পিঠে অন্ধ মোষ অনির্দিষ্ট জ্যোতি
এছাড়া কিছুই মগ্ন নয় শুধু পর্ব পদ যতি.....
যে পথ ফেরে না তার শব থেকে ছন্দ কুড়িয়েছি।

প্র ভা ত কু মা র মু খো পা ধ্যা য়

মধ্যবিন্দু বলি যদি, কিংবা সন্ধিক্ষণ

দৃশ্যকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য ধন্যবাদ জানাই আলোকরশ্মিকে
অকুণ্ঠ সাধুবাদ। অন্তত, কোয়ারেন্টাইন্ড নয় তারা দূরত্বের প্লুটোঘরে
ভারী হয়ে ভাসছে হাওয়া পাখির ডানায়। কিন্তু কী কারণ?
শূন্যতা তো বলেইছিল স্কাইস্ক্যাপার বানাবে—বায়ুমন্ডলের শেষধাপে শুধু
এত্তো সাহসী বা হলো কী করে - - ইন্তেকাল?

বিবাগী হয়েছে উল্লাস। পাথুরে নৈঃশব্দের মনোগহীন নির্জন রিসর্টে নাকি
হালফিলের গৃহবন্দিদশা কাটিয়ে আসবে একাকী দিনকয়েক
দু-চার কিলোমিটার নভোনীল যেখানে, ইচ্ছা অনিচ্ছার যৌথ প্রয়াসে
আর বাধ সাধবে না ইতস্ততা, মনোমতো
মেঘলা আকাশ হাতে পেয়ে অবশ্যই, ঝলমলিয়ে উঠবে
(হস্তধৃত) নীল রঙের ঘুড়ি - - ছদ্মজিজ্ঞাসায় নিয়মিত

প্রশ্নমুখর থাকবে অবশ্য রাখালদাস। বরাবরই
তার ছানবিনের অভ্যাস।
প্রশ্নোত্তরের অছিলায় জেনে নেবে কী কী ঘোষণা ছিল
খরোষ্ঠীলিপিতে অথবা ভরাচৈত্রের ফুরফুরে মলয়পবনে
ঘূর্ণিবার্তার তিলার্ধের প্ররোচনা ছিল কি?
ঝড়বাদলের হু হু হুঙ্কার কিংবা আস্ফালন? প্রবল, প্রবলতর
অট্টহাস্য করোনার - - টুকে রাখে, মৃত লাখখানেক কীভাবে দুমড়েচুমড়ে
তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে গরবিনী সভ্যতার একশো।
চল্লিশ স্পিড তোলা কতশত স্টিয়ারিং, বাকিবকেয়া
ঘরবন্দি নস্টালজিক - - মুমূর্ষু অ-স্থির।

দি শা চ ট্টো পা ধ্যা য়

সংক্রমণ

প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনতে বেরিয়েছিলাম
রাস্তা ফাঁকা
একদম শুনশান
কৃষ্ণচূড়া ফুল রাস্তা ছেয়ে আছে
কেউ মাড়িয়ে যাবার নেই
যদিও গরম ফুরোলে নিজে থেকে
কৃষ্ণচূড়াও সরে যাবে।
করোনার আয়ু আর কতদিনের জানি না।
ঝড় এলে তখনই হয় ছোটাছুটি.....
খানিক দূরে কেউ গুলি ছুঁড়ল
আওয়াজ ভেসে এল এখানেও
তারপর চুপচাপ সবকিছু।
এ্যাম্বুলেন্সের ভিতর জমছে
প্যাকেটবন্দি মৃত শরীর।
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশের ভ্যান,
চলছে সতর্কিকরণ।
বাগান থেকে খসে পড়ছে শত শত ফুল।
মৃতের সংখ্যার সাথে সাথে বেড়ে চলেছে লকডাউন....
দূরে : ওই দূরের পথ ধরে
কে যেন ছায়ার মতো
হেঁটে যায় দিন মুছে মুছে।

খে য়া স র কা র

মৃতদেহ কথা বলে না

দূরত্বই সমাধান যখন
যে যেখানে দাঁড়িয়ে
খুলে ফেলুক মুখোশ এবং খোলসগুলো
হয় না বোধ হয়
শেষ হয় না ধর্মের পোশাক ধরে টানাটানি
মৃতদেহ কথা বলে না তবু
তর্ক চলতে পারে দিল্লি না কর্নাটক
মোমবাতি না হ্যারিকেন হাতে
তবে প্রশ্ন তুলো না শেষ কোথায়
কিংবা সংখ্যা কত
কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে
পরিবেশ জীবাণুমুক্ত হয়ে উঠবে
তারপরেও কীট পতঙ্গেরা বাঁচবে যেভাবে
হয়তো সেভাবেই লকডাউন শেষে
হেসে উঠবে বন্দিরাও
বেঁচে থাকার ইচ্ছাই যে
শিকলভাঙার গান
যদিও মৃতদেহ কথা বলে না

স্নে হাং শু বি কা শ দা স
কলরবহীন পথটুকু

এখন ইঁট কাঠ পাথরের শরীর থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম
রোজ কীভাবে যেন চেনা রাস্তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি আমি
নস্করপাড়া পেরিয়ে মিডল রোড, জোড়া ব্রীজ – তারও পরে
রোদের জানালা দিয়ে নৈনিতাল – আজও ডাক দিয়ে যায়
আচমকা ধূসর এক সাইকেল বেজে ওঠে কিশোরীর বুকে
স্মৃতি থেকে সরে যেতে থাকে অবুঝ কিশোরের সুদূর প্রান্তর
অকারণে ভিড় বাড়ে আলোহীন চলাচলে
চোখের কাছাকাছি আছে মায়াবী এক নদীর চর
কিংবা হয়তো কিছুই নেই
তাহলে সবটাই যাওয়া আর যাওয়া
বিশ্ববাংলা সরণি পেরিয়ে পঞ্চসায়রের দিকে
সোজা ও সরল পাটিগণিতের পথ ধরে
হেঁটে চলেছে অসংখ্য উইপোকা, নবীন শ্মশানের দিকে

নি র্ম ল সা ম ন্ত

বিজয় পতাকা

শোকাবহ দিবস ধ্বংস করে আমরা চোখে চোখ রাখবো,
আমরা হাতে রাখবো হাত সূর্যমুখী সকালে,
মহামারি-তাণ্ডব শেষ করে আমরা নাইতে যাবো
গাঁয়ের ঘাটে ঘাটে,
দিনরাত জুড়ে অকালমৃত্যুর মিছিল
থামিয়ে দেবো আমরা আগামীর সকালে,
সকালও মুখর হবে স্পন্দিত শিরায়।

এসো অকুতোভয় মানুষ প্রজাতি,
করাল ভীষণ সংক্রমণে পৃথিবী গ্রস্ত !
আমরা মুখোমুখি বসবার পৃথিবী গড়েছিলাম —
পৃথিবী গড়ছি করোনামুক্ত বাতাস নেবো বলে —
পৃথিবী গড়বো উত্তর প্রজন্মের বটের ছায়া ঘিরে ।

আমরা পারবো —
কারণ মানুষই শেষ কথা বলে,
আমরা পারবো —
কারণ মানুষ জানে, মানুষই ওড়ায় বিজয়পতাকা।

ম ল য় পা ত্র

ছোঁয়াচ

এ যদি হত সবুজ ফসফরাসের রঙ
তুমি দেখতে গায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে কী আপদ
হাত থেকে ছাড়াবে বলে হাত ঘষলে দেওয়ালে
ছাড়ল তো না-ই, উলটে কাঁধের পাশে মাথায়
হাতের চেটোর উল্টোদিকে
তারপর আয়নার সামনে দাঁড়ালে
এ কী! চ্যাপলিনের সেই কোকেনের গুঁড়োর মতো
এ তো নাক মুখ কোথাও বাদ রাখে নি।

ভাগ্যিস কোনো রঙ নেই।
আপদ ঠিকই, হয়তো ছুঁয়েও ফেলেছো কোথাও
বুকের ভিতর এতক্ষণে নামিয়ে দিয়েছে এক ব্যাটেলিয়ন
দেখা যাচ্ছে না, তাই ভয়ও নেই।
হয়তো চলে যাবে। এমনিই।

শা ন্ত নু চ ক্র ব র্তী

পরিযায়ী

এতো জায়গা থাকতে কিনা রেললাইনে মাথা
ক্লান্ত? কোন যুক্তি হলো? উল্টোপাল্টা কথা।
আদিখ্যেতা করলে হবে ? করলি তোরাই ভুল
পথের ধারে, ফুটপাতেতে থাকতি ছিন্নমূল।

যাহোক, এখন দিচ্ছি টাকা, পাঁচশ হাজার নয়
মাথাপিছু লক্ষ টাকা, এটাও কি কম হয়?
ভাবছি না যে এমনটা নয়, ফালতু খরচ যত
একশো দুশো করলে আগে, ট্রেনেই আনা যেত।

তবুও দেখো লাইন ধরেই হাঁটছে কত লোক
এত মরণ দেখেও তোদের খুলল না কি চোখ?
বেশ ক'খানা রুটি ছিল আচার রক্তে মাখা
জিনিসপত্র আরো কি সব, খেলনা, হাতের পাখা।

রাষ্ট্র এদের পরিযায়ী নামেই না কি ডাকে
কোথায় থাকে, কোন দিকে যায় কেই বা খবর রাখে
নয়ডা কিংবা বোম্বে-পুনার উচ্চ মিনার খাড়া
সবই এদের হাতে বোনা, সবই এদের গড়া।

রোগ ছড়াবে এরাই এবার এইটা দেখো ভেবে
মূলটা থেকে ছিন্ন এরা কেই বা এদের নেবে?
তবুও এরা মানুষ রে ভাই, ভোটার হয়ত নয়
আর কত লাশ-রক্তে কাটবে চিন্তার সংশয়।।

@ প্রবন্ধ -১

র বী ন ব সু

লেখকদের খেয়াল

"জিনিয়াস" কথাটার ভাষান্তরে যদি বলি প্রতিভাধর, তাহলে মানতেই হয় প্রতিভা মাত্রেই খেয়ালী। পৃথিবীর বিখ্যাত সব প্রতিভাধর শিল্পী সাহিত্যিক, এমন কি বিজ্ঞানীরাও খেয়ালীপনার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন। আপন আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁরা যত সিরিয়াস হন না কেন, বাস্তব জীবনচর্যায় ছিলেন একেবারে বেহিসেবি। হিসেব করে সমাজের আর পাঁচজন মানুষের মত বাস্তবানুগ কাজ করা তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। তাই প্রতিভাধর ব্যক্তির শিরোপাই হল, হয় পাগল, না হলে ছেলেমানুষ ।

যেমন ধরুন, একজন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী জলে ঘড়ি রেখে হাতে ডিম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা তো ভাবব পাগল। কিন্তু আমরা কি ভেবেছি, কী একাগ্র ধীমানতায় তিনি হয়তো কোন জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজছিলেন যার প্রেক্ষিতে ওই মুহূর্তের বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন।

আর একটা উদাহারণ দিই। মনে করুন কোন চিত্রশিল্পী এক নির্জন ফসলহীন মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজের কান নিজে কাটলেন। তারপর সেই রক্তাপ্লুত যন্ত্রণাবিকৃত আপন মুখচ্ছবি ক্যানভাসে চিত্রিত করলেন। আমরা তো ভাবব পাগলামির চূড়ান্ত। সেই সাথে সাথে এটাও ভুললে চলবে না, কী অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণা আর প্রেমহীন হতাশা থেকে সেদিন শিল্পী ভ্যান গঁঘ ওই কাজটি করেছিলেন।

বিশ্বের সর্বত্র শিল্পী, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে খেয়ালীপনা থাকলেও এ ব্যাপারে প্রবাদ হয়ে আছে প্যারিস। সারারাত ওখানকার কাফেগুলো বন্ধ হয় না, সর্বত্র আড্ডা আলোচনা। কোন না কোন আন্দোলনের ঢেউ প্যারিসের জনপথ

প্রতিদিনই আলোড়িত করে। তাই অনেককেই বলতে শোনা যায়,প্যারি হল পাগল আর প্রতিভার জন্মস্থান।

কিন্তু আমরা আজ আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব কেবল মাত্র লেখকদের খামখেয়ালীপনায়। বিশ্বের সমস্ত দেশে সর্বকালে লেখকদের খেয়ালীপনার পরিচয় আমরা পাই। বিশ্বখ্যাত নোবেলজয়ী লেখক থেকে শুরু করে স্বল্পখ্যাত, এমন কি অখ্যাতদেরও বোধ হয় খেয়ালের অন্ত নেই। কেমন সে খেয়াল? মনে করুন একজন লেখক, তিনি পুরুষ। সারাদিন ঘরে বসে লেখেন। কিন্তু যেই সন্ধ্যে হয়, মহিলাদের মত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে সাজেন। স্নো পাউডার কাজল রুজ—সবই ব্যবহার হয়। তারপর গায়ে দামি আতর ছড়িয়ে নৈশ বিহারে বেরিয়ে পড়েন। ইনি এক জন পৃথিবীখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার।

আবার দেখুন একজন নোবেলজয়ী কবি, তিনি প্রতি মাসেই প্রায় ঘর পালটাচ্ছেন। এ মাসে পাকা দালানে থাকছেন তো পরের মাসে চলে গেলেন মাটির বাড়িতে। সে মাস কাটতে না কাটতে মনে হল, এখানে আলোর বড় অভাব। অতএব তৈরি হল কাঁচঘেরা এক বিশাল বাড়ি। কবি উঠে গেলেন সেখানে। আর শুধু উঠে গেলে তো হবে না, এই সব বিচিত্র বাড়ির বিচিত্র নাম তো চাই। তাই হয়ে গেল উদিচি থেকে উদয়ন, শ্যামলী থেকে বিচিত্রা।

যে দু'জন লেখকের খেয়ালের কথা বললাম, একজন গী দ্য মোপাসাঁ আর অন্যজন আমাদের রবীন্দ্রনাথ।

একজন বয়সে তরুণ সুদর্শন ইংরেজ কবি, তিনি জল খুব ভালোবাসতেন। নিজস্ব একটি নৌকোও ছিল। নাম "ডন জুয়ান"। কিছু প্রিয় বই, পানীয় আর সুখাদ্য নিয়ে প্রায়ই নৌকাবিহারে বেরিয়ে পড়তেন। এমনই ছিল তাঁর খেয়াল। ১৮২২ সালের ৮ জুলাই এক সামুদ্রিক ঝড়ে কবির নৌকো ডুবে যায়। আর ফিরে আসেননি কবি পি বি শেলি।

আর এক কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ রোজ বিকেলে তাঁর পোষা কুকুরগুলোকে নিয়ে বেড়াতে বের হতেন। একটু ফাঁকা কোন জায়গা পেলে দাঁড়িয়ে পড়তেন। নিজের সেদিনের লেখা কবিতা জোরে জোরে আবৃত্তি করতেন। কুকুরগুলো চুপচাপ কানখাড়া করে শুনলে, উনি বুঝে যেতেন কবিতা ঠিক আছে। আর যখন কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে আওয়াজ দিত, তখন উনি বুঝতেন এ কবিতাটা ঠিক হয় নি। ছন্দ বা শব্দচয়নে গোলমাল হয়েছে কোথাও। বাড়ি ফিরে আবার সংশোধন করতেন। তারপর বন্ধুদের সামনে পড়তেন বা পত্রিকায় ছাপতে দিতেন। কিন্তু, আপনারা কেউ শুনেছেন এমন সব সাহিত্যরসিক সারমেয়দের কথা?

'ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সী' বইটির নাম তো আমরা সবাই জানি। তার লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের শখ ছিল শিকার করা। আর শুধু শিকার করলেই তো হবে না, তার স্মৃতি-চিহ্ন তো রাখতে হবে। তাই শিকার করা পশুর দেহাংশ শোভা পেত তাঁর ড্রয়িং রুমে, লেখার ঘরে, দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে, এমন কি বেডরুম পর্যন্ত। তাঁর এই বিচিত্র খেয়ালের জন্য বন্ধু প্রতিবেশি, এমন কি আত্মজনেরা পর্যন্ত বাড়ি আসা বন্ধ করে দিয়েছিল মৃত পশুর চামড়ার পচা দুর্গন্ধের ঠেলায়।

মৃত্যু সম্পর্কে এক অদ্ভুত মিস্টিক অনুভূতি ছিল তাঁর। সব সময় ভাবতেন মরতে কেমন লাগে ? যদিও বহুবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন সৈন্যবাহিনীতে কাজ করার সুবাদে। অনেক গুলির দাগ তাঁর শরীর জুড়ে ছিল। কিন্তু শেষ জীবনে মৃত্যুকে নিয়ে তাঁর কৌতূহল এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, শেষে একদিন নিজেই নিজের মাথায় গুলি করে বসলেন। মৃত্যুর উপলব্ধি কেমন তা কিন্তু আর বলে যেতে পারলেন না।

এমনই উদ্দাম প্রতিভাধর আর এক দামাল কবি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর খেয়ালের অন্ত ছিল না। নজরুলের একটা বিশেষ খেয়াল ছিল, ওঁনার মনে কোন আনন্দ বা উল্লাস জাগলে তিনি চিৎকার করে উঠতেন, "দে গরুর গা ধুইয়ে"। ধূমকেতুর কবিকে দেখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। একদিন সকালে নজরুল

গেলেন ঠাকুর বাড়িতে। আঙিনায় ঢুকতে ঢুকতে ডাকলেন, কবি কবি ! কবি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আর নজরুল রবীন্দ্রনাথকে দেখেই চিৎকার শুরু করলেন— দে গরুর গা ধুইয়ে ! কবি মুহূর্তে বুঝে গেলেন এ সেই ধূমকেতুর দামাল কবি। সস্নেহে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন । নজরুল ধরা দিলেন কবির বাহুবন্ধনে।

একবার কল্লোল পত্রিকার অফিসে গেছেন নজরুল। সেখানে আড্ডা দিতে দিতে অনেক রাত হয়ে গেল। এক সময় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বললেন, চলুন, বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে। কথা মত দু'জন গল্প করতে করতে নজরুলের বাসার কাছে চলে এলেন। সেখানে এলে নজরুল বললেন, চল অচিন্ত্য, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। আবার হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে বলতে অচিন্ত্যর বাসার কাছে। এবার অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বললেন, এত রাত হয়ে গেল, আপনি একা যাবেন কবি? আপনাকে শেষ বারের মত এগিয়ে দিই। যথারীতি নজরুলও ছাড়লেন না, অচিন্ত্য, তুমিও বা একা কিভাবে যাবে? পরস্পরকে একটু এগিয়ে দিতে দিতে সেদিন সারারাত কারও বাড়ি ফেরা হল না। বলুন তো কী পাগলামি! আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এর কী ব্যাখ্যা মেলে?

বাংলার দরদী কথাকার শরৎচন্দ্রের দরদী মনের পরিচয় তো সবাই জানে। কিন্তু তাঁর এই দরদ শুধু অসহায় নারীদের প্রতি ছিল না, রাস্তার কুকুরদের প্রতিও ছিল। রাস্তার যত নেড়ি কুকুর পেতেন সব এনে বাড়িতে আশ্রয় দিতেন। ঠিক যেমন পিঁপড়ে ফড়িং আর শালিক পাখি পোষার খেয়াল ছিল শৈশবে শিবনাথ শাস্ত্রীর।

শরৎচন্দ্রের আর এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। বাড়িতে তো বটেই বাইরে কোথাও সভা সমিতিতে গেলে সব সময় সঙ্গে একটা মোটা মুগুর জাতীয় জিনিস নিতেন। গাড়িতে বা সভাতে যেখানে বসতেন হাতের নাগালের মধ্যেই রাখতেন। একবার এক লেখক সাহস করে জানতে চেয়েছিলেন, সঙ্গে মুগুর কেন? সহাস্য শরৎচন্দ্র যা উত্তর দিয়েছিলেন, তার সারমর্ম হল : ওঁনার মধ্যে সব সময় একটা

অজানা ভয় কাজ করত। ভাবতেন, কেউ বোধহয় অকস্মাৎ আক্রমণ করবে। তাই আত্মরক্ষার জন্য ওই মুগুর রাখা।

পৃথিবীতে অনেক ভালো ভালো খাবার আছে। তাছাড়া চায়ের সঙ্গে নোনতা বিস্কুট, চানাচুর বা ওই জাতীয় খাবার তো খাওয়া যায়। কিন্তু শুনেছেন কি জিলিপি সহযোগে চা? হ্যাঁ, রোজ সকালে জিলিপি সহযোগে চা খাওয়ার অদ্ভুত খেয়াল ছিল হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর। সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন অনেকেই দেখেন। নিজের বাড়ি গাড়ি, একটু ভালো থাকা খাওয়া, স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে জমজমাট সংসার। শিবরাম চক্রবর্তীর এমনই খেয়াল,পারেননি তিনি ওই জীবনকে আঁকড়ে ধরতে। খ্যাতির উত্তুঙ্গ চূড়ায় উঠেও তাঁকে কেউ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের মেসবাড়ির সেই পুরনো তক্তপোষ থেকে নামাতে পারেঅনি। আমৃত্যু তিনি সেখানেই কাটিয়ে গেছেন।

রুশ সাহিত্যের এক কিংবদন্তী কবি স্বপ্নের পুরুষ মায়াকোভস্কির (ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি) খেয়াল ছিল লাল কালিতে লেখা। তাই তাঁর কবিতাকে বলা হত লাল কবিতা। প্রেমের কবিতার জন্য তিনি পৃথিবী বিখ্যাত। কবি আত্মহত্যা করেছিলেন। আর আত্মহননের ঠিক আগে যে শেষ কবিতাটা লিখেছিলেন, সে কালির রঙও ছিল লাল। তবে তা নিজের রক্তের রঙ। হাতের শিরা কেটে সেই রক্তে কলম ডুবিয়ে লিখেছিলেন শেষতম স্বগতোক্তি!

আলোচনার শুরুতে রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র খেয়ালের কথা বলেছি। শুধু বাড়ি বদল নয়, আরও কত বিচিত্র খেয়াল ছিল তাঁর সেকথা জানলে অবাক হতে হয়। এক বার এক কবিরাজ শান্তিনিকেতন এলেন। পরামর্শ দিলেন, রোজ সকালে নিমের রস খাবেন একগ্লাস করে। পরামর্শ মত চলল বড় বড় গ্লাসে নিমের রস খাওয়া। কিছুদিন পর এক ডাক্তার কবির কাছে এলেন। কবি শরীরে বল পাচ্ছেন না শুনে পরামর্শ দিলেন, রোজ ডিম খান অনেকগুলো করে। শুরু হল সব ছেড়ে শুধু ডিম খাওয়া। এই না শুনে আর এক বিখ্যাত মানুষ বললেন, ওসব ছাড়ুন। আমিষে শরীর মন দুই-ই ক্ষতি হয়, শরীরে সঠিক পুষ্টি জোগায় নিরামিষ। এতে

বায়ু কুপিত হয় না, শরীরে আনে এক নির্মল প্রশান্তি। কবি তা শুনে অবার নিরামিষ খেতে শুরু করলেন।

একবার ভাবলেন, ভেষজ তেল, নারকেল তেল, সরিষা তেল সবেতেই যখন লুচি ভাজা যারোসিন তেলে ভাজা যাবে না কেন? যেমন খেয়াল তেমনই কাজ। এল কেরোসিন তেলের টিন । ভাজা শুরু হল লুচ। খেতে যাই হোক, পুরো বাড়ি যে গন্ধে ভরে যাচ্ছে, টেকা দায়। তাড়াতাড়ি বন্ধ করা হল কেরোসিনে লুচি ভাজা!

এবার এক বিমগ্ন কবির কিছু আন্তরিক খেয়ালের কথা বলে এ লেখার ইতি টানব। তিনি হলেন রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের সবচাইতে বেশি পঠিত, সব চাইতে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী কবি জীবনানন্দ দাশ। "যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে" সে কবি একা একা হেঁটেছেন, কখনও ঘুমের মধ্যে, কখনও বা স্বপ্নে। তাঁর কবিতার মত কবিও এক বিচিত্র খেয়ালে শিশিরে ভেজা ঘাসে পা ডুবিয়েছেন বার বার। সরীসৃপ শীতল অন্ধকারে হেঁটে গেছেন পার্কে ঘাসে, ট্রাম লাইনের বুকে। কবিজায়া লাবণ্যদেবী রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতেন, কবি পাশে নেই। কী করতেন তখন কবি? কোথায় যেতেন? কবি বন্ধুদের লেখায় জানতে পারি, কবি ঘর ছেড়ে অন্ধকারে একা পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসে থাকতেন। কখনও বা ঘাসে পড়ে থাকা শুকনো ডাল তুলে নিয়ে অন্ধকারে গাছের দিকে ছুঁড়ে দিতেন। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, গাছের ডাল দিয়ে গাছকে মারি কেন জানো? যেমন নিজের হাত নিজের গায়ে লাগলে আমাদের ঘুম ভাঙে না, তেমনই গাছের ডাল দিয়ে গাছকে মারলে গাছের ঘুম ভাঙে না। অথচ গাছে আশ্রয়কারী যে পাখিগুলো তারা জেগে উঠবে! আর সেই এক সমুদ্র অন্ধকারের বুকে তাদের কিচির মিচির শব্দ আমাকে আরও এক গভীরতর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। "অনন্ত নক্ষত্র-বীথি তুমি অন্ধকারে !" এ খেয়ালের কোন অনুভব কি আমাদের চেতনায় জাগাতে পারব? আর এই খেয়ালই তাঁকে চিনিয়ে দেয়, তিনি কবি জীবনানন্দ দাশ।

সো মা মু খা র্জি

কাঙাল কবি

টিলার উপর থেকে যে শক্তিকে ডানা মেলে উড়তে দেখেছিলেন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সেই অসাবধানী, বোহেমিয়ান কবিই প্রকৃত শক্তি চট্টোপাধ্যায়। জীবনের লাগামছাড়া অভিযাত্রী তিনি। তাঁর কবিতার উত্তাল তরঙ্গে আমাদের নিদ্রিত সত্তা থরথর করে কেঁপে ওঠে। বাংলা কাব্যভূমিতে তিনি নতুন নিশান উড়িয়েছেন। কিংবদন্তি জীবন কিংবদন্তি কবিতা সৃষ্টি করেছে। কখনো তিনি পানপাত্রের মদিরতায় সিক্ত করেছেন শব্দাবলি, কখনোবা তর্জনী উঁচিয়ে শাসন করেছেন শব্দের প্রায়োগিক সংস্কারকে।

‘তাঁর সম্পর্কে না চলে পূর্বাভাস, না চলে পরিমাপ।’

[তাঁরই সুবাদে আমি নীলকণ্ঠ – বাদল বসু, প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায় – সম্পাদনা /গৌর শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, একুশ শতক, /সংস্করণ – ২০১৮, পৃষ্ঠা – ১৩৭]

খেয়াল-খুশির কবি শক্তি। তাঁর শৈল্পিক মেধায় তিনি কবিতার তুলো উড়িয়েছেন। মন চাইলেই বেরিয়ে পড়তেন প্রকৃতির অনাবিল অকৃত্রিম পরিবেশে। জঙ্গলের চড়াই উৎরাই, বৃক্ষ-লতার সান্নিধ্যে শক্তি তন্ময় হয়ে থাকতেন। কখনো মৌন হয়ে দুচোখ ভরে দেখেছেন, বুক ভরে শ্বাস নিয়েছেন। পানকৌড়ির মতো চেতনায় ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন কবিতার ভাষা,-

‘....... বৃষ্টি পড়ে রাত দুপুরে
আকাশে চাঁদ শায়া শুকোচ্ছে কি নরম জোছছনা-আলোয় '

[আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি –শ্রেষ্ঠ কবিতা- শক্তি চট্টোপাধ্যায় দে'জ, ২০১৪, পৃষ্ঠা – ১১৭]

বৃষ্টি ভেজা জ্যোৎস্নার এমন পেলব রূপ অনবদ্য। কবি কখনো গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থেকেছেন গাছের মতো। সারা গায়ে মাখতে চেয়েছেন সবুজ, -

‘গাছ তুলে আনো
বাগানে বসাও আমি দেখি
চোখ তো সবুজ চায় !
দেহ চায় সবুজ বাগান
গাছ আনো, বাগানে বসাও।’

[আমি দেখি – শ্রেষ্ঠ কবিতা- শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ, ২০১৪, পৃষ্ঠা – ১৮৯]

আবার কখনো জলপ্রপাতে পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে তাঁর দুচোখ বেয়ে নেমে এসেছে জল। কাঙালের মতো আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন প্রকৃতি – প্রেয়সীর কাছে,-

‘ও গাছ আমাকে নাও, মুহূর্তের জন্যে হলে নাও
তোমার ভিতরে আমি ধীর বেড়ে-ওঠা দেখে আসি।’

[ও গাছ, আমাকে নাও, শ্রেষ্ঠ কবিতা – শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ, ২০১৪, পৃষ্ঠা – ১৬৪]

শালের জঙ্গলে আষাঢ়ের বৃষ্টিতে স্নাত হয়েছেন শক্তি। শস্য ফুটলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখেছেন। শস্যের গন্ধে তাঁর মন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতি গাছের শাখা বিস্তারের মতো মনের ভিতরে ক্রমশ সঞ্চারিত হয়ে গেছে। কষ্ট হয়,-

‘তার ভিতরে কাঁদে বর্ণচোরা শিশু’

[কষ্ট হয়- শ্রেষ্ঠ কবিতা-শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১১৮]

কবি শক্তির উদাত্ত কণ্ঠে তাই শোনা যায়,-

‘আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়’

[স্বরবিতান-৪২, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪২২ পৃষ্ঠা-১১১]

এ অপেক্ষা এ কাঙালপনা কীসের জন্য! এক হাতের মুষ্ঠিতে তার দুঃখ থাকে বদ্ধ, আরেক হাতের করতল প্রসারিত, সে হাতে তার ভালোবাসার কাঙালপনা,

‘আমার কাছে আসতে বলো
একটু ভালোবাসতে বলো
বাহিরে নয় বাহিরে নয়
ভিতরে জলে ভাসতে বলো-
আমায় ভালোবাসতে বলো।
ভীষণ ভালোবাসতে বলো।’

[ছিন্নবিচ্ছিন্ন ৫৪, শ্রেষ্ঠকবিতা, দে'জ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১৩৩]

এমন ভাবে নিঃস্ব হয়ে ক’জন চাইতে পারে ভালোবাসা! ভালোবাসা পেলে যে কবি সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে যেতে পারেন, সেই শক্তি আমাদের বড়ো চেনা। কিন্তু এ শক্তি যে বড়ো শান্ত সংযত। এ শক্তি ভালোবাসার জন্য উঠোনে পিঁড়ি পেতে অপেক্ষা করে থাকেন অনন্তকাল। ব্যক্তিগত জীবনে সহধর্মিণী মিনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় সত্যই হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়। কিন্তু কাব্য জীবনে ভালোবাসার এমন কাঙালপনা---এ তো কবির অতৃপ্ত, তৃষ্ণার্ত হৃদয়েরই দ্যোতক, যা না থাকলে কাব্যে সুগন্ধ ওঠে না, ‘ভারি ব্যাপক বৃষ্টি’ নামে না কবিতার শরীর জুড়ে।

সবাই যেভাবে ভাঙে, ঠিক সেভাবে নয়, পরম যত্নে শক্তি ভেঙেছেন শব্দের বাঁধন। শব্দের ভিতরে যা ছিল তাকে বাইরে এনেছেন, নতুন শব্দজাল নির্মাণ করেছেন। বহু গ্রাম্য অনভিজাত তথা আঞ্চলিক, ইতর, অশিষ্ট শব্দ ভিক্ষা করেছেন তিনি। যেমন, আদুল, নুলো, ঢপের কীর্তন, গোদা, আউরে, বিলোই, বোঁচকা, আকখুটে, ন্যাকড়া, ডাগর, পিমড়ে, কুতকুতে, নেওটা প্রভৃতি। অশালীন শব্দ চয়নে এবং বিদেশি শব্দের ব্যবহারেও তিনি ছিলেন সার্থক শিল্পী। প্রথাসিদ্ধ ছন্দের গড়ন ভেঙে নতুন রূপ দান, চিহ্ন, সংকেত, উপমা, চিত্রকল্প, অলঙ্কারের পারিপাট্যে তার কবিতার অঙ্গসজ্জা হয়ে উঠেছিল অনবদ্য। বাধা গত ভাঙার এ খেয়ালীপনা, শব্দ ভিক্ষা এ সবইতো তাঁর বাংলা কাব্য-সম্ভারকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যই। কিন্তু শক্তি শুধু দুহাত পেতে চাননি।

'আগুন লাগলে পোশাক যেভাবে ছাড়ে'

[যেতে যেতে, শ্রেষ্ঠ কবিতা – শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ, ২০১৪,পৃষ্ঠা-৪৬]

তেমন ভাবেই কাঙাল কবি সব ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছেন। না পাওয়ার রিক্ততায় তাঁর মনে হয়েছে এ জন্মের ক্ষেত্রটাই একেবারে বরবাদ হয়ে গেছে।

তাই তিনি শ্মশান চিতার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেন,-

'ও চিরপ্রণম্য অগ্নি / আমাকে পোড়াও'

[ও চিরপ্রণম্য অগ্নি, শ্রেষ্ঠ কবিতা শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ ২০১৪,পৃষ্ঠা-২৩২]

শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসের দোতলার উনিশ নম্বর ঘর থেকে চিরনিদ্রায় শায়িত শক্তি যখন তুষার শয্যায় শান্তিনিকেতন থেকে কোলকাতা মহানগরীর দিকে যাত্রা করেছিলেন তখনও কি কাঙালের মতোই নিঃস্ব ছিলেন তিনি! তা নিশ্চয়ই নয়। তার কবিতাপ্রেমী অগুনতি পাঠক হৃদয় সিক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর শূন্যতায়। যথার্থ কবি-জীবন কাটিয়েছেন শক্তি। আজও পাঠক হৃদয়ে তাঁর স্থান অম্লান। জীবনানন্দ–সুভাষ–নীরেন্দ্রনাথ পরবর্তী কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যতম, যিনি পাঠকের দুয়োরে ঘা মেরে তাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। এমন কবি কি কাঙাল হতে পারেন !

আকর গ্রন্থ- শক্তি চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ, সংস্করণ - ২০১৪

সহায়ক গ্রন্থ – প্রসঙ্গঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনাঃ গৌড়শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, একুশ শতক, বইমেলা ২০১৮।

স্ব প ন প্রা মা ণি ক

জীবনের ভাঙা-গড়া : কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

"...কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে।"[১] কবিকে কোথায় খুঁজব? তার জীবন কাহিনীতে নাকি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। বহুল চর্চিত এই বিষয়ের বাইরে গিয়ে যদি বলা যায় যে, যে কবির জীবনটাই কবিতার সামগ্রী হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে কবির জীবন কাহিনী পড়তে হয় বৈকি। হ্যাঁ, ষাটের দশকের তথা সমগ্র কাব্যসাহিত্যে একমাত্র 'শ্রমিক কবি' কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। যিনি ছিলেন দুর্গাপুর স্টিল ফ্যাক্টেরির শ্রমিক। অক্লান্ত পরিশ্রম ও জীবন জিজ্ঞাসা কবির শ্রমিকসত্ত্বা সৃষ্টিসত্ত্বায় পর্যবসিত। একজন সরল-সাধারণ মানুষের ভাবনায় উঠে এসেছে মানুষের কথা, শ্রমিকের ভাবনা। এই সন্দর্ভে আমি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের এখনও পর্যন্ত জীবনপরিক্রমার সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব।

কোনও লিখিত পুঁথিপত্র বা ডায়েরি নয়, স্মৃতির পৃষ্ঠায় ভর করে কবি আজও বলে যান তাঁর জীবনের আদি লগ্ন থেকে বর্তমানের যাত্রার কাহিনী। কবি পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল বর্তমান বাংলাদেশ। যদিও সেখানে আর কিছুই এখন নেই। কবির জন্ম ১৯৩৪ সালের ২২শে মে বিহারের সাসারামে। পিতা-মাতার অষ্টম গর্ভের সন্তান হওয়ার দরুণ কৃষ্ণের অনুকরণে তাঁকে বাল্যে কেষ্ট নামে ডাকতেন পিতা। আর সেই নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন। পিতা উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি ব্রিটিশ বিরোধ, উদার, ব্যক্তিত্বপূর্ণ। মাতা বীণাপাণি দেবী ছিলেন মায়ের মতোই। উপেন্দ্রনাথ স্টেশান মাষ্টার হওয়ার কারণে কোনও একজায়গায় স্থায়ী বসবাস হয়নি কবি পরিবারের। কবির জীবনযাত্রা বেশ সর্পিল। পরিবেশ যত বদলেছে ততই মোড় ঘুরেছে কবি জীবনের।

অন্যান্য সাধারণ শিশুর মতোই কবির ছোটোবেলায় একইরকম কেটেছে। ছিল না তেমন আদর যত্ন। বিলাসিতার তো বালাই ছিল না। যাযাবর জীবনের প্রথম বসবাসের স্মৃতি কবির কথায় হুগলির বংশবাটি। খুব ছোটো ছিলেন বলে কেবল কয়েকটি টুকরো ছবি ছাড়া তেমন কিছু মনে নেই। যেমন রেল কোয়ার্টারে থাকা, সামনে রেলস্টেশন, বেশি ট্রেন চলাচল না করলেও ট্রেনের আসা যাওয়া, রেলের আমবাগানের পাশাপাশি রামশকুল নামে এক ব্যক্তিকে কবির খুব মনে পড়ে। যিনি খুব ভালোবাসতেন কবিকে। রেলেরই কর্মচারী ছিলেন বোধহয়।

বংশবাটির পর সিঙ্গুরবাস। শৈশবের ঘটনাগুলির মধ্যে সিঙ্গুরের ছবিই কবির চোখে-মুখে বেশি করে ফুঁটে ওঠে। সাধারণত যে বয়সটাতে প্রথম স্কুল, বন্ধু, খেলাধূলার সেটা কেটেছে এখানেই। সিঙ্গুরে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক দুটি স্কুল ছিল। দুটি হাসপাতাল ছিল। কবি স্কুলে যেতেন ঠিকই, কিন্তু মনটা পড়ে থাকত জানালার বাইরে খেলার মাঠে। ছোটোবেলাতেই খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। শুধু খেলা নয়, আশেপাশে ফুটবল ম্যাচ হলে দেখতে যেতেন। বাইরে থেকে প্লেয়ার এলে খেলার শেষে তাঁদের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যেতেন। পূর্বপুরুষের কেউ খেলাধূলায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলে কবির জানা নেই। পরবর্তীকালে তিনি ফুটবল খেলায় দক্ষ প্রমাণ করেছিলেন তার হাতেখড়ি সিঙ্গুরেই।

ফুটবল খেলার পাশাপাশি শৈশবের আর একটা নেশা ভীষণভাবে টানত, সেটা সঙ্গীত। এবিষয়ে তাঁর বড় প্রেরণা ছিল পিতার মামাতো ভাই স্মরজিৎ কাঞ্জিলাল। ইনি সেসময় লক্ষৌর মরিস কলেজ থেকে সঙ্গীত বিষয়ে পড়াশোনা ও ডিগ্রি অর্জন করেন। আসা-যাওয়া ছিল কবিদের বাড়িতে। যখনই আসতেন, তখনই গান গেয়ে শোনাতেন। কবি মন দিয়ে শুনতেন। ক্রমেই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত কবিকে পেয়ে বসে। সঙ্গীতের সুর ভেসে এলেই তিনি বিভোর হয়ে শুনতেন। বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি মৃদুস্বরে রেডিওতে গান শুনতেন। তানসেন সঙ্গীত আসর, সাধারণ সঙ্গীত আসরের কথা আজও মনে পড়ে কবির। শুনে শুনে বলে দিতে

পারতেন কোন যন্ত্রাংশ কে বাজাচ্ছেন। হুগলীর শ্রীরামপুরে চলে আসার পর তিনি গঙ্গার সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। কুমিরজলা রোডের শ্রীরামপুর টকিজ থেকে ভেসে আসা গান তাঁর মন-প্রাণ জুড়িয়ে দিত। গান শোনা শুধু নয়, শেখার জন্য পরে টাকা জমিয়ে একটি হারমোনিয়ামও কিনেছিলেন তিনি। কিন্তু সাংসারিক জটিলতায় তা আর শেখা হয়ে ওঠেনি। এখানে থাকাকালীন খেলাধূলাও বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমত বন্ধু দ্বিতীয়ত মাঠের অভাবে।

সালটা ১৯৪৬, কবির বয়স ১২ বছর। শ্রীরামপুরের পর্ব শেষ। এবার যাত্রা দুর্গাপুর। খাঁচার পাখি ছাড়া পেলে যেমন মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায়, কবিরও যেন সেই দশা। এখানে অনুকূল পরিবেশে কবি পুনরায় খেলাধূলা আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে ফুটবল খেলা ও সঙ্গীতই জীবনের প্রথমদিকের প্রিয় বিষয় ছিল। পড়তেন তারকনাথ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। তবে পড়াশোনাটা ব্রাত্যই থাকত বলা যায়।

১২-১৩ বছর হলেও ঘরের মধ্যে বাইরের রাজনৈতিক ঢেউ যে আছড়ে পড়ত তা মনে আছে অল্পস্বল্প। কবির বড় ভগ্নিপতি কমরেড ডঃ নরেশ ব্যানার্জী ছিলেন খিদিরপুরের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। এঁনারই কারণে দাদা জ্যোতিবিকাশ পার্টির হোলটাইমার রূপে যোগ দেন। ১৯৪৭ -এ দেশ স্বাধীন হলেও কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে কংগ্রেস। জ্যোতিবিকাশ ধর পড়েন এবং তাঁর স্থান হয় হুগলি জেলে। এই সমস্ত কারনে সংসারের মধ্যে একটা অস্থির, অসুস্থ পরিবেশ বিরাজ করত।

১৯৪৯ সাল নাগাদ দুর্গাপুর থেকে কবিরা চলে আসেন সকরিগলি ঘাটে। এটা বাংলার সীমানা বলা যায়। আর একটু এগিয়ে গেলেই সাহেবগঞ্জ বিহার। সেই সময় আসামের সঙ্গে যোগাযোগের একটাই ট্রেন চলাচল করত, তার নাম আসামলিঙ্ক। এখানকার ছবিটাও বেশ আনন্দের কবির কাছে। তিনি পড়তেন রামপুরহাট স্কুলে, থাকতেন ছাত্রাবাসে। কাজের সূত্রে পিতার বিভিন্ন জায়গায় বদলির

কারণে কবির পড়াশোনাও হতে লাগল ছন্নছাড়া। তবে খেলাধূলা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ছিল। তাঁর খেলার পারদর্শিতা দেখে খেলার শিক্ষক গোবিন্দ সেনগুপ্ত খুব ভালোবাসতেন। ইনি কবিকে বলেছিলেন কলকাতার যে কোনও বড় ক্লাবে ফুটবল টিমে সুযোগ পেয়ে যাবেন। ফলপ্রসূও হয়েছিল। পরবর্তিকালে বারাসাতের সুভাষ ক্লাবে তিনি সুযোগ পেয়ে যান। দলকে যেমন জিতিয়েছেন তেমনি প্রচুর ব্যক্তিগত ট্রফিও লাভ করেন।

বারাসাতে আসার পর পরিবারের সংকট আরও বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে জ্যোতিবিকাশ জেল থেকে ছাড়া পান। দাদার উন্নতির জন্য এবং রাজনীতি থেকে মন ঘোরাতে উপেন্দ্রনাথ প্রথমে ওষুধের দোকান পরে একটি লরি কিনে দেন। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। ওষুধ দোকান পরিণত হয় রাজনীতির আড্ডাখানায় আর লরি ব্যবহার হত সামাজিক কাজে। আয়ের দরজায় খিল পড়ল। ওষুধ দোকান আর লরি বিক্রি করে দেন পিতা। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া দিয়ে কোনওরকমে থাকার চেষ্টা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা হয়। শেষমেষ বাড়ি বিক্রি করে ভাড়া বাড়িতে থাকার সংস্থান হয়। পরে অবশ্য জ্যোতিবিকাশ ঘুরে দাঁড়ান, সফলও হন।

১৯৫২ পিতার চাকরি থেকে অবসর, অর্থসংকট কবির জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। দশম শ্রেণী সম্পূর্ণ করে স্কুল শিক্ষায় ইতি পড়ে। শুরু কাজের সন্ধান। কয়েকবছর পর ১৯৫৮ সালে সিঙ্গুরের বাল্যবন্ধু রঞ্জিত রায়চৌধুরীর হাত ধরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় অস্থায়ী কর্মীরূপে যোগদান করেন। কঠিন কর্মের বন্ধনে কবির প্রিয় খেলধূলা ও সঙ্গীত দুটো মুছে যেতে থাকে। হয়তো প্রয়োজনও ছিল। এক রাস্তা বন্ধ হলে যেমন আরেকরাস্তা পথ দেখায়, তেমনি কবির জীবনে কবিতা হঠাৎ করে পেয়ে বসল। কবির কথায় যেমন করে খেলাধূলা কিংবা গান ভালো লেগেছিল একইভাবে কবিতাও। যন্ত্রাংশের মাঝে কবিতার কোনও জায়গা নেই, তবুও তিনি যন্ত্রাংশের নাম লেখা চিরকূটের অপরপৃষ্ঠায় সুযোগ পেলেই লিখে ফেলতেন দু'চার ছত্র।

বারাসাতে থাকাকালীন বন্ধু পুনু ভট্টাচার্য একদিন ক্ষেত্রগুপ্তকে জানান যে, কেষ্ট বাবু কবিতা লেখেন। ক্ষেত্রগুপ্ত ওই পাড়াতেই থাকতেন, সেই সময় খুব নামকরা ছাত্র। ক্ষেত্র বাবু কবিতা নিয়ে ঘরে ডেকে পাঠালেন কবিকে। কবিতা পড়ে ভালো লেগে গেলো। তিনি কবিকে বারাসত যুব উৎসবে কবিতা পাঠ করতে বললেন। পাঠও করলেন এবং সুনামও অর্জন করলেন। ক্ষেত্রে গুপ্তের উৎসাহে সেই প্রথম মঞ্চে ওঠা। দুর্গাপুরে কাজে যোগ দিয়ে লেখায় কিছুটা ছেদ পড়ে ঠিকই, কিন্তু প্রতিভাকে তো চেপে রাখা যায় না। ১৯৬২ সালে দুর্গাপুর যুব উৎসবে কবিতা পাঠ করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

বাড়ির রাজনৈতিক আবহ কবির মধ্যেও সুপ্ত ছিল। ১৯৬৪ সালে তিনি দুর্গাপুরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার হন। ১৯৬৫ সালে কালচার বিভাগের কনভেনর। ১৯৭২ সালে দুর্গাপুর গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। লড়াই করেছেন লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে। আজও তিনি আর্দশ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি বলেন, 'যাঁরা প্রকৃত মার্কসবাদী তাঁরা হয় দলের নাহয় বসে যাবেন, কখনও অন্য আর্দশে পা বাড়াবে না।'[২] আর্দশ থেকে বিচ্যুতিকে তিনি ভালো চোখে দেখতেন না। জীবনে ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন। ঠিকা শ্রমিকদের জন্য বন্ধুকের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের স্থায়ীকরণ করেছেন।

(খ)

“বাংলা কাব্যক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে যেসব কবিরা জন্মগ্রহণ করেছেন-এমন কবিরাই ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাব্যচর্চায় রত।”[৩] আবার অধ্যাপক তরুণ মুখেপাধ্যায় বলছেন জন্মসাল অপেক্ষা প্রথম কাব্য কিংবা মৌলিক কবিতা প্রকাশের সালকে গুরুত্ব দিলে উচিত বিচার হয়। এই দুই দিক থেকে দেখলেই কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়কে ষাটের দশকের

কবি বলতে কোনও অসুবিধে হয় না। কারণ কবির জন্মসন ১৯৩৪। অন্যদিকে তাঁর প্রথম মৌলিক কবিতা পাঠের জন্য ১৯৬২ সালে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত যুব উৎসব থেকে পুরষ্কৃত হন। এরপর থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখালিখি প্রকাশিত হতে শুরু করে।

ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে পূর্বজ কবিদের ছায়া পড়ল ঠিকই, একইসঙ্গে স্বাতন্ত্র্যও ধরা পড়ল। এই দশকের কবিদের মধ্যে রয়েছেন তুষার রায়, কবিরুল ইসলাম, দীপেন রায়, মলয় রায়চৌধুরি, নীরেন্দু হাজরা, গনেশ বসু, উৎপল কুমার বসু, সমীর রায়চৌধুরি, দেবী রায়, কৃষ্ণা বসু, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোক সরকার, আশিষ সান্যাল প্রমুখ। কবি মনীন্দ্র গুপ্ত চল্লিশের দশক থেকে লিখলেও প্রথম কবিতার বই 'নীল পাথরের আকাশ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। হাংরি জেনারেশন ও কাব্যান্দোলন বাংলা কবিতায় মোড় ঘুরিয়েছিল এই পর্বে। কাব্যান্দোলনের প্রবক্তা মলয় রায়চৌধুরির কথায়, "...কবিতা ব্যক্ত করবে মানবিক, দৈহিক এবং শারীরিক ক্ষুধার কথা।"[৪] যদিও হাংরির এই কবিরা বিভিন্ন কারণে নিন্দিত। কারণ তাঁরা প্রচলিত নিয়মের বাইরে যেতে গিয়ে আচরণে স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দিয়েছে। আপাত কুৎসিত বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবুও এই সময়ের কবিদের লেখনীতেও বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কাব্যফসসল পাওয়া গেল। মলয় রায়চৌধুরির কাব্য 'শয়তানের মুখ'(১৯৬৩), 'তুষার রায়ের 'ব্যান্ড মাষ্টার'(১৯৬৯), 'মরুভূমির আকাশে তারা'(১৯৭৪), দীপেন রায়ের 'রাখাল বালকের সাথে'(১৯৭৩), গনেশ বসুর 'নিজের মুখোমুখি'(১৯৬৭) প্রভৃতি। এই পর্বে এক স্বতন্ত্র ভাবনার, নতুন দৃষ্টিকোণের কবি হলেন কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দর্শন, সমাজভাবনা, আত্মানুভূতি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি কবিকে সমকালের থেকে অনেকটাই পৃথক করে রেখেছে বলা যায়। অন্যান্য কবিরা দূর থেকে শ্রমিকদের দেখেছেন, কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু কেষ্ট বাবু নিজেই একজন শ্রমিক। তাঁর সঙ্গে শ্রমিকের সর্ম্পক রক্তের। সেই কারণেই তাঁর কাব্যে শ্রমিকের

গাথা জীবন্ত পল্লবিত হয়েছে। কবির কবিতার নাম সংগত কারণেই 'কবি কারো দাস নয়'। তিনি ভালো চোখে দেখেননি কিছু পাওয়ার জন্য রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর কাছে শিল্পীদের মেরুদন্ড হারিয়ে যাওয়াকে। সমাজের উপর শিল্পীর দায়বদ্ধতার অস্বীকারকে। তবুও তিনি আশাবাদী। একদিন প্রতিবাদ হবে, শিল্পী তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেবে, মানবিকতার জয়ধ্বনি শোনা যাবে। 'সুকান্ত' কবিতায় কবি বলছেন-

''তবুও আশায় থাকি ঘুম নেই রাতে / বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে এ জীবন কাটে''[৫]

'সব পথ ঘুরে' কবিতায় তিনি বলছেন-

'এইভাবে বাঁচুক সবাই
গড়ে তুলুক বিশ্বাসে এভাবেই মানুষের উজ্জ্বল স্বাক্ষর...'[৬]

(গ)

কবি হওয়ার লক্ষ্যে নয়, বরং ভেতরের একটি তাগিদেই লেখার জন্ম। সালটা ১৯৪৬-৪৭ নাগাদ। প্রথম জীবনের আবেগভরা ছোটো-বড় বেশ কিছু কবিতা লেখেন কবি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই কবিতার খাতা পাওয়া যায়নি। কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'বসুমতি' পত্রিকায় ১৯৫৭-এর মাঝামাঝি। এরপর 'স্বগত সাহিত্য', 'যাত্রিক', 'মাঠ-ময়দান-কারখানা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। কবিতার লেখার প্রেরণা কি? কবি বলেন, বারসাতে থাককালীন একজনের পূর্বরাগে পড়েছিলেন ঠিকই, তবে তাঁকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়নি। তবে কবিতা লেখার পিছনে একদিকে খেলাধূলা, সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা কাজ করেছে। অন্যদিকে বারাসাতে থাকাকালীন শিশুদের সংস্থা পাতাতাড়িতে কাজ করেছেন। সেখানে বাচ্চাদের জন্য সঙ্গীত ও গানের স্ক্রিপ্ট লিখতে হতো। সেই অভিজ্ঞতাও অন্যতম প্রেরণা। সলিল দত্তের সৌজন্যে পড়তেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমারী দেবী, অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা। কবিতা লেখার জন্য ছন্দজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। এই ছন্দজ্ঞান তিনি কিছুটা শিখেছিলেন কবি দূর্গাদাস সরকারের কাছ থেকে। চার দেওয়ালবদ্ধ প্রথাগত শিক্ষার ভুরি ভুরি ডিক্রি ছাড়াই তাঁর দার্শনিকতা পৌঁছে গেছে

বিশ্বজনীনতায়। কবির প্রতিবাদের স্বর মুখরিত হয়েছে 'শ্রমিক কবির প্রতিবাদ কবিতা'(২০১৩) কাব্যগ্রন্থে। ১৯৯০-এ কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি একের পর এক কাব্য লিখে চলেছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর বাইশটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শরিক না হলে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। একে একে 'স্বাধীনের এই স্বাদ'(১৯৭৬), 'কবি কারো দাস নয়'(১৯৯০), 'চর্তুদশপদী কবিতা'(১৯৯৭), 'কমরেডস্, লাইনটা সোজা করুন'(১৯৯৭), 'দিন, অস্ত্র দিন'(২০১১),'আমাদের কাজের মাসি'(২০১৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার মুখে।

কবি তথাকথিত বিশাল ডিগ্রিধারী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি নন। দুর্গাপুর কারখানার স্থায়ী কর্মী হওয়ার সূত্রে সেখানকার জীবনযাত্রা, দৈনিক কর্মকান্ড কবির মজ্জাগত হয়ে আছে। তাঁর কাব্যে শ্রমিকশ্রেণী সেই জন্যই জীবন্ত। তিনি মানবতার কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘শরিক না হলে’-তে পাই-

“...প্রতিদিন নিয়ে যায় সৃষ্টিছাড়া এ সৃষ্টিকে
অনির্দিষ্ট গতি থেকে সুনির্দিষ্ট পথে
তোমার সে অদৃশ্য অঙ্গুলি
মানবের মানবত্বে বারবার।”[৭]

জীবনে কৃতকার্য হতে কে না চায়। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণ করতে হলে, সত্যি করতে হলে অর্থই কবির কাছে প্রধান বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘কবিতার পটভূমি সংবাদ’-এ পাই ‘সহস্র ইচ্ছাকে দড়ি বাঁধে অর্থের অসহযোগ’।[৮] 'মুখুজ্জ্যে মশায় আপনি কি কৃতকার্য হলেন' কবিতায় কবি যেন ধনতন্ত্র বিনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভিয়েতনামের উপর মার্কিনী আক্রমণ কিংবা কেরালায় কমিউনিস্ট ভাঙনকে ভালো চোখে দেখেননি-

“...অতঃপর ধনতন্ত্র কি আত্মহত্যা করবে অনায়াস!
ভিয়েৎনাম, কঙ্গো, কিউবা, ডোমিনিকান, এশিয়া-আফ্রিকা

কোথায় ক্রুশ্চভের নির্বিবাদ গলা..
কেরালায় কার কন্ঠস্বর?"[৯]

শ্রমিকের অধিকার নিয়ে বারবার কলম ধরেছেন তিনি। পৌঁছে গিয়েছেন বিশ্ববোধে। 'ব্যুরোক্র্যাট' কবিতায় তিনি লিখছেন-

"...শ্রমে ঘাম দিয়ে যাও সব কিছু বিনীত সম্মান
নচেৎ একত্র হও, রক্ষা করো রক্তে অধিকার
মুক্ত করো এ লাঞ্ছনা, কেটে যাক বিপন্ন আঁধার।"[১০]

এই কবিই 'কিছু তো দাঁড়িয়ে নেই' কাব্যগ্রন্থে সোচ্চারে বলে ওঠেন- "আমরা সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে আছি তবু, কাউকে খুশি করার জন্য লিখি না। প্রথম যখন লিখি তখন কিছু পাবার জন্যও লিখিনি, চরম দুর্দিনেও না। বরং যা লিখেছি তা মানুষের জন্যিই লিখেছি। এখনো সেই পথেই আমাদের ক্লান্তিহীন যাত্রা।"[১১] কবির একটি অসামান্য কাব্যগ্রন্থ 'কমরেডস্ লাইনটা সোজা করুন'। নামকরণেই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। যদিও এই ভাঙনের মুহূর্তে কবি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস রেখেছেন। পাশাপাশি মায়োকোভস্কির সতর্কবাণী কতখানি ভবিষ্যদবাণী ছিল তাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। 'মায়োকোভস্কি' কবিতায় তিনি বলছেন-

"সেদিন তোমার সতর্কবাণী কেউ-ই শোনেনি।
তবু, অসঙ্গতির শিখা নেভাতে বহু চেষ্টা করে গেছ তুমি.."[১২] রোমান্টিক

কবি না হলেও কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে প্রেমভাবনা, সময়ভাবনা ভিড় করেছে। তাঁর শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দিন, অস্ত্র দিন'(২০১১)। সময়টা বাংলার বামপন্থী রাজনীতিতে এক গভীর সঙ্কটকাল। যে কালের মুখোমুখি শিরদাঁড়া সোজা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন জীবনাদর্শের প্রতি অটল স্থিতধীর কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। যিনি প্রথমেই এবং সারাজীবন মূলত শ্রমিক এবং সেই সোচ্চারিত কণ্ঠে কবিও। এখানে তিনি অসহ্য পীড়ন থেকে নিস্তার পেতে যুদ্ধাস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন-

"না
ঘুরে দাঁড়াতে হবে
যুদ্ধে যাব, অস্ত্র দিন
....
অসহ্য পীড়নে বিদ্ধ
নেই, কোনোখানে কোথাও নিস্তার।"[১৩]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সনেট নিমার্ণের প্রথম কারিগর মধুসূদন দত্ত। এরপর দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত প্রমুখরা বাংলা সনেটকে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধুসূদন পেত্রার্ক ও শেকসপীয়র দুই রীতিতেই সনেট নির্মাণ করেন। বাংলা সনেটের প্রথাগত রীতি ভেঙে অভিনব কায়দায় সনেট বুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরি। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলি তার পরিচয় বহন করছে। প্রমথ চৌধুরি পেত্রার্কীয় রীতির সঙ্গে ফরাসি সনেট রীতির মিশ্রণ ঘটালেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের অনান্য শাখার ধারা অব্যাহত থাকলেও সনেটের নির্দশন নেই বললেই চলে। অথচ ষাটের দশকে একজন শ্রমিক কবির কড়া ও কালি পড়া হাতে দু'শোর অধিক সার্থক সনেট রচনা কি সত্যিই বিস্ময়ের নয়? কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় সনেট রচনায় কতখানি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা তাঁর 'চর্তুদশপদী কবিতা'(১৯৯৭) এবং' 'আরো চর্তুদশপদী কবিতা'(২০১৮) গ্রন্থদুটি পাঠ করলেই চাক্ষুষ হবে। তিনি সনেটের সীমাবদ্ধ রীতিনীতি মেনে কাব্যচর্চায় যে অপরিসীম অনুশীলন করেছেন তা এককথায় অভাবনীয়। বিস্তৃত গবেষণার ফসল হয়ে উঠেছে এই কবিতাগুলি।

(ঘ)

ড. অজয় কুমার ঘোষ কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন বুলগেরিয়ার কবি নিকোলা ভ্যাপসারভের। তিনিও ছিলেন কারখানার শ্রমিক। বয়লারে কয়লা জোগানো ছিল তাঁর কাজ। বিখ্যাত রবীন্দ্রগবেষক নেপাল মজুমদার কবির কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম তাঁকে 'শ্রমিক কবি' আখ্যা দেন। কবিকে সাংস্কৃতিক সংগঠক ও সামাজিক কাজের জন্য ১৯৯১ সালে সম্মাননা প্রদান করে মাধুকরী সাহিত্য পত্রিকা। ১৯৯২ সালে 'কবি তারক সেন পুরস্কার' প্রদান করে যোধন সাহিত্য পত্রিকা(চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান পশ্চিম)। ২০০৩ সালে কফি হাউস পত্রিকা, কলকাতা দেয় 'সাহিত্য সম্মান'। ২০০৪ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, স্টিল অথোরিটি ইন্ডিয়া লিমিটেড দেয় 'সাহিত্য সম্মাননা'। সারা জীবনের কবিকৃতির জন্য বেহালা থেকে ২০১১সালে পান 'আরিত্রিক কবিকৃতি সম্মাননা'। দুর্গাপুর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তাঁর ভূমিকা ও সাহচর্যের জন্য দুর্গাপুর পুর নিগম ২০১১ সালে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে। ২০১৬ সালে লিটল ম্যাগাজিন মেলা (বর্ধমান) থেকে কবিকে সম্মান জানানো হয়। 'দেবলা' সাহিত্য পত্রিকা ২০১৭ সালে বাংলা অ্যাকাডেমি সভাগৃহে কবিকে সম্মাননা দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। যদিও তাঁর প্রতিভা এখনও বৃহত্তর অংশে প্রচার পায়নি। আমার মনে হয় একদিন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মযার্দা পাবেন।

তথ্যসূত্র :

১.রবীন্দ্রজীবনী(প্রথমখন্ড), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ,কলকাতা, ভূমিকা অংশ, পৃ.৩০।

২. সাক্ষাৎকার সংগ্রহ (২৬শে জানুয়ারি ২০১৯)।

৩. তরুণ মুখোপাধ্যায়, ছয় দশকঃনয় কবি, ২০০৬,সহযত্রী প্রকাশন, কলকাতা পৃ.১০।

৪. ড.অশোক কুমার মিশ্র, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ২০১৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা,পৃ.৩৭৭।

৫. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, শ্রমিক কবির প্রতিবাদী কবিতা,২০১৬, শ্রমশ্রী প্রকাশন, কলকাতা,পৃ.৪৯।

৬. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ, ২০১২, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা,পৃ.২৯।

৭. ঐ ,পৃ.১৭।

৮ .ঐ,পৃ.২৭।

৯. ঐ,পৃ.২৮।

১০. ঐ,পৃ.৩৫।

১১. ঐ,পৃ.১৮১।

১২. ঐ ,পৃ.১৫১।

১৩. ঐ,পৃ.২০৪।

নি খি ল চ ন্দ্র মা হা তো

কবি গণেশ বসুর জীবন : এক ছিন্নমূল মানুষের লড়াই

রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যে জীবনানন্দ-মুগ্ধতাকে সরিয়ে রাখলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে শ্রেষ্ঠ কবি বলা যায়। আর স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে শঙ্খ-শক্তি-সুনীলকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিলে ষাটের জনপ্রিয় ও ব্যতিক্রমী কবি বলা যায় গণেশ বসু। কবি সুভাষ বিলাসিতার অঙ্গ হিসেবে গলায় পরে নিয়েছিলেন দারিদ্র্য। অনুজ কবি গণেশ বসুর জীবনে সেদিক থেকে অনিবার্য ছিল গরীবী। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে অবস্থা–বৈগুন্যে জীবনের পথ বন্ধুর।

গণেশ বসুর পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার চাঁদসি গ্রামে। তাঁর বন্ধু অনিল দে চাঁদসি গ্রাম সম্পর্কে বলেছেন – "সদর থেকে অনেক দূর। কিন্তু বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পাকা রাস্তা। পাকা বাড়িই বেশি, একতলা দোতলা। নানা মাপের জমিদার, ডাক্তার-কোবরেজ, শিক্ষক, স্বদেশি, নায়েব-গোমস্তা থেকে পণ্যাঙ্গনার আশ্রয়। হাট বসে নিয়মিত, বাজারও, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল। হয়তো গোড়ায় নাম ছিল চন্দ্রশ্রী। খালের ওপারে যেমন বিখ্যাত ফুল্লশ্রী, বিজয় গুপ্তের জন্মভিটে। ক্ষত চিকিৎসার স্বতন্ত্র পদ্ধতির জন্য চাঁদসির খুব নাম-ডাক ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা প্রথম ভারতীয় মহিলা এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস (পিতা ব্রজকিশোর বসু) ছিল চাঁদসিই।"[১]

কবি গণেশ বসুর পিতামহ অন্নদাচরণ বসু মজুমদারের বাড়িটি ছিল এল প্যাটার্নের, দোতলা। গ্রামের লোকের কাছে পরিচিতি দারোগা বাড়ি হিসেবে। তাঁর বারোটি সন্তান, ছ'টি ছেলে, ছ'টি মেয়ে। পঞ্চম পুত্রের নাম সুমন্তনাথ বসু মজুমদার। প্রজারা ডাকত রাঙাবাবু বলে। সুমন্তনাথ বসু মজুমদারের বিয়ে হয় বরিশালেরই

দেহেরগতি গ্রামের বিলাসচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা পারুলদেবীর সঙ্গে। সুমন্তনাথ বসু মজুমদার ও পারুলদেবীর চারটি সন্তান। তৃতীয় সন্তান হলেন গণেশ বসু। তাঁর জন্ম মাতুলালয়ে অর্থাৎ দেহেরগতি গ্রামে, ১৯৪০খ্রিস্টাব্দের ১ডিসেম্বর (১৫ অঘ্রাণ), রবিবার, বিকেল চারটে নাগাদ।

সচ্ছল জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও গণেশ বসুর বাল্যজীবন বেশিদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়নি। কেননা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের অভিশাপ নেমে আসে। ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার মানুষ পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। সুমন্তনাথ বসু মজুমদারও স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বরিশাল ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। সালটা ১৯৪৮, গণেশ বসুর বয়স তখন মাত্র আট বছর। চাঁদসির জমিদার পরিবার কলকাতায় এসে নতুন পরিচয় পেলেন - উদ্বাস্তু, শরণার্থী।

শিয়ালদহ থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় পদ্মপুকুরের কাছে, এক পরিত্যক্ত মিলিটারি ক্যাম্পে, আশ্রয় শিবিরে। আরো অনেক শরণার্থী পরিবারের সঙ্গে শুরু হয় ক্লিষ্ট জীবন-যাপন। এই দুঃসহ জীবন-যাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে তিনদিন পর ৩১. ০৮. ১৯৪৮-এ সুমন্তনাথ বসু মজুমদার সপরিবারে আশ্রয় নেন ছোটো বোনের বাড়িতে ভবানীপুরে, ৩ বি কুন্ডু লেনে। কয়েকদিন পর সরকারি ভাবে রিফিউজি হিসেবে নথিভুক্ত হলেন, মিলল রিফিউজি কার্ড। সাউথ সাবার্বান স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য দুই ভাই ইন্টারভিউ দেন, তাতে গণেশ বসু উত্তীর্ণ হলেও দাদা কার্তিক বসু পাস করতে পারেননি বলে সেখানে ভর্তি হওয়া হয়ে ওঠেনি। ১৯৪৯ অথবা ১৯৫০-এ তাঁরা দুই ভাই ভর্তি হন ভবানীপুর নাসিরুদ্দিন স্কুলে।

সুমন্তনাথ বসু মজুমদার ছোটো বোনের বাড়িতে ছিলেন প্রায় আড়াই বছর। তারপর নানাবিধ সমস্যার কারনে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা চলে আসেন টালিগঞ্জের একটি বস্তিতে। একটা সস্তার ভাড়াবাড়িতে অনেক ভাড়াটের সঙ্গে নিত্য কলহদীর্ণ পরিবেশে থাকেন কয়েক মাস। তারপর আশ্রয় নেন ২ বি চন্দ্র মন্ডল লেনের একটি

বাড়িতে। সেই বাড়িটি আসলে একটি দোকান ঘর। গণেশ বসুর ছোটো মামা সেটি কিনেছিলেন একটি ছোটো-খাটো আইসক্রিম কারখানা তৈরি করবেন বলে। এইসময় ভীষণ আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে তাঁদের দিন অতিবাহিত হয়। কোনোদিন একবেলা খাবার জোটে তো অন্য বেলা উপোস। কোনোদিন খুদের জাউ খেয়ে থাকতে হয়, কোনোদিন কাটে শুধু মুড়ি চিবিয়ে।

সুমন্তনাথ বসু মজুমদার মাঝে মাঝে দেশে যেতেন এবং সামান্য কিছু খাজনা-টাজনা নিয়ে আসতেন। একসময় তাও বন্ধ হয়। তার উপর তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন গ্যাস্ট্রিক আলসারে। স্ত্রী পারুলদেবী সংসারের হাল ধরেন। সর্বংসহা হয়ে তিনি আগলে রাখেন পরিবারটিকে। অন্যের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ ও কাঁথা সেলাইএর কাজ নেন তিনি। পরে এক প্লাস্টিক কারখানায় দৈনিক মজুরিতে চাকুরি করেন। অথচ দেশে থাকতে রাজরানীর মতো ছিলেন তিনি। তাঁর চুল বেঁধে দেওয়া ও পরিচর্যা করার জন্য ছিল নিজস্ব সেবিকা। গ্রামের গরীব প্রজাদের কাছে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তিনিই হয়ে পড়লেন অন্যের অনুগ্রহ প্রত্যাশী।

পরিবারের এই দুর্দিনে বালক কবিকেও কাজে নেমে পড়তে হয়। দিদির সঙ্গে খবরের কাগজের ঠোঙা বানিয়ে তা বিক্রি করতেন। দাদা কার্তিক বসু দোকানে দোকানে চানাচুর সাপ্লাই দেওয়ার কাজ নেন। পরে অবশ্য তাঁরা টিউশন পড়াতেন। গণেশ বসু যখন ক্লাস ফাইভে পড়েন তখনই ক্লাস টু-থ্রির ছেলে মেয়েদের পড়াতেন। সীমাহীন দারিদ্রের কারণেই একদিন কবির ছোটো বোন মারা যান। তখন তাঁরা ছিলেন শানগরে কবির ন'মামা সুরেশচন্দ্র দত্ত-র বাড়িতে। কবির এই মামা ছিলেন বিপ্লবী। অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের ডান হাত। এখানে থাকার সময় একদিন সকালবেলা মুড়ি খেতে খেতে কবির বোন ঢলে পড়েন কবির কোলে। এই ঘটনা কবির মনকে ভয়ানকভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারেননি কবি। তারপর তাঁরা আর সে বাড়িতে থাকেননি।

কবির পরিবার এরপর আশ্রয় নেন ৩৭ নং গোবিন্দ ব্যানার্জী লেনে মেজো পিসিমার (কবি তাঁকে বড়ো পিসিমা বলে ডাকতেন, কারণ বড়ো পিসিমাকে কবি কখনো চোখে দেখেননি) বাড়িতে। পিসেমশাই সুবোধচন্দ্র গুহমুস্তাফি ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার। কিন্তু তাঁরা থাকতেন ভাড়াবাড়িতে। স্থানাভাব হওয়ায় সেই বাড়ির বারান্দাতে রাত কাটাতেন কবি। এই সময় তিনি পড়তেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে। এই ইনস্টিটিউশনের সেক্রেটারি ছিলেন শিশির কুমার দাস। কবি সারা বছর বিনা মাইনেতেই পড়াশোনা করতেন। তারপর রিফিউজি স্টাইপেন্ড-এর টাকা চলে এলে স্কুল কতৃপক্ষ সারা বছরের বকেয়া মাইনে কেটে নিত। এছাড়া বই কেনার খরচ হিসেবে সরকার থেকে পেতেন চল্লিশ টাকা।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময় গণেশ বসুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় অনিল দে-র (অনিল দে পরবর্তীকালে নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা হয়েছিলেন। এঁর পরিচালনায় স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও অভিনয় করেছেন)। তিনি ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। কবির মেজো পিসিমার বাড়ির কয়েকটি বাড়ি পরেই ৪৭ গোবিন্দ ব্যানার্জী লেনে ছিল তাঁদের বাড়ি। তাঁর মা-বাবা, দাদা, দিদি, বোনেরা কবিকে খুব ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। তখন গোবিন্দ ব্যানার্জী লেন থেকে পায়ে হেঁটে কবি স্কুলে যেতেন। বাড়ি থেকে কোনোদিন খেয়ে যেতে পারতেন না। অনিল দে মাঝে মাঝে কবিকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। ক্রমে গণেশ বসু তাঁদের পরিবারেরই একজন হয়ে ওঠেন। এমনকি তাঁদের পারিবারিক নিমন্ত্রণেও তাঁকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

বন্ধু অনিল দে-র সাহচর্যে আসার পর গণেশ বসুর জীবন নতুন মোড় নেয়। অনিল দে কবিতা লিখতেন, গান বাঁধতেন, অভিনয় করতেন। তাঁর দেখাদেখি গণেশ বসুও কবিতা লিখতে শুরু করেন। অভিনয়ও করেছেন। জোছন দস্তিদারের ‘দুই মহল’, বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘জাগো রে ধীরে’, শিবরাম চক্রবর্তীর ‘পন্ডিত বিদায়’ নাটকে তিনি অভিনয় করেন কখনো অনিল দে-র নির্দেশনায়, কখনো অন্যের

পরিচালনায়। অনিল দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘তোতা কাহিনী’-র নাট্যরূপ দেন, গণেশ বসু সেখানে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেন। ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’-য় ঈশান চরিত্রে পাঁচবার অভিনয় করেন। নাট্যায়ন প্রযোজিত ‘কম্পন’-এ হেডরিকের অভিনয় করেন মুক্তাঙ্গনের মঞ্চে। যাত্রাতেও অভিনয় করেছেন। ‘শিবাজী’ পালাগানে অনিল দে হয়েছিলেন শিবাজীর অনুগামী তানাজি, আর তানাজির বালক অনুসারকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন গণেশ বসু।

অনিল দে-র সঙ্গে গণেশ বসু পি.সি.সরকারের ইন্দ্রজাল সম্পর্কিত বই কিনে ম্যাজিক, হিপনোটিজম প্র্যাকটিস করতেন। পরবর্তীকালে সাহানগর স্কুল, চেতলা বয়েজ প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় ম্যাজিক শো করেন তাঁরা। গণেশ বসুকে কবিতা লিখতেও উসকে দিয়েছিলেন বন্ধু অনিল দে। যদিও কবির প্রথম লেখা হল একটি গদ্য, যার বিষয় ছিল মহাত্মা গান্ধি। ১৯৫৪ অথবা ১৯৫৫-তে কবি ‘পথের বাণী’ নামে এক দেওয়াল পত্রিকায় প্রথম কবিতা লেখেন, কবিতাটির নাম ছিল ‘মৃত্যু’। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত সম্পাদিত ‘নব জীবন’ পত্রিকাতেও তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮-তে বীথি বসু ছদ্মনামে কবিতা অনুবাদ করেন যা মাসিক ‘বসুমতী’-তে বের হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন কবি। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। অম্বিকা চক্রবর্তী বিধানসভার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে। তাঁর সমর্থনে কচি-কাঁচাদের মিছিলে অংশ নিয়ে চোঙা ফুঁকতেন, শ্লোগান দিতেন – “ভোট দেবেন কীসে / কাস্তে ধানের শিষে”, “হারে গা জী হারে গা / জোড়া বয়েল হারে গা” (কংগ্রেসের প্রতীক ছিল জোড়া বলদ)। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র অরুণোদয় গুহ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, তাঁর নির্দেশে কবি গোয়া মুক্তি আন্দোলনের জনসভায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হন। ১৯৫৩-তে ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধি পেলে, তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় কৌতূহলবশত তাতে যোগ দিয়ে এক

স্টপেজে ট্রামে উঠে কয়েকটি স্টপেজ পরে নেমে যেতেন, ভাড়া দিতেন না। ১৯৫৪-র শিক্ষক ধর্মঘট তাঁকে খুব নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী সোমনাথ লাহিড়ীর সমর্থনে মিছিল করেন, রাত একটা, দুটো, আড়াইটা পর্যন্ত জেগে পোস্টার লিখেছেন। এই ভাবেই ধীরে ধীরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

গণেশ বসু স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। পরীক্ষা দিয়েই তাঁরা চলে যান বাঁশদ্রোণীতে। কবির ন'মামা সুরেশচন্দ্র দত্তকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে সরকার বাঁশদ্রোণীতে জমি দিয়েছিল। ন'মামা সেই জমি কবির বাবা সুমন্তনাথ বসু মজুমদারকে দিয়ে দেন। একখানা ছাপরা বানিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করেন তাঁরা। এই সময় কবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন টালিগঞ্জ-এ সিভিল ড্রাফটসম্যানশিপ পড়তে যান। সেখানেও সরকার থেকে চল্লিশ টাকা করে স্টাইপেন্ড পেতেন।

১৯৫৯-এ সিভিল ড্রাফটসম্যানশিপ পড়া শেষ করে কবি বঙ্গবাসী কলেজে ইভনিং-এ ভর্তি হন সায়েন্স নিয়ে। উদ্দেশ্য দিনের বেলায় চাকুরি করা এবং রাত্রে বিজ্ঞান পড়া। কিন্তু কয়েকদিন পর, বন্ধু অনিল দে-র সঙ্গে পড়ার জন্য চারুচন্দ্র কলেজে ইভনিং-এ ভর্তি হন ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে। দিন দশেক পরে ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসেন ডে-তে। বাঁশদ্রোণী থেকে কবি বেশিরভাগ দিন হেঁটেই লেক মার্কেটে চারুচন্দ্র কলেজে আসতেন। কোনোদিন পান্তা ভাত খেয়ে, কোনোদিন কিছু না খেয়ে। তখনও তিনি টিউশন পড়াতেন, ঠোঙা বানাতেন।

এই চারুচন্দ্র কলেজেই কবির জীবনে অনেকটা বাঁক এনে দেয়। কলেজে ভর্তি হয়ে কবি দেখেন সেখানে ছাত্র ফেডারেশনের কোনো ইউনিট নেই। চারুচন্দ্র কলেজের ইউনিয়ন দখল করে কখনো পি.এস.ইউ. (পি.এস.ইউ. হল আর.এস.পি.-র ছাত্র সংগঠন), কখনো ডায়ানা। আসলে এরা কোনো দলের নয়, যদিও কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন। ডায়ানাকে সমর্থন করতেন চারুচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল

ড.ক্ষেত্রমোহন বোস। গণেশ বসু ও আরো কয়েকজন ছাত্র মিলে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াবেন। যথাসময়ে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন হয় এবং ভোটে দাঁড়িয়ে কবি রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করেন। কবিতা লেখার সুবাদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউনিয়নের সাহিত্য-সম্পাদক নির্বাচিত হন। পি.এস.ইউ.-র প্রণব মুখার্জী এবং ডায়ানার অমূল্য সেন এক মত হয়ে সমর্থন করেন তাঁকে। ছাত্র-রাজনীতি করার কারণে এই সময় কবি নানান সমস্যার সম্মুখীন হন, কিন্তু বাংলা বিভাগের প্রধান শান্তিগোপাল সিংহরায় সেই সব ঝড়-ঝাপ্টা থেকে আগলে রাখেন। কবি তাঁর কাছ থেকে পিতার মতো স্নেহ পেয়েছেন। পরে ১৯৬৩-তে অবশ্য শান্তিগোপাল সিংহরায় চারুচন্দ্র কলেজ ছেড়ে চলে যান ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে।

১৯৫৯-এর ৩১ আগস্ট শুরু হয় ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ প্রায় ৮০ জন খেত মজুর, কৃষককে গুলি করে হত্যা করে। এই বর্বরতার প্রতিবাদে পরের দিন সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হয় ছাত্র ধর্মঘট। ছাত্র-ছাত্রীদের কেন্দ্রীয় সমাবেশ ঘটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। সেখান থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির দিকে যাত্রা করে। হিন্দ সিনেমার সামনে পুলিশ মিছিলের গতি রুদ্ধ করতে তিনদিক থেকে ঘেরাও করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্য করে। পুলিশের লাঠির ঘায়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন গণেশ বসু। সেই আঘাত আজও পীড়া দেয় তাঁকে। এখনো অমাবস্যা-পূর্ণিমায় তাঁর কোমরে ব্যথা হয়। সেই সময়ের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনকেও ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল এই আন্দোলন। এই পটভূমিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন বাবা ও ছেলেকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত কবিতা - বাবা ফিরল, ছেলে কেন এল না। এই সময়ের পুলিশ-মন্ত্রী কালিপদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি বিখ্যাত কার্টুন বেরিয়েছিল। তাতে দেখা যায় কালিপদ মুখোপাধ্যায় দু'হাত দিয়ে রাজভোগ খাচ্ছেন, আর সেই রাজভোগ হল মানুষের মাথার খুলি।

১৯৬১-তে আই.এ.পরীক্ষা। কিন্তু কবির এক বছরের বেতন বাকি। কতৃপক্ষ জানায় বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দিতে না পারলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তখন কবির পরিবারের যা আর্থিক অবস্থা, তাতে অত টাকা জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। নীতিগত কারণে ইউনিয়ন থেকেও কোনো টাকা নেবেন না, যেহেতু তিনি ইউনিয়নের সাহিত্য-সম্পাদক। অনোন্যপায় হয়ে ভাইস প্রিন্সিপাল ড.ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরির অনুমতি নিয়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠান 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-সহ অন্যান্য কয়েকটি খবরের কাগজে। ১৯৬১-র ৬-ই জানুয়ারি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সেই চিঠি বের হয় - "সাহায্যের আবেদন : অর্থ না জুটিলে পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ"- এই শিরোনামে। চিঠিটি প্রকাশিত হলে দমদম নাগেরবাজারের এক পান বিক্রেতা যুবক ৫ টাকা দিয়ে প্রথম সাহায্য করেন। ধানবাদ, ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লাখনির শ্রমিকেরা মানিঅর্ডার করে পাঠায় কিছু টাকা। বেলেঘাটা জোড়ামন্দিরের কাছে থাকতেন ডা.মাধবচন্দ্র লাহিড়ী। তাঁর পত্নী এসে কবিকে দেড়শো টাকা দেন, তার উপর পরীক্ষার সময় ভালো খাবার-দাবার খাওয়ার জন্য আরো কিছু টাকা দেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা হাতে আসায় কবি বাড়তি টাকা ড.ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরির হাতে তুলে দিয়ে বলেন গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে। ডা.লাহিড়ীর পত্নী এই ঘটনার পর থেকে কবিকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। তিনি বলেছিলেন যে গণেশ বসু যতদিন পড়াশোনা করবেন তাঁর পরীক্ষার ফি তিনিই দেবেন। প্রত্যেক বছর অষ্টমীর দিনে তাঁর বাড়িতে কবির নিমন্ত্রণ থাকত। এমনকি বিশেষ বিশেষ নেমন্তন্ন বাড়িতে তিনি সঙ্গে করে নিয়েও যেতেন।

আই.এ. পরীক্ষা দিয়ে কবি তিন মাসের জন্য ক্যালকাটা অটোমোবাইলস নামে একটি মোটর গাড়ি সারাইয়ের কারখানায় কাজ নেন। তারপর চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হন বাংলায় অনার্স নিয়ে। এই সময় দুপুরবেলা কলেজের ক্লাস কেটে টিউশন পড়াতেন, মাইনে ১৪ টাকা। ছাত্র-রাজনীতির চেয়ে এবার তাঁর ঝোঁক বাড়ে

বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে। দক্ষিণ কলকাতার চারু মার্কেটের কাছে সি.পি.আই.-এর অফিসে নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয়। ১৯৬১-তে পার্টির সদস্য হন। ১৯৬২-তে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ হয়। পিকিং রিভ্যু ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও কবি তা পড়তেন গোপনে। এই নিয়ে কিছুটা বিপদগ্রস্তও হয়েছিলেন।

১৯৬৩-তে কবি একটি কাজ পান রাঁচিতে। শালিমার প্রোডাক্টস তখন রাঁচি হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আবাসন নির্মাণের ঠিকাদার। কবি সেখানে ওয়ার্ক সুপারভাইজারের কাজ করেন। থাকেন রাঁচি মেন রোডের উপর, রায় হোটেলে। কিন্তু কুলি-কামিনদের সঙ্গে গালাগালি দিয়ে কথা বলতে হত বলে এ কাজ তাঁর ভালো লাগেনি। মাস দেড়েক বাদে সেই চাকরি ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। এরপর বন্ধু-কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে সাউথ সাবার্বাণ মেন স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি মূলত সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ক্লাস নিতেন। কয়েক মাস পরেই কবি মণীন্দ্র রায়ের আহ্বানে 'অমৃত' সাপ্তাহিক-এ সাব-এডিটরের কাজে নিযুক্ত হন। মণীন্দ্র রায় তখন আমেরিকার ইতিহাস অনুবাদ করছিলেন, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের জীবনী লিখছিলেন। মণীন্দ্র রায় বলে যেতেন, কবি তা লিখতেন। অমৃতে কাজ করতে করতেই বি.এ. পাস করেন। মণীন্দ্র রায় তাঁকে এম.এ. পড়ার পরামর্শ দেন। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই এম.এ.-তে ভর্তি হন। কবি ‘অমৃত’-এর অফিসে আসতেন দুপুর ১টার সময়, ৭টার সময় ‘অমৃত’ বন্ধ হত। এছাড়া বুধবার ‘অমৃত’ বন্ধ থাকত। সেইদিন তিনি ইউনিভার্সিটিতে যেতেন ক্লাস করতে।

কবি গণেশ বসুর জীবনে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই (১৯৬২-তে) কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। অগ্রজ কবির স্নেহ লাভ করে ধন্য হন তিনি। 'বনানীকে' নামে এক কবিতাও প্রকাশিত হয় এ সময় 'অমৃত'-এ। বি.এ. পড়ার সময় এক বাড়িতে দু'জন মেয়েকে টিউশন পড়াতেন, একজনের নাম ছিল বনানী। তাঁকে নিয়েই কবিতা। কবিতাটি প্রকাশিত হলে কবির টিউশনটা যায়। যাই হোক ১৯৬৪-র এপ্রিলে কবির প্রথম

কাব্যগ্রন্থ ‘বনানীকে কবিতাগুচ্ছ’ বের হয়। কবিপত্র প্রকাশভবনের পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪০। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬১-র ২ অক্টোবর থেকে ১৯৬৩-র ৮ অক্টোবর। উৎসর্গ পত্রে লেখেন - 'আমরণ যে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার'। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। দাম ছিল দু'টাকা। প্রথম প্রকাশেই যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন কবি। এম.এ. ক্লাসে সাহিত্যিক ও অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সকলকে বইটি দেখিয়ে বলেছিলেন - আমাদেরই ছাত্র, আশা করি ভবিষ্যতে একজন কবি হবেন।

প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অধুনালুপ্ত ‘অমৃত’ সাপ্তাহিকে কাব্যগ্রন্থটির উপর বিস্তারিত মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। কবি তরুণ সান্যাল ‘সমকালীন’ পত্রিকায় (১৯৬৫) বিশদ আলোচনা করে লেখেন – “সব কবিতাই যেহেতু প্রেমের আর্তিতে মুখর, বলা যেতে পারে এই তরুণ কবি নতুন কবিতার গড্ডলধারায় হারিয়ে যাননি। অন্য বহু তরুণ যখন রমণীর প্রতারণাকে মুখ্য করে পৃথিবীর দিকে তাকান, তখন গণেশ বসু পৃথিবী ও সমাজের ম্লানতার জন্যই প্রেমের পরাজয় দেখেন। কবি প্রেম ও শিল্পকে এক কেন্দ্রে আনতে চেয়েছেন। শিল্পই প্রেম এবং প্রেমই শিল্প।”[২]

বনানীকে নিয়ে কফি হাউসে কবির বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা হত। সেই বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন - পবিত্র মুখোপাধ্যায়, পুষ্কর দাশগুপ্ত, রমানাথ রায়, কল্যাণ সেনগুপ্ত, আশীষ ঘোষ প্রমুখ। এই সময় থেকেই কবি তরুণ সান্যাল গণেশ বসুর প্রতি বিশেষ নজর দেন। বনানীকে নিয়ে সেই সময়ের এক গল্পকার দিলীপ মিত্র একটি গল্পও লিখেছিলেন। যা বেরিয়েছিল মাসিক ‘বসুমতী’-তে।

১৯৬৫-তে এম.এ.পাস করেন, ১৯৬৬-তে ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজে ইভনিং-এ পার্ট-টাইম পড়াবার সুযোগ পান। তিনি তখন দিনে কাজ করতেন 'অমৃত'-এ, রাত্রে পড়াতেন কলেজে, সুযোগমতো টিউশনও করতেন। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনে গোটা রাজ্য তখন আবারো তোলপাড়। এই সময় অর্থাৎ ১৯৬৪-র আগস্ট

থেকে ১৯৬৬-র ডিসেম্বর পর্যন্ত কবি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নিজের মুখোমুখি'-র কবিতাগুলি রচনা করেন। কাব্যগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৪, ইংরেজি ১৯৬৭-র মে। মৃণাল দেবের সৌজন্যে বীক্ষণ প্রকাশ ভবনের পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন নিতাই ঘোষ। প্রচ্ছদ শিল্পীও নিতাই ঘোষ। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬০। দাম তিন টাকা। ছাপেন ডি ডি প্রিন্টার্সের পক্ষে দেবিদাস মুখোপাধ্যায়। উৎসর্গ করেন কবি বিষ্ণু দে-কে।

গণেশ বসুর বহু আলোচিত কবিতা 'সমুদ্রমহিষ' এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কবিতাটি পড়ে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'সীমান্ত' পত্রিকায় লেখেন – "সম্প্রতি বাংলা কবিতায় যখন সব-ছড়ানো সব-হারানো দেউলেপনার যুগ, যখন পুরো জাতটার সঙ্গে বাংলা কবিতাও পি.এল. ৪৮০-র মুষ্টিভিক্ষার মুখ চাওয়া, তখন কবি গণেশ বসুকে আত্মীয় বোধ করতে পেরে স্বস্তি পেলুম। মনে হল আমারও 'রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ।"[৩]

কবিতাটি পাঠ করে কবি বিষ্ণু দে একটি আস্ত কবিতা লিখে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন গণেশ বসুকে -

"মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাস্ফীত সমুদ্রমহিষ
তোমার কবিতা ওঠে জ্বলে জ্বলে ফসফরাসরাশি,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশপাতাল জুড়ে, চুল ওড়ে, বাহুর গারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল
সফেন উন্মার্গ নৃত্যে বিশ্বময় ভাষা খোঁজে
তখন নিজেকে লাগে অপরাধী, ছত্রীসেনা নেমে পড়ে কোনো
পর্দার আড়ালে বুঝি সুবিধাদানের
ভূমিকায়, পরস্পর বিপ্রতীপ কোণে
চেনা চেনা মুখে ক্ষিপ্র ধ্বংসের সেবর্

ঊর্ধ্বশ্বাস, কেউ খোঁজে কংকালের কঠিন বিবর
বিমিশ্র হৃদয়ে শুধু অসহায় আর্তনাদে, আর
ঊর্ণাজাল গেঁথে চলে উত্তরে দক্ষিণে।
তখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্তমহিষ
নীলে লাল আহিরভৈরবে,
আর দশপ্রহরণ হাতে হাতে তুলে দেয়
তোমার কাব্যের যিনি মরণমর্দিনী।”[৪]

(১৯৬৮-র ১৮ই এপ্রিল কবি গণেশ বসুকে লেখা বিষ্ণু দে-র চিঠি।)

প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী লেখেন – “কবি গণেশ বসুর শিল্প-মনন কোনো বোধহীন একদেশদর্শিতা কখনো স্বীকার করেনি। তাঁর চিত্তলোকে আছে সেই সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি, মনন-লোকে আছে সেই ক্ষমতা যার ফলে তিনি প্রগতিক পদযাত্রায় বহুমুখী ধারাগুলির বিচিত্র সংশ্লেষ বুঝে নিতে পারেন।”[৫]

১৯৭৩-এর মার্চ মাসে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রকাশনা থেকে যে ‘স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় কবিতা’ শিরোনামে ‘বাংলা কবিতা সংকলন’ প্রকাশিত হয় তাতে ‘সমুদ্রমহিষ’ কবিতাটি স্থান পায়।

১৯৬৯-এ কবি অস্থায়ীভাবে ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পান। পাকাপাকি ভাবে অধ্যাপনার সুযোগ পান ০১.০৯.১৯৭০-এ। ‘অমৃত’ থেকে বিদায় নিয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালেই কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘রক্তের ভিতরে রৌদ্র’ প্রকাশিত হয়। জয়ন্তকুমারের সৌজন্যে অনুভব প্রকাশনীর পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক। প্রচ্ছদ পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। বইটির দাম ছিল দু'টাকা। ছাপেন কুমার প্রিন্টার্সের পক্ষে জয়ন্তকুমার। কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কবি মণীন্দ্র রায়কে। এই কাব্যের কবিতাগুলির রচনাকাল জানুয়ারি ১৯৬৭ থেকে অক্টোবর ১৯৬৯। খাদ্য আন্দোলনের পর তখন শুরু হয়ে গেছে নকশাল আন্দোলন। একদল তরুণ রক্তের

বিনিময়ে সমাজ বদলের প্রতিজ্ঞায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের ‘রক্তের ভিতরে স্বপ্ন, হাজার হাজার স্বপ্ন’।[৬] বলা বাহুল্য সে স্বপ্ন কবির রক্তেও খেলা করে। তাই শাসকের জল্লাদবৃত্তিতে কবির ‘রক্তের ভিতরে রৌদ্র ফেটে পড়ি লক্ষ লক্ষ ক্রোধের ফার্নেস’[৭] অথবা ‘ধমনী নিদ্রিত সিংহ ফুঁসে ওঠে রৌদ্রের কেশরে’।[৮]

‘রক্তের ভিতরে রৌদ্র’ কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কথাশিল্পী জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় লেখেন – “রৌদ্র কিংবা অন্ধকার হতে দ্রুতবেগে বর্শার ফলক প্রথমে স্পর্শ এবং তারপর, পর পর স্নায়ু, মাংস, রক্ত ও অস্থি ভেদ করলে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। রক্তের বন্যা নয়, মোহময়ী বেত্রবতীও নয়, কমনীয়তায় স্নেহময়ী অঞ্জনা তো নয়ই। কালো কাঠের গুঁড়ি, শক্ত পাথরের চাঁই আর শুকনো বালির মাঝে মাঝে ছড়ানো-ছিটানো তিস্তা। ভিতরে ভাসান। মাঝে মাঝে প্রতিশোধ-অস্থির প্রলয়। কিন্তু রক্তের। এই হল রক্তের ভিতরে রৌদ্রের মেজাজ, গণেশ বসুর কবিতা। এ গ্রন্থ এই মেজাজেরই ঊর্ধ্বতর সোপান। কঠিন জটিলতা, ক্রোধ আর নিশার মাঝখানে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমুদ্রমহিষ হয়ে, 'রক্তের ভিতরে রৌদ্রে' এসে তা যেন বিস্ফোরণের উচাটনে দুটি শক্ত হাত হয়ে ওঠার অধীর প্রয়াসে অশান্ত।”[৯]

কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় লেখেন – “আমি স্বভাব-সংগতভাবে কবিতায় বা যে কোনো শিল্পে রাজনীতি চর্চার বিরোধী, শিল্পীর স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশই শিল্প এই বিশ্বাস একান্তে লালন করে এসে বিরোধী বিশ্বাসের সম্মুখীন হওয়ামাত্র বিপরীত মতাদর্শের গভীরতা ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলাম। উপলব্ধি করেছি যে, কোনো বিশ্বাস যদি স্রষ্টার অন্তর্জগৎ থেকে উদ্ভূত হয় তাহলে তার জোর সৃষ্টির প্রতিটি কোষে কোষে শক্তিশালী জীবনীশক্তি সঞ্চার করে, তাকে অপছন্দ হতে পারে, অবহেলা করা চলে না, এমনকি বিশ্বাসের ভিন্নভূমিতে অবস্থান করেও অভিভূত হতে হয়; গণেশ বসুর কবিতার প্রাণশক্তি এইখানে, বিশ্বাস ও আচরণে তিনি সৎ, নিজের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া এতই বিবেকসংগত, সেই মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য লড়াই করতে

তিনি পিছপা নন; এই বিশ্বাস তাঁর কবিতার অন্তর্শক্তি, সৃষ্টির ও সমৃদ্ধির অন্তর্গত প্রেরণা ও প্রাণশক্তি।”[১০]

১৯৭০-এর মার্চে কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন কাব্যটির নাম ছিল ‘অধিকার রক্তের কবিতা’, পরবর্তীকালে কবি এই কাব্যের নাম পরিবর্তন করে ‘লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা’ রাখেন। কাব্যটি আসলে একটিই দীর্ঘ কবিতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২। সীমান্ত প্রকাশনীর পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন দীপেন রায়। পরিবেশক মনীষা গ্রন্থালয়। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ, অলংকরণ ধ্রুব রায়। দাম দু'টাকা। ব্যবসা ও বানিজ্য প্রেস থেকে মুদ্রিত। রচনাকাল জানুয়ারি, ১৯৭০। উৎসর্গ করেন কবি তরুণ সান্যালকে। কাব্যের ভূমিকায় কবি লেখেন – “গত বছরই ‘লেনিনের যুগ’ কাব্য-সংকলন সম্পাদনার সময়ে মাথায় এসেছিল এক ঝোঁক। দীর্ঘ কবিতা লেখার রোখ চাপে। তবে এর মাশুলও কম গুনতে হয়নি। লেনিন আর লেনিনবাদের সারাৎসারে নিজের অক্ষমতার সান্ত্বনা নেই।”

‘লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা’ কাব্যটি রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন – “দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তখন রঙের বদল ঘটেছে। দুঃশাসন কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে দু'বারের যুক্তফ্রন্ট। ভুল হোক শুদ্ধ হোক গ্রামে গঞ্জে উগ্র বামপন্থীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে মার্কস-লেনিন-মাও-এর নাম। বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু শব্দ উত্তরের হাওয়ায় রাশি রাশি ফেটে যাওয়া শিমূল তুলোর মত শ্রেণীশত্রু, খতম, শোধনবাদ, নয়া-শোধনবাদ...এবং এইরকম আরও।”[১১]

আর তখন লেনিনকে নিয়ে জন-জাগরণের স্বপ্ন দেখছেন মার্কসপন্থী সমস্ত কবি। কবি তরুণ সান্যালের সঙ্গে 'লেনিনের যুগ' কাব্য-সংকলন (১৯৬৯) সম্পাদনা করছিলেন গণেশ বসু। কবি বিষ্ণু দে লিখছিলেন এমন সব উজ্জীবিত পংক্তি - ১) ‘পরদেশি পরবাসী কত ছিল লেনিন তোমার দেশে?’ ২) ‘লেনিনের মনীষার হস্তাক্ষর বিশ্বব্যাপ্ত আজ ইতিহাসে’, ৩) ‘শুনেছি যে লেনিনেরও সাধ ছিল একদিন সকলেই

হয়ে যাবে শতায়ু লেনিন !’[১১] তখন মার্কসবাদী যে-কোনো কবির পক্ষেই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল লেনিনকে নিয়ে কবিতা রচনা। গণেশ বসুও লেনিনকে নিয়ে লিখে ফেললেন একটি দীর্ঘ কবিতা – ‘লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা’।

কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি মণীন্দ্র রায় লেখেন – “গণেশ বসু যা করতে চেয়েছেন এবং করেছেন তা তরুণ কবির পক্ষে দুঃসাধ্য। বর্তমান কালের এবং অনতিদূর অতীতে বাংলা দেশের সমাজ জীবনে যা ঘটেছে সেই বহুতল বিশিষ্ট বিচিত্র জটিল বাস্তবকে একটি দীর্ঘ কবিতার অবয়বে সমগ্রতা দেওয়া এবং তাতে মানুষের ইতিহাসে নবযুগের স্রষ্টা মহামতি লেনিনের ভাবসমর্থন একীভূত করা সৎ এবং পরিশ্রমী কবিত্ব শক্তিরই মুখাপেক্ষী। গণেশ এ কাজে আশাতীতভাবে সফল হয়েছেন।”[১২]

১৯৭১-এর জুন-এ গণেশ বসুর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ‘অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ’ প্রকাশিত হয়। সীমান্ত প্রকাশনীর পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন দীপেন রায়। পরিবেশনায় সারস্বত লাইব্রেরী। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রী অনিল দে, শ্রী অশোক সেন, শ্রী বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়কে। কবিতাগুলির রচনাকাল **১৯৬৯** থেকে **১৯৭১**।

‘অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ’ হল গণেশ বসুর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রয়োগে কাব্যের নামকরণ এখানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতার স্বাদ যে কোনো দেশের পক্ষেই অমৃত আস্বাদের সঙ্গে সমতুল্য। কিন্তু সেই স্বাধীনতা লাভের পথটি বহু মানুষের আত্মত্যাগে ও রক্তক্ষরণে পিচ্ছিল। যা মৃত্যুর মতোই শোকাবহ। অর্থাৎ অমৃত আস্বাদের জন্য বা স্বাধীনতা লাভের জন্য মৃত্যুকে তুচ্ছ করে মানুষের লড়াই করার কথাই ব্যঞ্জিত হয়েছে এই নামকরণে। **১৯৭১**-এ এপার ও ওপার উভয় বাংলায় উত্তাল। এপার বাংলায় অতি-বামপন্থী কয়েকজন তরুণ নতুনভাবে দেশ গড়ার স্বপ্নে মশগুল। তারা তখন বামপন্থীর ছদ্মবেশধারী কংগ্রেসের গুপ্তচর খুনের তান্ডব নৃত্যে মেতে উঠেছে। আর এর পাল্টা

হিসেবে শাসক তাদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। অন্যদিকে ওপার বাংলা তখন তাদের ভাষাগত Identity-কে সম্বল করে বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে মুক্তিলাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এইরকম টালমাটাল সময়েই গণেশ বসু 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ'-এর কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন।

'অমৃত'-এ কাজ করার সুবাদে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ভি.ডি.জে.-র আমন্ত্রণে জার্মানিতে যান কবি। বেইরুট সহ হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, তাশখন্দে ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নেন। বার্লিনের ভি.ডি.জে. পুরস্কার(১৯৭৩) প্রদান করা হয় তাঁকে। এইসময় ইরিনা নামে এক জার্মান তরুণীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁর। যদিও সে প্রেম প্রত্যাশিত পরিণতি পায়নি। জার্মানি থেকে ফিরে এসে আবার অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। 'অমৃত'-এ সাংবাদিকতা করার সময় তিনি অমৃতবাজার - যুগান্তর - অমৃত এমপ্লয়িজদের ইউনিয়ন গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, প্রতিষ্ঠাতা সহঃসম্পাদকও হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি পশ্চিববঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (WEBCUTA)-র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই সমিতির নানা সমস্যার সমাধানে ছুটে বেড়িয়েছেন ১৯৯৯ সাল থেকে। এছাড়া বিভিন্ন কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য হয়ে গঠনমূলক কাজ করেছেন। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবেও বঙ্গবাসী (মর্নিং, ডে, ইভনিং) , নিউ আলিপুর কলেজ প্রভৃতির মতো বহু কলেজে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে পঠন পাঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন।

১৯৮২-র মার্চে গণেশ বসুর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'বাঘের থাবার নিচে' প্রকাশিত হয়। মডেল পাবলিশিং হাউস থেকে জয়দেব ঘোষ এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। প্রচ্ছদ নিতাই ঘোষের আঁকা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। 'বাঘের থাবার নিচে'-র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৭২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৮২-র ফেব্রুয়ারি। কবির পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' প্রকাশের প্রায়

দশ বছর পর এই কাব্য প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের চালচিত্রে অনেক বদল ঘটেছে। বদল এসেছে কবির ব্যক্তিগত জীবনেও। তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পার হয়েছে। বিদেশ ঘুরে এসেছেন তিনি। দশ বছরের বেশি সময় ধরে অধ্যাপনা করছেন। ফলে চিন্তা ভাবনাতেও এসেছে এক পরিণতির ছাপ। যার প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যের কবিতাগুলিতে।

এই কাব্যগ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপটটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন মৃদুল দত্ত রায় – "ষাট-সত্তরের দশক পেরিয়ে এসে বাঙালি কবিদের জীবন নাগরিক ও ব্যক্তিগত জটিল আবর্তে প্রবেশ করেছিল। গণসংগ্রাম, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ মানুষের জন্য নতুন সূর্য ওঠেনি। বরং এক অনিবার্য ক্ষয় জীবনকে গানহীন করতে ভারী থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল। গণজীবন ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছিল। এরকম সংকটের দিনে গণেশ বসুর মতো দরদী শিল্পীরা একবারের জন্যও জনগণের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। ষাটের দশকের আন্দোলন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। আর আশির দশকের আন্দোলন হয়ে উঠল একক মানুষের সার্বিক বেঁচে থাকার লড়াই। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শকে অতিক্রম করেও যে কেবলমাত্র জীবনের প্রতিনিধি হয়ে বহুর জীবনের সংকটকে স্পর্শ করা সম্ভব, তা এ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।"[১৩]

গণেশ বসুর 'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৯-এর জানুয়ারিতে। শঙ্খ পুস্তক প্রকাশনের পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন শঙ্খনীল দাস। ছাপেন দি শিবদূর্গা প্রিন্টার্সের নারায়ন চন্দ্র ঘোষ। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ। উৎসর্গ - শ্রীচরণেষু মা-কে। কবিতাগুলির রচনাকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ থেকে জানুয়ারি ১৯৯৯। 'নীরব সন্ত্রাস' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন – "১৯৯০-এর একেবারে গোড়ায় এটি আচমকায় আমি ব্যবহার করি শ্বেত সন্ত্রাস, লাল সন্ত্রাস, গৈরিক সন্ত্রাস ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে। এই শব্দটি বেরিয়ে আসে আমি যে

কলেজে পড়াতাম সেখানকার অধ্যক্ষ ও তার একান্ত অনুগত মুষ্টিমেয় অধ্যাপকদের দুঃসহ আচরণে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার নিদারুণ অভিজ্ঞতা থেকে।”[১৪] কবি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চের শোকে শোকাভিভূত হয়ে যেভাবে শ্লোকের জন্ম দিয়েছিলেন, গণেশ বসুও তেমনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যাচারিত হয়ে ‘নীরব সন্ত্রাস’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। কিন্তু তারপরেই জীবন-অভিজ্ঞ কবি দেখলেন আজ গোটা দেশ নীরব সন্ত্রাসে আক্রান্ত। এ সন্ত্রাস শিরায় শিরায়, পরতে পরতে ঘুন ধরানো এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে সঞ্চারিত। হারিয়ে গেছে মানবিকতা, মানুষের মন হয়ে গেছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। প্রাণের সজীবতা, সরসতা কোথাও নেই, যেন – ‘গোটা দেশ ডুবে যায় মর্গের ভিতরে।’[১৫] জীবনের এই বিশুষ্ক ছবি ধরা পড়েছে সুদীর্ঘ ‘খরা’ কবিতায়।

কবি পার্থ রাহা ‘গণশক্তি’-তে (১৯৯৯) লেখেন – “এই গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা ‘খরা’ একটি উনিশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ কবিতা। খরা প্রকৃতিতে, খরা মানুষের মনে, চারপাশের জীবনে। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে প্রকৃতির খরা আফ্রিকা থেকে ওড়িশায়। প্রকৃতির খরা থেকে আমাদের চারপাশের বন্ধ্যাত্ব খরা। কিন্তু এই কবিতার ঐশ্বর্য হল এক নিবিড় প্রত্যয়।”[১৬]

‘নীরব সন্ত্রাস’ কাব্য রচনার আগে গণেশ বসু দুটি ভাষা-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন পবিত্র সরকারের সঙ্গে। ১৯৮৯-এর মার্চে প্রকাশিত হয় 'ভাষা-জিজ্ঞাসা' আর ১৯৯১-এর জুলাইয়ে প্রকাশিত হয় 'ভাষা-সরিৎসাগর'। দুটি গ্রন্থই 'বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির' থেকে প্রকাশিত।

২০০১-এর ৩০ নভেম্বর কবি অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। ২০০২-এ তাঁর সাতটি কাব্যগ্রন্থ (বনানীকে কবিতাগুচ্ছ, নিজের মুখোমুখি, রক্তের ভিতরে রৌদ্র, লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা, অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ, বাঘের থাবার নিচে, নীরব সন্ত্রাস) নিয়ে ‘গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১’ প্রকাশিত হয়। ২০০৩-এ ভাষা-সংক্রান্ত আরেকটি বই ‘ভাষাসঙ্গী’ প্রকাশিত হয়।

গণেশ বসুর অষ্টম কাব্যগ্রন্থ ‘অন্ন অশ্রু ভায়োলিন’ প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০০৫-এ। বসুধারা প্রকাশনার পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন কৌস্তুভ বসু। গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় এই 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন'-ই হল কবির জীবন ও কাব্যের বীজমন্ত্র। শৈশবে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসে অর্ধাহারে, অনাহারে কাটানোর সময় কবি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন অন্নের মহিমা। ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেই ছাত্রাবস্থায় খাদ্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে মার্কসীয় আদর্শে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কবিতার মধ্যেও আমরা তার ছাপ দেখতে পাই। অপরদিকে অশ্রু হল ছিন্নমূল মানুষের, ক্ষুধার্ত মানুষের, সর্বহারা, অত্যাচারিত, শোষিত মানুষের কান্নার প্রতীক। আর কবিতা হল কবির ভায়োলিন। তাতে অসহায় মানুষের বেদনার সুর যেমন বাজে, তেমনি বিদ্রোহের ঝঙ্কারও শোনা যায়।

২০০৬-এ সাহিত্য কৃতির জন্য গণেশ বসু মঙ্গলাচরণ স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

‘অন্ন অশ্রু ভায়োলিন’, ‘ভাসান দরিয়া’(প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮, বসুধারা প্রকাশনী থেকে) ও ‘ভাঙা বইঠার গান’(প্রথম প্রকাশ ২০১১, জানুয়ারি, মনন প্রকাশনী থেকে) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মৃদুল দত্ত রায় বলেন – “গণেশ বসুর রাজনৈতিক বিশ্বাস যা-ই থাকুক না কেন, দলীয় রাজনীতির অপরিসর, সংকীর্ণ, বাদুরে গন্ধে দমবন্ধ করা আদর্শে তিনি নিজের কবিতাকে বেঁধে ফেলেননি। তিনি দলকে পেরিয়ে দেখেছেন মানুষকে। সেই মানুষের যন্ত্রণা বারবার তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাই একসময় মানুষকে সংগ্রামী বোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি, তার বর্তমান স্বৈরচার গণেশ বসুকে নীরব করতে পারেনি।... গণেশ বসুর 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন', 'ভাসান দরিয়া' এবং 'ভাঙা বইঠার গান' পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার এক বিরাট ক্যানভাস হয়ে উঠেছে”।[১৭]

কবির একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ ‘নরকরোটিতে প্রজাপতি’ প্রকাশিত হয় ২০১১-র মার্চে। মনন প্রকাশনী থেকে। গ্রন্থটি আসলে কবির দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা, সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্যরচনার ফসল। এজন্য অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয়ও সাহিত্য। অবশ্য তাতে ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। গোপা দত্ত ভৌমিক গণেশ বসুর প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন– “লক্ষ্যণীয় তাঁর পড়াশোনার ব্যাপ্তি, গভীরতা, চিন্তার মৌলিকতাকে প্রকাশ করার ধরণটি। পান্ডিত্যের গদাঘাত করা তাঁর স্বভাবে নেই, আবার জনপ্রিয় হবার তারল্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। এমন ভারসাম্যময় প্রবন্ধ খুব বেশি দেখা যায় না।... গণেশ বসুকে কবি হিসেবেই লোকে প্রধানত চেনে, কিন্তু কবিখ্যাতির নীচে চাপা পড়ে রয়েছে তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়। পদ্যরীতির মতোই গদ্যরীতিতে রয়েছে তাঁর জোরালো অধিকার।”[১৮]

গণেশ বসুর পরবর্তী দুটি কাব্যগ্রন্থ ‘বর্ণময় পৃথিবী’, প্রকাশ জুন ২০১৩, মনন প্রকাশনী থেকে এবং ‘বলগা হরিণের শিং’, প্রকাশিত হয় মার্চ ২০১৫, কবিতা সীমান্ত থেকে। কবির সবচেয়ে বড় কাব্যগ্রন্থ ‘বলগা হরিণের শিং’, ১৯৬টি কবিতা স্থান পেয়েছে এখানে। কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্যও চোখে পড়ার মতো। ‘শাসক উন্মাদ হলে’, ‘শয়নকক্ষেও কর চাপালেন তারা’-র মতো প্রতিবাদী কবিতা যেমন রয়েছে সেখানে, তেমনি ‘বন্ধুতার মর্ম বুঝি বিদায় বেলায়’, ‘বাবাকেই দেখি’-র মতো একান্ত ব্যক্তিগত কথাকেও কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। জীবনের প্রান্ত বেলায় দাঁড়িয়ে যুবা বয়সের প্রেমের কথা, কবি-প্রেমিকা ইরিনার সঙ্গে বৃষ্টিমুখর বার্লিনের রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার কথাও বলেছেন তিনি।

‘বলগা হরিণের শিং’ হল কবির এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। অবশ্য কবির লেখনী এরপরও থেমে থাকেনি। আশি বছরে পা দিয়ে এবং অসুস্থ শরীর নিয়ে এখনও তিনি সমানে লিখে চলেছেন। ২০১৯-এর শারদীয় সংখ্যায় ‘নবপর্যায়’, ‘নতুন পথ, এই সময়’, ‘কবিতা কলকাতা’, ‘শারদীয় কালান্তর’, ‘শারদ নন্দন’ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ‘ক্ষমতাই শেষ কথা নয়’,

'মানবতা অদ্ভুত নীরব' প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় তাঁর লেখনীর অভিমুখেরও বদল হয়নি। শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মানুষের প্রতি অন্যায়, অবমাননা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরতে পিছুপা হননি। জাতীয়তাবাদের আড়ালে মানবতার অপমৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে কবি লেখেন -

"মানবতা অদ্ভুত নীরব, /রক্তে ভাসে শিশুদের শব,/ এর নাম রাষ্ট্রধর্ম বুঝি?/ মর্টারে অভিযানে জাতীয়তা স্মরণীয় পুঁজি।.../ মানুষ নিখোঁজ হয়, ছররা চলে মাত্রাহীনতায়/রাত্রি জুড়ে শুধু আর্তস্বর/ আপেলের বনে বনে মৃত্যুর খবর।"[১৯]

তথ্যসূত্র :

১) 'আমার বন্ধু কবি গণেশ বসু', 'অহর্নিশ'(পত্রিকা), বর্ষ - ১৯, সংকলন - ২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২ পৃষ্ঠা - ৫৯

২) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৪

৩) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৪

৪) 'অহর্নিশ'(পত্রিকা) বর্ষ আট, একাদশ সংকলন, শীত ১৪১১, পৃষ্ঠা - ৩

৫) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৫

৬) 'রক্তের ভিতরে স্বপ্ন', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ৯১

৭) 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ৯৫

৮) 'সিংহ', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ৭৪

৯) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৫

১০) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৫-২৭৬

১১) 'গণেশ বসুর কবিতা', 'এবং মুশায়েরা'(পত্রিকা), শারদীয়া ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৩০৯

১২) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৬

১৩) 'গণেশ বসুর কবিতা : এক অনির্বাণ রৌদ্রহাতিয়ার', 'অহর্নিশ'(পত্রিকা), বর্ষ - ১৯, সংকলন - ২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২ পৃষ্ঠা - ৭৫

১৪) 'কবি গণেশ বসুর সঙ্গে কিছুক্ষণ', 'সময় তোমাকে'(পত্রিকা), উৎসব সংখ্যা - ২০১০, পৃষ্ঠা - ৯৭

১৫) 'খরা', 'নীরব সন্ত্রাস', 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭০

১৬) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৯

১৭) 'গণেশ বসুর কবিতা : এক অনির্বাণ রৌদ্রহাতিয়ার', 'অহর্নিশ'(পত্রিকা), বর্ষ - ১৯, সংকলন - ২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২ পৃষ্ঠা - ৭৬

১৮) 'মনন ও আবেগের সমন্বয়', 'অহর্নিশ'(পত্রিকা), বর্ষ - ১৯, সংকলন - ২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২, পৃষ্ঠা - ৬৫

১৯) 'নবপর্যায়'(পত্রিকা), শারদীয় ২০১৯

@ কবিতাগুচ্ছ - ১

গ ণে শ ব সু
মেহগনি

দাঁড়িয়ে রয়েছে সুশোভন মেহগনি।
তবু ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাই অগোচরে - -
ধাঁধার তলানি, কিছু কিছু ধুলোবালি,
বাদামি পাতারা টুপটাপ খসে পড়ে।
আস্থার নাটবল্টুরা ক্রমশই
মরচেয় খুঁজে পেয়েছে পরমাগতি
পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতায়
ব্যক্তিও ভোলে ব্যক্তির পরিণতি।
দাঁড়িয়ে কি আছি বিদায়বিন্দুতেই?
ব্রহ্মার বুকে ভবিষ্যকাতরতা?
জনগণেশের পঙ্গুতা ভয়াবহ
একনয়কতা মূঢ়তার ব্যস্ততা।
বস্তুতন্ত্র উলঙ্গ ভোগবাদে
মেহগনি হাসে জীবনের আহ্লাদে।

আপাত নিরীহ জীবাণুরা প্রাণীদের
আশ্রয় থেকে উচ্ছেদ হয় যত
বেপরোয়া তারা পাল্টা আঘাত দিতে

ধ্বংস সাধনে উৎসবও করে তত।
পুঁজির দাপটে পরিবেশ তছনচ
খাঁ খাঁ অরণ্য বিনাশের ঝুমঝুমি
বহুযুগ ধরে বাগিয়ে চলেছে,
তবু
সীমাহীন লোভ শুষে নেয় জলাভূমি।
ভারসাম্যের হীনতায় ব্যবধান
মানুষে পশুতে ধাপে ধাপে এল কমে
পরিণামে ঘটে যেতে পারে একদিন
গণ-বিলুপ্তি জুনোতিক সংক্রমণে।
অতএব চাই সৃজনের সংগতি
অনিবার্যত মানবিক সংহতি।

কেমব্রিজে নব প্রজন্ম আলো খোঁজে
জীবিকার টানে কেউ ছোটে ফ্লরিডায়
ভয়ের মতোন ছোঁয়াচে কি কিছু আছে?
দিন কাটে কারো ভাঙনের বিছানায়।
সত্যি এখন কাছে দূরে দিশেহারা
অজানা অচেনা আতঙ্কে ভোর হয়
কালো ছায়াগুলি আয়নায় আঁকিবুকি
মারণাস্ত্রের কেউ কি চেয়েছে জয়?
কীটাণুকীটের ক্ষমতা যে কতখানি
হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ভবিষ্যত
আপ্তহননের অপলেই অনুরূপ,

ভুয়োদর্শনের উন্নয়নের রথ?
অস্তিত্বের আলাদা স্বপ্ন থেকে
বাঁচবে কি কেউ মিথ্যায় ঢেকে রেখে?

অথচ দাঁড়িয়ে ডানায় কান্না নিয়ে
এবং এখনো গল্পগুজব ঘাসে
নতুন উদার পুঁজিবাদ উন্মাদ
প্রতিস্পর্ধাও পিঠোপিঠি উঠে আসে।
অতিদানবিক তৃষ্ণা অন্তহীন
রাস্তা জুড়েই কঙ্কাল পড়ে থাকে,
ঘুম থেকে জেগে হা-অন্ন মিছিলেরা
টিপে মারবেই রাক্ষসী ভোমরাকে।
মানবিকতাও অতিমানবিক হোক
মহামন্দার দাঁত কেন ব্ল্যাকডেথে?
বৃষ্টিবাসনা। বুকের পাটাও চাই।
মেহগনি স্থির আলোকের সংকেতে।
দায়িত্বহীন পার্থিবতায় ভয়
ছন্দ-নিধনে আমরণ পরাজয়।

১৪.০৪০২০

কোভিড-উনিশ

কোভিড-উনিশ ব্যস্ত এইখানে মর্গের মতোন।
অন্ধকারবিলাসিতা চ্যানেলে চ্যানেলে মারমুখী,

মুমূর্ষু রুগির খোঁজে তোলপাড় করে যায় ড্রোন আর নিরীহ খোচর,
আশি বছরের বৃদ্ধ রুটি-মুড়ি পেটের জ্বালানি নিয়ে আসে।

আতঙ্কের মধ্যে বাঁচা, বেঁচে মরা যাপনের উপাদানগুলি।
তৃষ্ণা নিয়ে যার ঘুম ভেঙে যায় সূর্যোদয়ে, তৃষ্ণা তার সূর্যাস্তেও হুবহু
নিরুদ্দেশে কেউ যায়, কেউ কেউ অপেক্ষায় যেরকম ঘরবন্দি থেকেছে কেমোর প্রবীণা,
বাসনার অপমৃত্যু, অনুভূতি উস্কে দেয় দাঙ্গা মহাযুদ্ধের বিভ্রম।

এবং এখন
খন্ড খন্ড ধ্বংসচিত্র এগোতেই থাকে,
ছুটে যাচ্ছে এ্যাম্বুলেন্স বিশ্বজুড়ে শোকার্ত কফিন
জীবন চিবোয়।

হাজার হাজার মৃত মানুষের মুখে সত্য হয়ে জ্বলে অমোঘ মিথ্যাটি।
হয়তো বা রেখে যায় তবু কিছু কিছু
সাদা-কালো অভিজ্ঞতা, চেতনার শিকড়-বাকড়।

১২.০৪.২০

ম ধু শ্রী সে ন সা ন্যা ল

সর্বংসহা

বেহুঁশ জ্বরে উথাল পাতাল উপত্যকা জুড়ে--
বিপন্নতা শেকড় খোঁজে প্রলেপ খুঁড়ে খুঁড়ে
ঘরের মধ্যে চাপান-উতোর একাকিত্বের বীজে
নিঙড়ে নেওয়া এই পৃথিবী উন্মাদ আজ নিজে
মৃত্যু-মিছিল প্রান্ত পেরোয় আতঙ্কিত জমি
ভারসাম্য উগরে দিল ক্ষোভের রক্তবমি—
লুঠতরাজের বেয়াদপি গুনছে কি প্রমাদ!
শিকড় ছুঁয়ে সফল তো নও পাশেই গভীর খাদ....
সুশ্রুতেরা ভরসা জোগায় আলোর দরজা খুলে
সর্বংসহা মাফ করবেন সকল ক্ষত ভুলে
পাহাড় হেঁচে জোগাড় হবেই বিশল্যকরণী
আঁকবে আলো দিকে দিকে সুস্থ-রোদের খনি---

পলাশ

ছোট্ট এই শহরের সঙ্গে ওর
ভাগ্যিস নিবিড় সখ্য নেই - -
শূন্যতা গালিচা পেতে বসে নির্জন ঘাটের পাশে
এ এক চরম ব্যাধি.......
নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পড়ার টেবিলে
নক্ষত্রের আলো জ্বালে

ধ্বংসের মায়ায় গড়া এ জীবন
ধরে রাখে জলের মতন---

আগে ছুটে যেত শাল মহুয়ার বন আর
অস্থির জলের কাছে,
সেসব জঙ্গলে ফোটে এখন পলাশ
মায়াবী পাহাড়-কোলে আবির ছড়িয়ে
এবার গেল না ছোঁয়া - - -

কাটিয়ে আতঙ্ক-ত্রাস, লকডাউন দ্যাখে
দূরে লাল বসন্ত এসেছে.......

নৃ পে ন চ ক্র ব র্তী

ছুঁয়ো না

ছুঁয়ো না,
দূরে থাকো।
একার গন্ডি এঁকে
আপাতত কয়েকটা দিন
দূরে থাকো।
শব্দ হীন আসে ওরা -অনঙ্গ!
খুঁজেও পাবে না তাকে
তন্ন তন্ন চিরুনি তালাশে!

ওরা আসে,
ভালোবাসে,
ভয়ংকর ভালোবেসে
বাসাবাঁধে ওরা,
হৃদয়ের খবর চায় চুপি চুপি-
ছায়ার মতোন!
ভালোবেসে গরল চুম্বনে
নিয়ে যাবে বহুদূর- নিশ্চিত ঠিকানায়!

ছুঁয়ো না,
দূরে থাকো,

একার গন্ডি এঁকে
আপাতত কয়েকটা দিন-শব্দহীন
বৃত্তে থাকো।

অশ্বিনী কুমারেরা যুদ্ধ শেষে ফিরে এলে
আমরা আবার ফের কাছাকাছি হবো,
কাছাকাছি -নক্ষত্রের তলে।

তবুও

(১৯৮১ সালে প্রকাশিত একটি কবিতা)

দু-পাশে ছড়িয়ে আছে আমাদের সমস্ত-
সঞ্চয়
ছিন্ন শোক,প্রপিতামহের রক্ত-
ব্যভিচারে নগ্ন ইতিহাস!

এখনো টিলার ধারে ব'সে আছে অসংখ্য-
মানুষ,
ভাঙা অ্যান্টেনায় ছুঁয়ে আছে ব্যক্তিগত –
সুখ
কিছু কিছু বিষণ্ণ উত্তাপ।

এখানে অনেক দুঃখ

মৌন মুখ স্থির হয়ে আছে,
এখানে অসংখ্যবার শ্যামল বনানী জুড়ে
বয়ে গেছে নিঃশব্দ প্লাবন,

তবুও মানুষ বাঁচে এইসব মহামারী নিয়ে,
মধ্য রাতে জ্যোৎস্না আঁকে বুকে!

বুকে তার নির্বিঘ্ন ভাঙন!!
(এই কবিতাটা কেমন এ সময়ের দলিলের সাথে মিলে যায়।)

কু মা রে শ চ ক্র ব র্তী

22শে মার্চ, 2020

ভালই হল কলকাতা লকডাউন-----
আমাদের ভেতরেও বেড়ে ওঠা সন্দেহ
ডালপালা ছড়ানোর আগেই দাঁড়িয়ে থাকল সেখানেই----
ঠিক যেখানে ছিল সে কর্মক্ষম !
এই সংক্রমণ আর তৃতীয় ধাপে
সক্রিয় হয়ে ওঠার শুরুতেই আটকানো যাবে---- পুরোটাই !
আমরাও যে যার মতো করে
এ্কাকিত্বে নিয়ে যাব নিজেদের-----
ভুল ভেঙে ভালবাসাও ফিরে এসে শিগগিরি
অ্যান্টিবডি তৈরি করে নিয়ে নিজেকেই
স্কুল গেটে দাঁড়াবে হেসে লাল গোলাপের----
শুভেচ্ছা জানাতেই ।
এবং তখনই ধরা পড়ে যাবে-----
কোথায় অবহেলা ? কোথায় কতটা ভুল ?
আর কোথায় কতটা এই সন্দেহ ছিল কার ?
যদি পরিশ্রুত হতে পারি কিছুদিনের মধ্যেই-----
কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে সেখান থেকেই
নতুন সমুদ্রের গায়ে----- ‘ভালবাসি’
লিখে জানাব একে অন্যকেই-----

সংক্রামিত

আমাদের ভেতরেও কি দূরত্ব বেড়ে গেল হঠাৎ ?
বিশ্বাসেও কি চিড় ধরে গেল অনেকটাই ?
মাস্ক পরে এসে যে কথা রেখে গেলে
তার অনন্ত ভ্যালিডিটির কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারো ?
লকডাউনের প্রথম একুশ দিনেই যদি
আক্রান্ত হয়ে পড়ি-----
তখন কারও প্রেরণায় তুমি খোলামুখে
দ্বিতীয় পছন্দের কাউকে নিরাপদ ভেবে নেবে না তো ?
দ্য ভিঞ্চির তুলি-রঙের ভেতরেও এখন মোনালিসা
বিশ্বাসযোগ্য কোনো কোয়ারেন্টাইন খুঁজে পাচ্ছে না ;
পৃথিবীর গায়ে বিপদের পোকারাও কেমন
কিলবিলিয়ে বেড়ে উঠেছে ;
এ সময়ে স্বপ্নেও কেউ কাউকে আর কাছে চাইছি না-----
স্বপ্নও যদি ঘুমের মধ্যে সংক্রমণ লুকিয়ে ফেরে!

মি ন তি গো স্বা মী

পরমাত্মীয়

এখন সবাই দূরত্ব বজায় রেখে চলছে
প্রতিবেশী দেখে সন্দেহের চোখে
স্বামীর চোখেও সংশয়
ছেলের মুখে ও হাজার প্রশ্ন।

জানালার বাইরের আকাশটা
শুধু মায়াবী স্পর্শ দেয় চোখে
দক্ষিণের বারান্দায়
সবুজ টিয়াটা ভরসায় এসে বসে
ছাদের বেলফুলগুলো
গন্ধ ছড়িয়ে
আমাকে কাছে ডাকে
পায়ে পায়ে হেঁটে
তার পাশে বসি
হাত দিয়ে তার চিবুক
স্পর্শ করে বলি
আমাকে ক্ষমা করে দে তোরা।
তোদের কখনো প্রতিবেশী বলে
ভাবতেই শিখিনি
জীবনের যুদ্ধে তোরাই পরমাত্মীয়।

ঘরে থাকো

ঘরে আছো।ঘরে থাকো
আর বীরত্ব দেখিওনা
মৃত্যু দুয়ারে কড়া নাড়ছে
দরজা কিছুতেই খুলোনা।

দেখছো না সেই ছবিটা
আট বছরের একটা বালক
এ্যাম্বুলেন্সে চেপে একা একা হাসপাতালে যাচ্ছে
কৌতুহলী প্রতিবেশীরা ছবি তুলছে
ছাদ অথবা বারান্দা থেকে
ক্যামেরা অন করে
এই মুহূর্তে কেউ আসছে না
রোগীর প্রতিবেশী হতে।

দেখছো না সোস্যাল মিডিয়ায়
কুড়ি বছরের একটি যুবক কাল
কলকাতার সব হাসপাতাল ঘুরে ও
চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে
ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে ঘরে।

এখন একটি রোগী
একটি হাসপাতাল বন্ধ করে দিচ্ছে

ডাক্তারবাবুরা দলে দলে যাচ্ছে কোয়ারেন্টাইনে
তাই কবিতা আবার আবেদন জানাচ্ছে
ঘরে আছো, ঘরে থাকো
বীরত্ব দেখাতে বাইরে বেরিওনা
মাথায় রেখো
এ রোগীর কেউ প্রতিবেশী হয়না।

তা জি মু র র হ মা ন

না-পড়া মেঘদূত

এখন ভালবাসায় না থেকে চলো বিরহের খেলা খেলি!
সমস্ত রকম বিরহ – ব্যক্তি থেকে সামাজিক
সাবলীল ফ্রেমে জেগে উঠুক চরাচরে
প্রতিটা পুরুষ আজ একা হয়ে যাক, এমনকি নারীও
পথে-প্রবাসে বৃক্ষের আড়ালে কিংবা ছায়ায় যারা
আজো ভাসাতে চায় নাও ফাগুন ঝরনায়
তাদের বলি একটু বিরহী হয়ে ওঠো

বিধ্বংসী আগুনের মতো ছুটে আসছে পদহীন এক
আণবিক মৃত্যুদূত; পরম একাগ্রতা নিয়ে
প্রথম, দ্বিতীয় ছাড়িয়ে তৃতীয় বিশ্বের দরজায় তার
আস্ফালন বর্জ্য রূপে ঝরে পড়ার আগে
চলো বিরহের ভাঁজে বেঁধে নিই ছইমাচার ঘর
হাতের উপর থেকে সরে থাক হাত ক্ষণকাল
দুর্বাশার অভিশাপে যেমন শকুন্তলার অকাল

দেখো কেমন অনলস পর্যটনে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে
মেঘ ও মায়া
বৃক্ষও জেনে গেছে আজ বিরহের দিন
নির্বাসন নয়, নির্বাচন করে নিতে শেখো দূরত্বকে

নিবিড় বৈশাখ শুধু কথা বলে নিক ঋতুদের সঙ্গে
তাহলেই পলাশের ডালে ডালে ফুটে থাকা বসন্তও
শুনিয়ে দিতে পারে না-পড়া মেঘদূত

ট্রুডোর চোখের জলে

পরম শূন্যতার ওপর বসে রয়েছে আমার দিনলিপি
চারিদিকে এত হাহাকার ছুঁয়ে রয়েছে যে
এই বসন্তের রাতেও ম্লান অমরাবতী, সৌন্দর্যসুখ
অথৈ বরষার মতো ক্রমে ধেয়ে আসছে
শ্মশান কবরের গান
রক্তাল্পতায় আক্রান্ত পিতার হাত ধরে তবু
পার হয়ে যেতে হয় জীবন

প্রিয় পড়শির বাড়ি থেকে উড়ে আসা ক্রন্দনধ্বনি
কেমন অচেতন দৃষ্টি হয়ে থমকে গেছে
বৃক্ষের পাতায় পাতায়। কেঁপে ওঠা কারা যেন
বলে গেল এখন মহামারী, এখন করোনা – বসন্ত
টাল খেয়ে যাওয়া যৌবন ঠায় দাঁড়িয়ে করজোড়ে
উপশম প্রার্থনায়

ছুঁয়ে ছুঁয়ে রয়েছে নির্ভার বিকেলের জংশন

অথচ সমস্ত আরাধনা শেষ হলে মাতৃত্বের খোয়াবে
শিশুটিও কেমন আনমনা হয়ে পড়ে, আর
অলক্তিকা সময়ের অশ্রুবিন্দু থেকে ঝরে পড়া
অনপনেয় দুঃখগুলো দরজায় কড়া নাড়লে
জাস্টিন ট্রুডোর চোখের জলে চিনে নিতে হয় দেশ

@ প্রবন্ধ - ২

ত রু ণ মু খো পা ধ্যা য়

সঙ্গ নিঃসঙ্গতার আখ্যানকার আফসার আমেদ

আট দশক বা আশির লেখক আফসার আমেদ (জ. ১৯৫৯) তাঁর, জন্ম হাওড়া জেলার কড়িয়া গ্রামে। ঘর গেরস্তি (১৯৮২) উপন্যাস দিয়ে তাঁর লেখক জীবনের শুভযাত্রা শুরু। তাঁর গল্প–উপন্যাসের বিষয় মুসলমান সমাজ। আমাদের আধো চেনা মুসলমান-সমাজ, সংসার, তার সদর–অন্দর নিয়ে একালে আবুল বাশার ও আফসার আমেদকে বিশেষভাবে চর্চা করতে দেখা যায়। তাঁর লেখক সত্তার স্বীকৃতি হিসেবে আফসার পেয়েছেন বাংলা অকাদেমি পুরস্কার, সোমেন চন্দ পুরস্কার। অনুবাদের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। অনেকগুলি উপন্যাসের স্রষ্টা তিনি। তবে তাঁর স্বল্পালোচিত উপন্যাস 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' (১৯৯৪) যেখানে লেখক সমকালীন একটি আখ্যানকে আন্তরিকভাবে ব্যাখ্যা করতে ও সমাধান সূত্র খুঁজতে চেয়েছেন।

মেয়েটির নাম দীপা। ছেলেটি নিজাম, পড়াশুনার সূত্রে আলাপ, প্রেম ও বিবাহ। বলা বাহুল্য, হিন্দু মেয়ের পক্ষে মুসলমান যুবকের বধূ হওয়া সময়ে স্পর্ধা ও সাহসের ব্যাপার। সেকালে যা প্রায় অসম্ভব ছিল; একালে তা বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সম্ভব হয়। কয়েক বছর আগে রিজওয়ানুর–প্রিয়াঙ্কার প্রেম ও ট্র্যাজিক মৃত্যু কারোর অজানা নয়। এছাড়া উত্তরপ্রদেশে আজও মেয়ের বাবা–মা–দাদা–কাকারা পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে মেয়ে ও প্রেমিককে হত্যা করেন; সংবাদপত্রে তা ছাপতে হয়। কাজেই পরিবারের অমতে শুধু ভালোবাসার টানে দুই যুবক–যুবতী জাতি–ধর্ম–আচার–প্রথা অগ্রাহ্য করে মিলিত হয়েছে, এটা অভিনন্দনযোগ্য। নিজের চেষ্টায় নিজাম ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছে। ফ্ল্যাট কিনেছে। সুখী, সুন্দর, নিভৃত দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করেছে।

কিন্তু জীবপ্রবাহ কখনো সরলরেখায় চলে না। বিয়ের এগারো বছর কেটেছে।একদিন যে সম্পর্ক ছিল মধু–মাখা, অতি সেখানে কাঁটা উঁচিয়ে থাকে। মধুরালাপ তিক্তালাপে পর্যবসিত। নিজাম ভাবে, যদি তাদের একটি সন্তান থাকতো, তার এই শূন্যতা, দূরত্ব তৈরি হতো না। দীপা ভাবে, সন্তান ধারণে সে সক্ষম নয়

বলেই স্বামীর টান–ভালোবাসা আর নেই। দুজনেই দুই দ্বীপের বাসিন্দা। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের বনের পাখি ও খাঁচার পাখির মতো।

দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মারে পাখা,
কাতরে কহে 'কাছে আয়'। (সোনার তরী)

নিষিদ্ধ বিবাহের জন্য তারা স্বজন-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন। আফসার জানান : '...কেউ কারোরই আত্মপরিবারের স্নেহ দয়া পায় না দুজন মানুষ দুটি দ্বীপ হয়ে একই ঘরে কাল কাটায়।'

জাতি–বর্ণ বিভাজন মেনে নিলে নিজাম টানে, তাকে...

হয় দীপাকে ফেলে, ত্যাগ করে আরামবাগে আত্মপরিবারে ফিরে যেতে হয়, না হয় দীপার সঙ্গেই থাকতে হয়...।

দীপাকে সে ভালবাসে। ত্যাগ করতে পারবে না। দীপার হিন্দুত্ব-হরণে সে রাজি নয়। যে যার মত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে থাকুক। শুধু হৃদয়-ধর্মে তারা একাকার। বন্ধ্যাত্ব ছাড়াও দীপার মানসিক বিকারের কারণ নিজামের মনে হয় 'তারা হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে করেছে বলেই এই বিচারের এমনতর ধরণ, জটিলতা'। অথচ এগারো বছর আগে কী ছিল :

কোন হিসেবনিকেশ না করি ওরা বিয়ে করেছে। প্রেমই ওদের প্রেরণা। অনেক কিছু ত্যাগ করেছে ওরা। নিজামও, দীপাও। বিয়ের পাঁচ বছর ভালো ছিল, তারপর থেকে সম্পর্কের ভেতর চিড় ধরতে শুরু করেছে।

এখন তারা যেভাবে বেঁচে আছে, নিজামের ধারণা 'অশুভ একে বাঁচা বলে না। একে অপরের প্রতি আস্থা তারা হারিয়েছে, প্রেম হারিয়েছে।' তাহলে কি এই অসম বিবাহই তাদের দুর্দশার মূল কারণ? নিজাম ভাবে। মৃতসন্তান প্রসবের পরই দীপার বন্ধ্যাত্ব, সন্তান ধারণের অক্ষমতা তৈরি হয়েছে। নিজাম ও দীপা ভাবে তবে পরিবারের শুভেচ্ছা, সমর্থন না পেয়েই কি এই অভিশপ্ত জীবন এলো? অন্তত দীপার ধারণা এটাই। ক্রমশ 'সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়ে উঠেছে ওদের। ভয়ানক বিচ্ছিন্নতা।'

দাম্পত্যজীবনের সংকট নিয়ে উপন্যাস লেখা নতুন নয়। এমনকি মুসলমান সমাজ নিয়েও। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বা 'রাজসিংহে' এমন সংকট চিত্রিত হতে দেখা যায়। আবুল বাশার তাঁর 'ফুল বউ' উপন্যাসে মুসলিম সমাজে চিত্রার বিয়ে নিয়ে যে সমস্যা কেমন তাও দেখিয়েছেন। এ তো বাহ্য। আফসার এইভাবে কোনো

ঘটনার বর্ণনা দিতে চাননি। তাঁর লক্ষ্য দুই ভিন্ন ধর্মের যুবক-যুবতীর মনোলোক পরিক্রমা করা। একই ছাদের তলায় কত যে মানুষ নিজস্ব বৃত্তে নিঃসঙ্গ দেখাতে চেয়েছেন শুধু শরীরই নয়, মনের দরকার। দুয়ে মিলে পূর্ণতা। সেতু হতে পারে; কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। শরীর বাসনা দ্রুত নিঃশেষিত হয়। তার পর থাকে মনের টান, অনুরাগের রঙ। যা দুই নরনারীর জীবনকে সরস সজীব উজ্জ্বল করে। ‘সঙ্গ নিঃসঙ্গ’ উপন্যাসে আমরা দেখি দীপা ও নিজামের গভীর প্রেমের ছবি। বাথরুম-প্রেমিক নিজাম আয়নায় নিজেকে দেখে ও আত্মসমালোচনা করে। দীপা স্বামীর জন্য তেল–সাবান–গামছা সাজিয়ে রাখে। ভুলোমন স্বামী তোয়ালে নিতে ভোলে। বাথরুমে মন তাজা হবে বলে, সে সুগন্ধ ছড়ায়। যত্ন করে চা করে। স্বামী ঘুম থেকে ওঠার আগে বাজার করে। মাছ মাংস আনে। ঘুমন্ত স্বামীকে ঠেলে জাগিয়ে বেড–টি দেয়। স্বামী অফিসে গেলে সারাদিন ধরে ঘর সাজায়, গোছায়। সন্ধ্যেবেলা নিজাম ফিরে এলে তার জন্য সাজগোজ করে, জলখাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করে। একসঙ্গে খায়। চমৎকার এক দাম্পত্য জীবন ও সংসারের ছবি।

এমন ছন্দেগাঁথা জীবনে নিঃসঙ্গতা তৈরি হয় পাঁচ বছর পর। সন্তান হারানো আর চিরতরে বন্ধ হওয়ার বেদনা দীপাকে মানসিক রোগী করে। ক্রমশঃ সে ভয়ের, নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। যে ভাবে তার মুসলমান স্বামী যেকোনো সময় তালাক দিতে পারে। একাধিক বিয়ে করতে পারে। নিঃসন্তান অনুর্বরা নারী ভেবে অন্য নারীর সঙ্গ করতে পারে। কার্যত নিজাম এসব করে না। কিন্তু অভিযোগের তীরে বিদ্ধ হয় দুজনের মধ্যে অবিশ্বাস ও প্রেম বাসা বাঁধে। সেই বেড়া টপকাতে পারে না নিজাম। সাধ্যমত সংযত রেখে, বুঝিয়েও পারে না।

তাদের দাম্পত্য কলহের এক টুকরো এইরকম –

– আমাকে তুমি ভুল বোঝ।

– না না।

– আমারও একটা মন আছে।

– জানি।

– সারাদিন একা থাকি, আমি কী নিয়ে থাকব?

– সে আমি জানি।

– ভগবান আমার ছেলে কেড়ে নিয়েছে।

দিপার কপালে হাত রাখে নিজাম।

কোন কোন দিন দীপা খুব স্বাভাবিক ছন্দময় হয়ে উঠে। সাজগোজ করে। স্বামীকে আদর করে। দুজনে কোথাও বেড়াতে যাবে ভাবে। সেই মধুর মুহূর্তকে নিজাম আনতে চায় 'আমরা ঝগড়া করি কেন?' দীপা বলে, 'জানি না' এরপর

> "নিজাম দীপাকে বুকের ভেতর চেপে ধরে। নিজাম বড় দুঃখী, দীপার আক্রমণের শিকার। বড় বিচ্ছিন্ন, বড় একা সে, ক্ষতবিক্ষত বটে।"

প্রায় নিস্তরঙ্গ এই দাম্পত্য জীবনে একদিন দোলা লাগে। এক দুপুরে আরামবাগ থেকে নিজামের বন্ধু হোসেন আসে তার যুবতী বোন সাহানারাকে নিয়ে। ব্যাঙ্কের কাজ সেরে নিজাম সাহানারাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাতে নিয়ে যায়। এক সদ্য যুবতীর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে, ঘুরতে ভালোই লাগে। যদিও সে কথায় কথায় জেনে যায় সাহানারা এক হিন্দু যুবককে ভালোবাসে। বাড়ির অমত জেনে তার জেদ সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। হোসেন এলে সাহানারা চলে যায়। বাড়ির গুমোট পরিবেশে কিছুতে মন চায় না নিজামের। অন্যদিকে দীপাকে আজকের ঘটনাও বলতে ইতস্তত করে। যদি ভুল বোঝে। ইদানিং, সে বারে যায়, মদ খায়, কর্লগার্লদের সঙ্গে নাচে। দীপা জানে না। শুধু মদ্যপ হয়ে বাড়ি ফিরলে দীপা গম্ভীর হয়। কিন্তু সাহানারা প্রসঙ্গ দীপাকে না জানানেনাটা তার যুক্তিযুক্ত মনে করে। কিন্তু হঠাৎই পরদিন চমক দিয়ে তাদের ফ্ল্যাটে হোসেন সাহানারা আসে। কথা প্রসঙ্গে দীপা জানতে পারে, কাল নিজাম মেয়েটিকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল। শোনবার পরই তার মধ্যে যন্ত্রণা, রাগ, সন্দেহ জেগে ওঠে। দুপুরের খাওয়া সেরে হোসেন ও সাহানারা সিনেমা দেখতে যায়। তার আগেই নিজাম চলে যায় ব্যাঙ্কে। সেদিন ব্যাঙ্ক ছুটির কিছু আগে পিয়ন জানায় নিজামের জন্য এই ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন। তবে কি সাহানারা এলো? এমন দোলাচলে নিজাম তাকিয়ে দেখে দীপা এসেছে। কোনদিন সে ব্যাঙ্কে আসেনি। তাহলে বিপদ কিছু ? দীপা তা নয়, তেমন কিছু না। গড়িয়াহাটে শপিংয়ে এসে ব্যাঙ্কে এসেছে। যাতে একসঙ্গে বাড়ি ফেরা যায়। নিজাম থাকতে পারে না। ফেরার পথে পাঁচ কথায় সে জানতে পারে, সাহানারার সঙ্গে নিজাম সিনেমা দেখতে গেছে ভেবেই সে সরেজমিন তদন্তে এসেছে। ফ্ল্যাটে ঢুকেই দীপা বোমার মত ফেটে পড়ল পড়ে। নিজাম তাকে ছুঁতে বলে বলে, 'আমাকে ছোঁবে না।' কী তাঁর অপরাধ জানতে চায় নিজাম। প্রত্যুত্তরে শোনে, 'তুমি একটা ছোটলোক ইতর'; 'তুমি দুশ্চরিত্রের লোক'। কারণ, মেয়েটিকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার কথা চেপে গিয়েছিলে যে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত; আমাকে জানাওনি, তার মানে তোমার

মনে পাপ ছিল।’ হাঁটুর বয়সী মেয়ে এবং অন্যের বাগদত্তা যে, তার সঙ্গে নিজামের প্রেম? সে হেসে ওঠে। বহুকষ্টে স্ত্রীকে ব্যাপারটা সে বোঝায়। সাহানারার প্রেম, বিয়ের সন্ন্যাস নিয়েও বলে, শান্ত হয় দীপা। পরিস্থিতি অনুকূল দেখে নিজাম বৌকে প্রস্তাব দেয় ‘তুমি একটা বাচ্চা নাও দীপা।’ জানায় অনাথ বাচ্চাদের দায়িত্ব নেওয়া কত পুণ্যের কাজ। দীপার মন সায় দেয় না। অন্যের সন্তান নিয়ে শূন্যতা পূর্ণ হবে? নিজাম বোঝায়, শিশুটিকে নিজের ভাবলে আর অভাববোধ থাকবে না। স্বামী-স্ত্রী মাঝখানে শূন্যতা ও ভুল বোঝাও থাকবে না। দীপা এবার বোঝে। সে শান্ত নদীর মতো হয়ে ওঠে ?

দীপা ও নিজামের সংসারে আবার সুর ফিরে আসে। আগের মতন দীপা সংসারে, সাজগোজে মেতে ওঠে। স্বামীর সুখে মন দেয়, স্নানের জন্য নিজাম বাথরুমে গেলে আদুরে গলায় দীপা বলে, ‘বাথরুম প্রেমিক কোথাকার।’ যেটুকু সময় নিজাম বাথরুমে যাবে; দীপার নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়। ধাক্কা দেয় দরজায়। একসময় দরজা খুলে নিজাম ‘হাসিমুখে দীপার মুখোমুখি হয়।’ সঙ্গ নিঃসঙ্গতাকে মুছে দেয়।

নি রু প ম আ চা র্য

আফসার আমেদের গল্প : নারীর কথা

গল্প বলা ও গল্প শোনার বিষয়টা সুপ্রাচীনকালের। মুখের বয়ান লেখার রেখায় রূপ পেয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পঞ্চতন্ত্র বা জাতকের গল্পে। তারও আগে রূপকথা, উপকথা লেখা হয়েছে। তবে একথা ঠিক সাহিত্য প্রকরণ (Types of Literature) হিসেবে গল্পের বিশ্লেষণ, তার সংজ্ঞা দান, অবয়ব বিচার ইত্যাদি খুব বেশি দিনের নয়। বিশ্বসাহিত্যের মতো আমাদের ভাষায় এনিয়ে প্রথম আলোকপাত করলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাংলায় সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা। তাঁর আগে স্বর্ণকুমারী দেবী (তাঁর অগ্রজা) গল্প লেখার প্রয়াস পেয়েছিলেন ‘মালতি’, ‘লজ্জাবতী’, ‘গহনা’, ‘যমুনা’ ইত্যাদিতে। তারও আগে নীতিমূলক গল্প অনুদিত হতে দেখেছিলাম। দেখেছি ইসলামিক গল্প ‘চন্দ্রকান্ত’, ‘চন্দ্রবংশ’, ‘কামিনীকুমার’, ‘হাতেমতাই’, ‘লায়লামজনু’ প্রভৃতি রচিত হতে। সে তো অনেককাল আগের কথা। উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন ‘হিতবাদী’, ‘সাধনা’, ‘ভারতী’, প্রভৃতি সাময়িকীতে। পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের দেখা যায় ফরাসি কথাসাহিত্যিক মপাশাঁ (১৮৫০–১৮৯৩) লিখেছেন ‘গোলোয়া’ ও ‘জিলেব্লা’র পাতায়, রাশিয়ার কথাকার চেকভ (১৮৬০–১৯০৪) লিখেছেন অসফল্ কি ও বুদিলনুকিতে, অ্যামেরিকার অ্যালান পো (১৮০৯–১৮৪৯) লিখেছেন ‘স্যাটারডে ক্যুরিয়ার’ ও ‘স্যাটারডে ভিজিটার’–এ। এই কথাগুলো বলছি যে এঁরা প্রত্যেকেই সংবাদ সাময়িকীতে লিখতে শুরু করেছেন সমকালীনতা ও সংক্ষিপ্ততার কথা মেনেই।

বাংলায় উনিশশতক নানা ঘটনায় উত্তাল এক শতক। এই শতক নবজাগরণের শতক। আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনাসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা ঘটনাক্রমে মানুষ তখন আন্দোলিত। একদিকে ইংরেজ শাসনকালে

মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল–কলেজের প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত, দৈবী ভাবনায় আচ্ছন্ন ধর্মান্ধতার বেড়াজাল থেকে বের করে আনা ইত্যাদি কাজগুলি চলছিল। একথা সকলের জানা। তবে এই সময়ের সবচেয়ে বড়কাজ মেয়েদেরকে সামনের সারিতে তুলে আনা। যদিও কাজটি সহজ ছিল না। এদেশের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ইংরেজদের সাহায্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। এনিয়ে গোঁড়া সংস্কার বিরোধীদের সঙ্গে সংস্কারবাদীদের বিবাদ কম হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই শতকের শেষের দিকে নারী পুরুষ উভয়ের উন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। পুরুষরা এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেননি। কেমন ছিল সেই বিষয়টি :

"পুরুষদের কাছে সেদিন নারী ছিল জীবন্ত সম্পত্তি, শুধু ভাত কাপড় দিয়ে পোষা বিনা মাইনে দাসী মাত্র। ইচ্ছের হাড়িকাঠে তাদের যতবার খুশি বলি দেওয়া চলত। সমাজের সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা নারীর অঙ্গে পাকে পাকে জড়ানো শৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল খুব সহজে, কারণ সকল অনর্থের মূল অর্থ এবং অর্থোপার্জনের যাবতীয় উপায় ছিল পুরুষের হাতে।"[১]

পুরুষসমাজ মেয়েদের নিরুপায়তার সুযোগ নিয়ে অধিকারের নামে অবাধে স্বেচ্ছাচার করে গেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকে সমাজ সংস্কারের প্রধান কথা ছিল নারীমুক্তি – আধুনিক অর্থে নয়, তখন নারী শিক্ষা, নারীর অধিকার এবং নারী প্রগতির দেখেই মনীষীদের দৃষ্টি পড়েছিল।

এই সমস্যাগুলোই শেষ নয়। লেখাপড়া শেখা, জামা জুতো পরা, বাইরে বেরোনো, গান গাওয়া, গাড়ি চড়া, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলা সবই পড়ে।

দীনবন্ধু ১৮৬০–এ 'নীলদর্পণ' নাটকে সরলতার মুখ দিয়ে বলেছিলেন, 'রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই।' কেননা পাঁচজন সঙ্গিনী নিয়ে বাগানে যাওয়া, শহরে বেড়াতে যাওয়া, মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের জন্য কলেজ, কাছারি, সভাসমিতি কিছুই ছিলনা। ঊনিশ শতকের লড়াইটা ছিল

এখানে। সমস্ত 'না' এর বন্ধ দরজা খুলে দিতে হবে। এই লক্ষ্যে তৎকালীন সমাজ সংস্কারকেরা কাজ করছিলেন। পাশাপাশি সাহিত্যিকরা তাঁদের গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে নারীমুক্তির ছবি আঁকছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সবলা' কবিতায় লিখলেন:

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা !'

আর নারীর উদ্দেশ্যে তার জিজ্ঞাসা – 'শুধু শূন্য চেয়ে রব।'

বহু গল্পে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দরা নারীর নির্মম ভাগ্য পরিহাসের কথা লিখলেন। আর তখনই পট পরিবর্তন হল। তখন মানুষ ভাবতে শুরু করলো –

'Men and Women are better than heroines'

উনিশ শতকের গোড়ায় মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা সমানাধিকার, নির্যাতন, বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে অনেক গল্প লেখা হলেও ছবিটা আমূল বদলে গেল না বিশ শতকেও। বিশ শতকে বহু লেখক এলেন সমাজ বাস্তবতার কথা বললেন। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই দশকে সমাজ বদলে যাওয়ার কথা, দেশবিভাগ ও পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা–সহ, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক–সহ নারীদের কথা এল।

বঞ্চিত নারীর হাহাকার, নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিবাহ পূর্ব ও পরবর্তী সংকট, নারীদের যৌন লাঞ্ছনা, চাপিয়ে দেওয়া ধর্মীয় অভিঘাত, মুসলমান মেয়েদের তালাক প্রসঙ্গ, বোরখা জাতীয় পোশাক ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বিংশ শতকের আট ও নয়ের দশকের কথাকার আফসার আমেদ অন্যতম। ভেতর থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র আফসার জন্মেছিলেন ১৯৫৯ সালে হাওড়া জেলার কড়িয়া গ্রামে। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হওয়ায় খুব কাছ থেকে

দেখেছিলেন সেই মানুষগুলোকে একেবারে ভেতর থেকে দেখা। ফলে প্রামাণিকতা সত্যে ও আখ্যানশিল্পের সজীবতায় তিনি দ্রুত পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিলেন। কোনরকম ধর্মীয় গোঁড়ামী বা কুসংস্কার তাঁর রচনায় আমরা পাই না। আমরা তাঁর লিখিত গল্প অবলম্বনে নারীভাবনার কথা আলোচনা করব। তাঁর লেখা অসংখ্য গল্পের ভেতর থেকে নির্বাচিত করে নিয়েছি এমন কিছু গল্পকে যেখানে মেয়েদের কথা দৃপ্তভঙ্গীতে তিনি বলেছেন।

আমাদের আলোচ্য প্রথম গল্প ‘দুই নারী’। প্রথমজনের নাম নাসিরা চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবন তার। এখন বয়স বত্রিশ–তেত্রিশ। তার স্বামী মৌলানা যার বয়স বর্তমানে পঞ্চাশ। ‘বেশ জাঁকালো ও সুন্দর শরীর স্বাস্থ্য তার। চমৎকার পরিণত ও গম্ভীর।’ এই মৌলানার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর নাসিরা সংসারে আসে। প্রথম পক্ষের দুই সন্তানকে বিয়ের পর থেকেই ভাল করার দায়িত্ব এসে পড়ে তার কাঁধে। ইমরান ও ইরফান নিজের সন্তান মনে করে সে। এই সংসারে সে ‘মেয়ে মানুষ’ হয়েই কাল কাটিয়ে দেয়। গল্পকার নারী অবস্থানকে বোঝাতে বলেছেন – 'নিজে সজাগতার মৃদুতার ভেতর ভাবনা নাড়াচাড়া করেছে, কিন্তু তার বুদ্ধি ও ফুর্তি নিজেই গড়েনি। গড়বে কী করে, একেবারে সে মেয়ে মানুষ হয়েই এ সংখ্যায় কাল কাটিয়ে আসছে।'[২] মৌলানার জুতোর ব্যবসা। দুই ছেলে জুতা বিক্রি করে বাবা সামলান।

বাড়ির বাইরে যাওয়ার তার অধিকার নেই। মৌলানার নিষেধ আছে। তীব্র নজর রাখে বিবির উপর মৌলানা। যদিও নাসিরা বের হয়, বোরখা তার সঙ্গী হয়। তবুও বহু মানুষের ভেতর থেকে মৌলানার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার দেওয়া যায় না। গল্পটি ১৯৯২–এ প্রকাশিত হয়। বিংশ শতকের শেষে মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থানটি কেমন ছিল তা চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই গল্পে।

এই গল্পে আর এক নারী হলো মৌলানার দূর সম্পর্কের চাচী। চাচী বয়স্কা ও বিধবা। তিনকুলে তার কেউ নেই। এই চাচী তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। দুজনের মধ্যে সুখ-দুঃখের নানা কথা হয়। গল্পকার যখন বলেন – ‘দুজনের মধ্যে বয়সের তফাত

যথেষ্ট হলেও দুজনেই এক্ষেত্রে নারী'[৩] – তাই দুজনের মধ্যে এত ভাব-সাব যে একে অন্যকে সান্ত্বনা দিয়ে বাঁচে।

বোরখা যে সব নারী স্বাভাবিক ভাবে পরে না তার প্রতি তীর্যক ইঙ্গিত গল্পে আছে। চাচী হতাশার সুরে বলে – ভাইপো মৌলানা বলে আমাকেও বোরখা পড়তে হয়। গল্পে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি লেখক বলেছেন তা হলো যতই মৌলানার নিষেধ থাক, যতই বোরখা পরতে বাধ্য হোক, তৎকালীন মেয়েরা-নাসিরা কিন্তু বাড়ির বাইরে পা রাখে। সেদিন তরমুজ কেনার জন্য মৌলানার চোখে ধুলো দেয় নাসিরা। ফিরে এসে চাচীকে যখন বর্ণনা দেয় তখন যুদ্ধ জয়ের আনন্দে তার চোখদুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় কিন্তু নারী সেই এক জায়গায় থাকে – পর্দানসীন, পুরুষের অধীন-এর বিরুদ্ধেই 'দুই নারী' গল্পের অবতারণা।

নারীকে ভোগ্যপণ্য রূপে ব্যবহার করা যেন পুরুষের একচেটিয়া অধিকার। তাতে কোনো পাপ বা গোনাহ্ নেই। আমাদের সমাজে নানা ঘটনা আমরা দেখি যেখানে নারীকে অসম্মানিত হতে হয়, ধর্ষিতা হতে হয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহবাস করতে হয়, বিয়ে করতে হয়। দুর্বল নিম্নবিত্ত, সহায় সম্বলহীন নারীদের উপর এই অত্যাচার স্বাধীনতার এত কাল পরও একটুও কমেনি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবিত ও মৃত' গল্পে দেখিয়েছেন হতভাগ্য কাদম্বিনীকে মরিয়া প্রমাণ করিতে হইল যে সে মরেনি। হত ভাগ্য নারীর কথা যুগে যুগে লেখা হচ্ছে। এই মুহূর্তে সচেতন পাঠকের মনে পড়বে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর 'নারীমেধ' গল্পের কথা। জমিদার অর্থবানদের তো সাতখুন মাপ। মধুসূদনের প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র কথা মনে আছে? ধর্মদরদি বৃদ্ধ জমিদারের পরস্ত্রী লোলুপতার কতা। নাটকের অন্তিমে যে জমিদার ভক্তপ্রসাদ নারায়নের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন –

"বাইরে ছিল সাধুরা আকার।
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।

পণ্য খাতায় জমা শূন্য
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া।”

এই ভণ্ড ভক্তপ্রসাদ তার অধীনে থাকা প্রজা হারিফের সুন্দরী স্ত্রী ফাতেমাকে হস্তগত করতে চেয়েছিল। কিল চড় বিনিময়ে জুটেছিল।

“শিক্ষাদিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া
যেমন কর্ম ফলল ধর্ম
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।”

কামকাতর, পরস্ত্রী লোলুপ, ধর্মের ধ্বজাধারীদের দ্বারা যুগে যুগে মাতৃরূপে নারীরা ধর্ষিতা হচ্ছেন। এইরকম একটি গল্প লেখেন আফসার। গল্পের নাম ‘গোনাহ’। জয়নুদ্দিন কাজীর বাড়িতে মিলাদ মহফিল বসবে। কলকাতা থেকে মৌলানা এসেছেন। চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছেন মাত্র। জয়নুদ্দিন–এর স্ত্রী ও পুত্র মালেক ও তাদের পরিচারিকা ফরিদার তাই খুব কর্মব্যস্ততা। ফরিদা রান্নাবান্না থেকে বাড়ির সব কাজ সামলায়। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অনেকেই চায়। জয়নুদ্দিনের ছেলে মালেক। যে কিনা তার মায়ের কাছ শান্ত ছেলে, মেহফিলের দিন আসরের বাইরে অন্ধকার পেঁপে গাছতলায় ফরিদাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ‘মিথুন মূর্তি’ হয়ে যায়। একদিকে মৌলানা ইসলামের কথা বলে, নামাজ-রোজা হজ-জাকাত–এর কথা বলে, অন্যদিকে নারীর প্রতি লোলুপতা তার কম নয়। আফসার চমৎকার বর্ণনায় ছদ্মবেশী ধার্মিকদের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দিয়েছেন এই গল্পে।একদিকে নারী তার দৈহিক শ্রম দিয়ে পরিবারের কাজ করে দেয় দু'মুঠো অন্নের বিনিময়, অন্যদিকে রশিদ, মালেকরা তার দেহের টানে ছুটে আসে তাকে ভোগ করার জন্য।

নারী মানে কন্যা, জায়া, জননী – সৃষ্টির কাজে সে সবসময় ব্যস্ত। ভাঙতে নয় করতে ভালোবাসে সে। স্বামী, সংসার সন্তানকে পালন করে নীরবে। নিজের

অন্ন পরিবারের মুখে তুলে ধরে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। বিনিময়ে সংসারে লাথি ঝাঁটা, অসম্মান মুখ বুজে সহ্য করে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বাঙালি পরিবারে সেই মায়েদের বোনদের কন্যাদের কথা লিখেছেন যত্ন করে। আফসার ও তাঁর গল্পে এমন এক নারীর কথা বলেন – যার নাম নমিতা। নমিতার স্বামী অবিনাশ মদখোর–মাতাল। মদখেয়ে স্ত্রী নমিতাকে পেটায় অবিনাশ।

"প্রায় প্রতিরাতেই অবিনাশ দাস মদ খেয়ে এসে ঝামেলা পাকায়। নমিতা সঙ্গে প্রতি রাত্রেই টানাহেঁচড়া দাপাদাপি চলে। গায়ে হাত দেয় নমিতার। আলফাল গালাগালি দেয়।"[৪]

এই সংসারে কদর্যতার ভেতর ও নমিতা হাসে, রীতার সঙ্গে হাসি বিনিময় করে। পরের দিন সেজেগুজে মদখোর স্বামীর সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ে স্বাভাবিকভাবে, যেন আগের দিন কিছুই হয়নি। গল্পের নাম 'কারা যেন রঙিন ঘুড়ি ওড়ায় নীল আকাশে'।

নারী শুধু সহ্য করবেনা, প্রতিবাদ করবে। সে তার মনের বিরুদ্ধে বেশিদিন চুপ করে বসে থাকবে না। স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে আসে সোহিনী সুহাসের কাছেস। এককামরার ফ্ল্যাট তবু তো শান্তি আছে। দুজনের ভালবাসায় মাখামাখি হয়ে আছে সোহিনী সুখী। স্বামীর অত্যাচারে বাড়ি ছেড়ে চলে আসার গল্প 'নীল ডুরে শাড়ি আর এলো খোঁপা'। বাবা মার আদরের পরিবার থেকে আর দশটা মেয়ের মতোই সোহিনী শ্বশুর বাড়ি যায়। কিন্তু স্বামী 'অষ্টপ্রহর তাকে গঞ্জনা দিত, মারত'।[৫] বাবা, ভাইয়ের যত্ন করতে পারত না বিয়ের পর। কিন্তু তার মন খারাপের দিন শেষ হয় সুহাসের কাছে এসে। আজ সে 'শীতের দিনে মিষ্টি রোদ্দুরের মতো।'[6] সোহিনী আজ সুহাসের ভাড়া বাড়িতে। কারণ দুজনের পরিবারে এই বিষয়টা মেনে নেয়নি। তবু তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। সাহসে ভর করে দুজনে Live in করে। নারীকে এভাবে সাহসিনী করে আঁকেন আফসার। সমাজ, সংসার, লোকলজ্জার উপরে যে ব্যক্তিগত ভালো লাগা, শুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়া

নয় – একথাই বুঝাতে চেয়েছেন গল্পকার। এটি স্বেচ্ছাচারিতা নয়, প্রতিবাদ ও উত্তরণের গল্প।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে বয়স মস্ত বড় ফ্যাক্টার। এই পার্থক্য অনেক সময় একে অপরের চাওয়া-পাওয়া ও কামনা-বাসনার মধ্যে সংকট ডেকে আনে। ফলে দাম্পত্য জীবনে চরম অশান্তি নেমে আসতে পারে – এরই গল্প 'সন্ধ্যার মেঘমালা'। শোভানের প্রথমা স্ত্রী মারা যায় দুর্ঘটনায়। নাম তার রুকসানা। তার পরে শোভান বিয়ে করে না। গল্পকার বলেন সংগ্রহ করে আফসানাকে। আফসানারও প্রথম স্বামী মারা যায় ব্লাড ক্যান্সারে। ওর বয়স বাইশ। শোভানের বয়স পঁয়তাল্লিশ। প্রায় দ্বিগুণ। ওদের সংসারে নেহা – শোভানের প্রথম পক্ষের কন্যা বর্তমান।

অসম বয়স যে আফসানার জীবনে নানা অতৃপ্তি বয়ে আনে তা জানা যায় নিহার শিক্ষক মনোদীপের প্রতি তার দুর্বলতা বা প্রেম প্রেম ভাবের জন্য। বছর পঁয়তাল্লিশ যা বোঝে না তেরোর কিশোরী তা বোঝে। চাপা অভিমানে সে গুমরাতে থাকে। ভোরে ছাদে যেতে, কিংবা সন্ধ্যায় সব ঘরের আলো জ্বেলে দিতে ইচ্ছে করে আফসানার। একথা শোভান জানে অনেক পরে। বিবাহ যা শুধু শারীরিক সম্পর্ক বা সন্তান উৎপাদনের জন্য নয়, শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে মন, সেই মনের ক্ষিদে না মিটলে মানুষ একসময় বিপথগামী হয়ে যায় – তার প্রমাণ আফসানা। একদিন তার স্বামীকে বলে বসে – ‘তোমার আছে নাকি যে বুঝবে? তুমি কিছুই বোঝনা।’ স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কথা একদিন শোভান শুনতে পায়। তা জানার পর ক্ষুব্ধ হয়। এই বিষয় আফসানা বোঝে তা সত্ত্বেও রবিবারে বাড়িতে মনোদীপকে নেমন্তন্ন করার কথা বলে স্বামীকে। এখানেই নারীর খোলোস ছেড়ে বেরিয়ে সমাজ সংসারকে উপেক্ষা করে ব্যক্তির ইচ্ছে অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যে দিয়ে নারী বিপ্লব জাগরণের ছবি এঁকেছেন গল্পকার।

মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হয়ে লেখক ঐ সমাজের নানা বিষয়কে, কুসংস্কার, অন্ধ গোঁড়ামিকে কাছ থেকে দেখেছিলেন ও দেখার পর গল্পে রূপ দেন,

বিষয়গুলিকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন শোধনের উদ্দেশ্যে। তিনি সুস্থ, রুচিশীল, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা দেখতে চান। বোরখা পরে শিক্ষিত হওয়া গেলেও আধুনিক উন্নততর সমাজে বা কর্মস্থলে তা উপযুক্ত নয় ‘এলাটিং বেলাটিং সইলো’ গল্পে লেখক তা বলতে চান। বোরখার অন্ধকার থেকে মেয়েদের বের করে আনতে চান লেখক। শুধু তাই নয় অল্প বয়সে হাসিনার বিয়ে হয়েছিল। আরিফ পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। পনের দিনের ছুটিতে কুয়েত থেকে এসে বিয়ে হয় তাদের। তারপর শ্বশুর– শাশুড়ির কাছে হাসিনাকে রেখে আরিফ চলে যায়। মাঝে মাঝে ফোন করে এছাড়া কিছু না। সদ্য বিবাহিতের মনের কষ্টের কথা কেউ জানে না। “মূক পাথর সে। তার কোন ভাষা নেই। ভাষার আশ্রয় খুঁজতে চায় না”।[৭]

নিজেকে তৈরি করে আধুনিক হয়ে সেও কুয়েতে যেতে পারে। তাই বি.পি.ও অফিসে আসে। কিন্তু বোরখা পরে। সে এই পোশাক পরেছে এটি পছন্দ করেছে বলে। এই পোশাক নিয়ে গল্পকার চমৎকার ব্যাখ্যা দেন –

“পছন্দের চেয়ে এই পোশাকের প্রতি তার বিশ্বাস তৈরি হয়েছে বলে। তার সঙ্গে একটা ধর্মবিশ্বাসও জড়িত। অনেক সময় যারা বোরখা পরে, তাদের পরতে বাধ্য হতে হয় যে তা নয়, তাদের নিজেদেরও পছন্দ।”[৮]

প্রোষিতভর্তৃকা হাসিনা ধীরে ধীরে কিভাবে নিজেকে বদলে ফেলে ও অন্য পাঁচজনের সঙ্গে খোলা মনের কথা বলে। আড়ষ্টতা কাটিয়ে সাহসিনী হয় তার কথাই গল্পকার বলেছেন। গল্পে আর একটি বিষয় চমৎকার প্রকাশিত। মুসলিম সমাজে বোরখা পরিহিতা শিক্ষিতা বধূকে টেনে আনা হল বাড়ির গন্ডীর বাইরে যেখানে স্বতস্ফূর্ত সামাজিকতার মেলবন্ধন আছে।

সন্দেহ এমন এক রোগ যার ফলে সুন্দর দাম্পত্য জীবন নষ্ট হয়ে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন হতে হয়। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বিশ্বাসের ওপর ভরসা রেখে নবদম্পতি রাজীব ও মণিদীপা পথ চলতে শুরু করে। কিন্তু সেই নবদম্পতির হৃদয়ে অবিশ্বাস জন্মে তখনই টানাপোড়েন তৈরি হয়। এই টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত নারী পরাজিত

হয়। রাজীবের হাতে মনিদীপা খুন হয়। এ গল্প তো আমাদের চিরচেনা। বিশ্বাসভঙ্গে নারীকে সর্বদা দায়ী করা হয় এ গল্প তো সে কথাই তুলে ধরে। 'সুখের অন্দর মহল' সে কারণে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। সবচেয়ে বড় কথা এটি জীবনের গল্প।

দেবর–বউদির মধুর সম্পর্ককে ছিন্ন করে যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির গল্প 'রক্ত লজ্জা'। স্বামীর কাজের জন্য শহরে চলে যাওয়ার পর ফাতেমা ও হাসান–এর শরীরি প্রেম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গল্পকার পুরুষের কাপুরুষতা দেখাচ্ছেন যখন ধরা পড়ে যাওয়ার পর হাসান কোরাণ ছুঁয়ে এই সম্পর্ককে অস্বীকার করে।

সাম্প্রতিক কালে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী নারী–পুরুষ উভয়ে যে বিবাহ বহির্ভূত উচ্ছৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত তার পরিচয় আছে 'সুধা অ্যাপার্টমেন্ট' গল্পে। লাগাম ছাড়া জীবন, অবৈধ প্রেম এই বিষয়গুলিকে গল্পে ফুটিয়েছেন গল্পকার।

সবশেষে বলব আফসার প্রকৃতই নারী মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার। এই গল্পগুলি তাঁর সমাজ বাস্তবতার পরিচায়ক।

তথ্যসূত্র :

(১) ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৬
(২) গল্প দুই নারী, আফসার আমেদ, পঞ্চাশটি শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ. ১৭৬
(৩) ঐ
(৪) কারা যেন রঙিন ঘুড়ি ওড়ায় দূর আকাশে, পৃ. ১৭২
(৫) নীল ডুরে শাড়ি আর এলো খোপা, পৃ. ৩৯৮
(৬) ঐ
(৭) এলাটিং বেলাটিং সইলো, পৃ. ৩৫২
(৮) ঐ, পৃ. ৩৫৪

প ঞ্চা ন ন ন স্ক র

আফসার আমেদের ছোটোগল্প : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে যাত্রা

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে আফসার আমেদ(১৯৫৯-২০১৮) এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। গত শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষে যখন তাঁর জন্ম, তাঁর কাকা– জ্যাঠা-পিসিরা এ-পারের বসত উঠিয়ে চলে গেছেন ও-পার বাংলায়। সেই সোঁতার টানে তাঁর বাবাও ঠিক করেছিলেন চলে যাবেন, বাদ সেধেছিলেন আফসারের মা সেখ খলিলুর। রয়ে গেলেন হাওড়ার কড়িয়া, বাইনানেই। ফলে আফসার আমেদের জীবন হাসান আজিজুল হকের- 'আগুন পাখি' হল না।

আফসার আমেদ কে নিয়ে প্রায় নিয়মিত কথা বলে গেছেন দেবেশ রায়, অমর মিত্র প্রমুখরা। দেবেশ রায় বলেছেন – "বাংলা গল্প-উপন্যাসের জগৎ প্রধানত বর্ণ হিন্দু লেখকদের রচনায় পুষ্ট হিন্দু সমাজেরই জগৎ-এ কথা বৃহদাংশে সত্য"।[১] তাঁর গল্প-উপন্যাসের এই ভুবনে মুসলিম পল্লীর ঘের-দেওয়া গড়ন, তার ভিতরকার অলিগলি, অলিগলির সঙ্গে বড়ো রাস্তার সংযোগের ভূগোল, ইমাম–বুজুর্গ-মুয়াজ্জিনদের কর্তৃত্ব বিন্যাস, দেবেশ রায়ের কথায় এসবের আখ্যান তো গ্রহান্তরের আখ্যান এবং আফসার আমেদ সেই গ্রহান্তরের আখ্যানকার। তাঁর সম্পর্কে হিন্দোল ভট্টাচার্য বলেছেন- "আফসার আমেদ ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই সেই নিখোঁজ মানুষটি, যিনি এক আধুনিক রূপকথার মতোই আমাদের এই বাংলা সাহিত্যে এনে দিয়েছিলেন নিম্নবর্গ ও মুসলিম সমাজের ভাষ্য, তাদের জীবন যন্ত্রণা, কাহিনি ও সমাজের অন্দরমহলের কথা"।[২] তিনি নিজেও কবুল করেছেন সে কথা- "জন্মগতভাবে আমি মুসলমান। আমি মুসলমান সমাজেই বড় হয়েছি। অনিবার্যভাবে আমার লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে মুসলমান জীবন।.... মুসলমান সমাজ আমার লেখায় এসেছে 'মানবিক' অন্তর্মূল সন্ধানের দিক থেকে"।[৩] আফসার আমেদ শিকড়ের গহন থেকে গহনতরের সন্ধানে ক্রমশ বাঁধা রেখেছেন তাঁর যাবতীয় আখ্যান আবাদ। সূচনা থেকেই সক্ষম হয়েছিলেন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্মাণে, আর গল্প বলার এই বিশেষ মাধ্যমটি লেখক পরিকল্পিতভাবেই নির্বাচন করেছেন। যার সঙ্গে মিশে আছে মুসলমান সমাজ-শরীর, অখণ্ড সমাজ সত্তা, যা মুসলিম বিশ্বের এক অন্বয় খুঁজতে সাহায্য করেছে।

আফসার আমেদের জীবনের অজস্র ঘটনা - উপাদান থাকলেও জীবনের ইতিবৃত্ত কোথাও লেখেননি। গল্প - উপন্যাসই লিখবেন তা কাঁচা বয়সেই স্থির করে

নিয়েছিলেন। কালি ও কলম নিয়েই কাটিয়ে দেবেন সারাটা জীবন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন- "আর কিছু পারি না বলে গল্প লিখতে শুরু করলাম।.... গল্প বা উপন্যাস লেখার ভেতর দিয়ে আমি কিছু বলতে চাই বলেই এই কলমচিগিরি। এখন কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেওয়ার উপান্তে পৌঁছে লেখাকে অবলম্বন করে শেষ জীবনটা নির্বাহ করতে চাই। কেননা বলার অনেক কিছু বাকি আছে, অধরা থেকে গেছে অনেক কিছু। নতুন আঙ্গিকের চর্চা করা যেতে পারে। আমার কলম সেভাবে লিখিয়ে নেবে"।[৪] আর এই স্থির আভিপ্রায়ে ১৯৮১ সালে পত্রিকায় এবং পরের বছরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'ঘরগেরস্তি' থেকে ২০১৪ সালে প্রকাশ পাওয়া যে ত্রিরিশ-বত্রিশটি উপন্যাস এবং ২০১৬ অবধি 'দাঁতের ব্যথার চেয়ে বেশি শুশ্রুষা' পর্যন্ত যে শ-তিনেক ছোটোগল্প লিখেছেন সেখানে আফসার আমেদের আখ্যান অবদানের প্রধান কথা হল তাঁর গল্প বলার কেরামতি। কখনও তিনি সত্য এবং মিথ্যার একটি পাক তৈরি করেছেন, কখনও তৈরি হয়েছে মিথ্যারই এক গূঢ় বয়নশৃঙ্খলা, ঘটনা-চরিত্র ক্রমশ ভূমিকা হয়ে উঠবে, অথবা একটি চরিত্র অনেকগুলি চরিত্রের সঙ্গে ক্রমশ বদলে নেবে এবং অবশেষে গাঢ় আলস্যে পড়ে থাকবে এক কথাকুণ্ডলী। প্রতিটা গল্পই একে অপরের থেকে আলাদা। তাঁর লেখা অজস্র ছোটোগল্পের মধ্যে কয়েকটি হল- 'পক্ষীরাজের ডানা', 'জিন্নতবেগমের বিরহমিলন', 'হাড়', 'আদিম', 'নোঙর', 'অর্থহীন কথা বলার নির্ভরতা', 'জনস্রোত জলস্রোত', 'সুখ অসুখ', 'একটি গিটার', 'এলাটিং বেলাটিং সইলো', 'নষ্ট দুপুর', 'অভিসার', 'সন্ধ্যার মেঘমালা', উপন্যাসও লিখেছেন- 'সানু আলির নিজের জমি', 'স্বপ্নসম্ভাষ', 'খণ্ড বিখণ্ড', 'আত্মপরিচয়', 'ধানজ্যোৎস্না', 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা', 'অশ্রুমঙ্গল', 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' ইত্যাদি তাঁর লেখা উপন্যাস।

প্রথম জীবনে কবিতা দিয়ে শুরু করলেও অচিরেই গদ্য লিখতে শুরু করেন। মূলত তিনি লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক। তাঁর লেখা গল্পগুলো 'সারস্বত', 'বারোমাস', 'কালান্তর', 'পরিচয়' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। 'বাঙালি মুসলমানের বিয়ের গান' বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে ব্যাপক পরিচিতি ঘটায়। অভিন্ন বাঙালি জাতিসত্তার মানস, সংস্কৃতি, ভাষা ঐতিহ্যের সগোত্র যাত্রাপথকে নির্দেশ করে বইটিতে সমাজ আলেখ্যর অভিমুখ যে যে সত্য ব্যক্ত করেছে, জীবনাকাঙ্ক্ষার আকুলতা, বাসনা উন্মুল করেছে, সমাজবেত্তাদের কাছে তা প্রামাণিক হয়ে উঠেছে। তিনি ছিলেন 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' যিনি বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মুসলিম

সমাজের ভাষ্য, জীবন যন্ত্রণা, কাহিনি ও সমাজের অন্দরমহলের রূপসজ্জাকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর কথন সোজাসাপ্টা, ন্যারেটিভ নয়। মূলত, বাস্তবের এক পরাবাস্তবিক রূপের মধ্যেই তিনি বাস্তবের কঠিন কাঠামোগুলিকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে, 'ঘরগেরস্তি', 'দ্বিতীয় বিবি', 'ধানজ্যোৎস্না' উপন্যাসে আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এনেছিলেন বলা যায়। তাঁর ছোটোগল্পেও ঘটনার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ক্যানভাস তৈরি হয়েছে, তা যেন গল্পগুলির মধ্যে অন্য এক বৃত্তান্ত ফুটে ওঠে, পাঠককে চলে যেতে হয় তার পাঠক্রিয়ার মধ্যে। পাশাপাশি উঠে আসে আরেকধরনের কাহিনি। 'শুধুমাত্র মৃত্যু অপেক্ষায় যাওয়া', 'গোনাই', 'জিন্নতবেগমের বিরহ মিলন', 'একটি গিটার', 'সন্ধ্যার মেঘমালা', 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' প্রভৃতি ছোটোগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে কথন–এর ধারা বদলে দিয়েছিল।

'একটি গিটার' গল্পে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় চেতনা ও চর্চার দ্বারা প্রগতিশীল এক মুসলিম পরিবারের অন্দরমহলের কথা ফুটে উঠেছে। পরিবারের উচ্চশিক্ষিত মেয়ে নেহা পরিবারকে উপেক্ষা করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এক যুবককে বিয়ে করে। তার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল তার ভাই আবিদ। 'প্রেমের আবার হিন্দু-মুসলমান কী?'[৫] দিদির স্বাধীন সিদ্ধান্তের পাশাপাশি পরিবারের আবেগও তার কাছে সমান মূল্যবান। তাই পরিবারের শোকার্ত মানুষগুলির জীবনে ছন্দ ফিরিয়ে আনতে আশ্রয় নেয় প্রিয় স্প্যানিশ গিটারের কাছে। তার সুরের মূর্ছনায় সকলেই ফিরে পায় জীবনের ছন্দ – "গিটার হাতে কৃষ্ণচূড়া ফুল ছোঁয় আবিদ।.... আর বাজায় একটা সুর। দাদির চোখে আনন্দ ফুটে ওঠে"।[৬] ধর্মীয় পরিচয়ের গণ্ডীকে অতিক্রম করে মানুষের পরিচয়ে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

আফসার আমেদের অন্যতম গল্প 'শুধুমাত্র মৃত্যু অপেক্ষায় যাওয়া'। চরিত্র, পরিবেশ সাদামাটা, এক যুবককে এস.এস.কে.এম হাসপাতালে রাত কাটাতে হবে যে ব্যক্তির সঙ্গে তাকে সে চেনে না। গল্পের যুবকের নাম সুহাস মাইতি। সে কলকাতার মেসে টিউশন করে জীবন চালায়। শীত রাত, সম্পর্কহীনতা, জনৈক অগ্নিদগ্ধা মহিলার মৃত্যুর খবর পাওয়ার অপেক্ষা তাকে যেন এক আবেশে জড়িয়ে রাখে। এই গল্পে চরিত্রের মানসিক অন্তর্লীনতা আমাদের আবিষ্ট রাখে, বিশ্বাস – অবিশ্বাসের সীমারেখা কখন অতিক্রান্ত হয়, সচেতন পাঠক ও তা খেয়াল করেন না। আফসার আমেদের সফলতা বোধহয় এখানেই।

আফসার আমেদ কোনও নির্ধারিত নীতি ও তত্ত্বের বাঁধনকে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "গল্প লেখার ক্রাফট বা

লেখার কৌশল আমাকে ধরেনি, আমি নিজেই লিখতে লিখতে তৈরি করেছি। তিনশোটি গল্প লিখেছি, একটা আর – একটার মতো নয়”।[৭]

'সমুদ্রের নিলয়' গল্পে আঠারো বছরের আলেয়া আর পঞ্চাশোর্ধ গহর আলির দাম্পত্য জীবনের এক বিচিত্র কাহিনি এখানে উপস্থাপিত। বহুবিবাহ, অসম বিবাহ, পুরুষতন্ত্রের দাপট, লোভ, যৌনতা, হিংস্রতা ইত্যাদি সংকেতের তীব্রতায় উদ্ভাসিত। আফসার আমেদ বহতা সময়ের কথাকার তাই বর্তমানের কদর্যতা ও বিভিন্ন সংকট তাঁর রচনাকে অবলম্বন করে আবির্ভূত। বর্তমান সমস্যা – জর্জরিত বিশ্বের বিচিত্র বিষয় তাঁর গল্পের পট হিসেবে এসে পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই। তাঁর কথার স্রোত বর্তমান সময়কে ঘিরেই আবর্তিত ও বিবর্তিত, যার ফলশ্রুতি বিশ্বায়নের বেনোজল। আলোচ্য 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' গল্পে বিশ্বায়নের প্রভাবে সংঘটিত এক মুসলিম সমাজের পুরুষদের দ্বারা চালিত ধর্মীয় পোশাকে মোড়া হাসিনার মানবীতে উত্তরণের কাহিনি বর্ণিত। কালো বোরখার আড়ালে ঢাকা উনিশ বছরের হাসিনাকে বিপিও কেন্দ্রে আসতে দেখে কর্মীদের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়। তবে প্রথম ক্লাসে গিয়ে তার ধর্মীয় আবরণে মোড়া মানবীসত্তা উপলব্ধি করতে পারে জীবনের মানে- “হাসিনা চোখের দৃষ্টি শুধু খুলে রেখে বোরখায় বন্দী হয়ে বসে থাকে। গা কেমন শির শির করে। অদ্ভুত সম্ভ্রম-জাগানো তাদের ব্যস্তভঙ্গি। সোহম ও সুলগ্না তাদের শেখাচ্ছে। নিকটপ্রাণতা তা একভাবে হাসিনাকে আলোড়িত করল। বুঝতে পারল, বাঁচার সবকিছু এদের মধ্যে আছে”।[৮] কেউ তাকে বদলানোর কথা বলেনি। একসময় পরিস্থিতির দ্বারা সে নিজেই নিজেকে বদলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শেখে।

নতুন কিছু শেখার আনন্দ হাসিনা সকলের সঙ্গে ভাগ করতে চাইলেও অন্তরায় হয় বোরখা। নিজেকে উন্মুক্ত করার বাসনা জাগে। তানিয়াদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচরিতায় জানা যায় সে চুলে কন্ডিশনার লাগায়। জানা যায় তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বপ্নের কথা। তার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে, তানিয়ার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে 'তারা দুজনের হাত ধরে কিছুক্ষন এলেটিং বেলেটিং খেলেছে'।[৯] এইভাবে নিজেকে আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই হাসিনার মনের রূপান্তর ঘটতে থাকে। পরিবর্তনের ছোঁয়া তাকে কেবল বাহ্যিকভাবে নয়, মননের গভীরে প্রবেশ করে তার সুপ্ত স্বাধীনসত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে। উপযুক্ত পরিবেশে সে তার প্রকৃত সত্তার উন্মোচন ঘটিয়েছে। ঘটেছে তার চরিত্রের রূপান্তর। জীবনের রূপ-রস-গন্ধ উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে বাঁচার মানে সে খুঁজে পায়। সেই আনন্দের অনুভূতির তীব্রতার কাছে

বোরখাও তুচ্ছ হয়ে যায়- “সেদিন ক্লাস শেষ হতে বেশ কিছুটা দেরি হয়েছিল। আর ফিরে যাওয়ার সময় হাসিনা বোরখাটা নিয়ে যেতে ভুলে গেল”।[১০]

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার আলো-বাতাস গ্রামকেও স্পর্শ করেছে তীব্রভাবে। দূরদর্শন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফেসবুক শব্দগুলো গ্রামের মাটিকেও কামড়ে ধরেছে। বিশ্ব আজ সকলের হাতের মুঠোয় বন্দী। ফলে গ্রামীণ সভ্যতা এখন আর পিছিয়ে নেই। প্রত্যেকের হাতে এখন স্মার্ট ফোন। আফসার আমেদের চোখে এই বিষয়গুলি এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাঁর ‘সন্ধ্যার মেঘমালা’ গল্পে মাতৃহারা নেহা পিতার দ্বিতীয়পক্ষ আফসানার প্রতিপক্ষ নয়, তার সই- “নতুন মাকে ‘সই’ বলে নেহা। দারুণ বন্ধুত্ব ওদের”।[১১] সম্পর্কের রসায়ন বদলে যাচ্ছে। এই বদল কেবল আফসানার সঙ্গেই নয়, পিতা-কন্যার বাক্যালাপেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। পার্থিব সুখের উপকরণ আফসানার থাকলেও নেই মনের খোরাক। স্বামী হিসেবে শোভান তা দিতে ব্যর্থ। কিন্তু আফসানা বিশ্বায়নের যুগে লালিত-পালিত হওয়া নারী। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুসলিম নারী নিজের মনের চাহিদাকে গুরুত্ব দিতে শিখেছে। নির্বোধ শোভান আফসানার মনের দরজায় পৌঁছাতে ব্যর্থ। খুব সহজভাবেই আবদার রেখেছিল মনোদীপকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর, কিন্তু শোভান তাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা বললে আফসানা নেহার ক্ষতির কথা ভাবে। কিন্তু যখন আফসানার চরিত্রের দিকে খারাপ ইঙ্গিত করে তখন গর্জে ওঠে “তোমার বোধ আছে যে বুঝবে ? তুমি কিছুই বোঝো না”।[১২] নারীর মনকে উপলদ্ধি করার মানসিকতা শোভানের মতো পুরুষদের আজও তৈরি হয়নি। আফসানার এই হতাশাবোধ তার একার নয়, বর্তমান সমাজ পরিবেশে অনেক নারীর হৃদয়ের হাহাকার। এই যুগ যন্ত্রণা আজ গোটা বিশ্বের যন্ত্রণা।

আফসার আমেদ এভাবেই তাঁর গল্পভুবন নির্মাণ করে চলেছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের একান্ত নিজস্ব সংকট, অনন্বয়, শূন্যতা, কূটাভাস তাঁর গল্পবীক্ষার প্রধান অবলম্বন। তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল বাঙালি মুসলমানের আত্মিক ভুবন আবিষ্কার ও তাকে শিল্পের পদবী দান। আধুনিক বিশ্বে যা যা উদ্ভাবন হচ্ছে এবং যে বিষয়গুলোকে ঘিরে মানুষ সমস্যা জর্জরিত তাঁর গল্পে সেই বিষয়গুলিও বেশি করে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর গল্পের নামকরণ, চরিত্র চিত্রণ, বিষয় ভাবনা, তাদের জীবনাচরণ ও মুখের ভাষা চলমান সময়ের ধারক ও বাহক, যা পাঠককে প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট করে চলেছে। তাঁর গল্পে বিশ্বায়নের বান ডেকেছে। তাঁর কল্পনার বিষয়ও যেন বাস্তবের রূঢ়তায় মিশে একাকার হয়ে যায়। আফসার আমেদ এভাবেই তাঁর গল্পকে ভাঙেন

ও গড়েন। আমরা পাঠক বিস্ময়াভিভূত হয়ে কেবল চেয়ে থাকি। শিল্পীর সার্থকতা বোধহয় এখানেই।

তথ্যসূত্র:

১. দৈনিক এইসময় (সম্পাদকীয়), রবিবার, ১২ আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৮
২. Bengali indian express.Com
৩. দৈনিক এইসময় (সম্পাদকীয়), রবিবার ১২ আগষ্ট ২০১৮, পৃ. ৮
৪. 'গল্পের ভুবন', আফসার আমেদ, সাক্ষাৎকার, অঘ্রাণ ১৪২৩
৫. আফসার আমেদ, 'একটি গিটার', 'আফসার আমেদ সেরা ৫০টি গল্প', পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ পাব্, ২০১৭, পৃ. ২৯৬
৬. তদেব, পৃ. ২৯৯
৭. 'গল্পের ভুবন', আফসার আমেদ, সাক্ষাৎকার, অঘ্রাণ ১৪২৩
৮. আফসার আমেদ, 'এলাটিং বেলাটিং সই লো', 'আফসার আমেদ সেরা ৫০টি গল্প', পুনর্মুদ্রন, কলকাতা, দে'জ পাব্, ২০১৭, পৃ. ৩৫৫
৯. তদেব, পৃ. ৩৫৯
১০. তদেব, পৃ. ৩৬০
১১. আফসার আমেদ, 'সন্ধ্যার মেঘমালা', 'আফসার আমেদ সেরা ৫০টি গল্প', পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ পাব্, ২০১৭, পৃ. ৩৪৩
১২. তদেব, পৃ. ৩৪৫

আকরগ্রন্থ:

১. আফসার আমেদ, 'আফসার আমেদ সেরা ৫০টি গল্প', পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ পাব্, ২০১৭

সহায়কগ্রন্থ:

১. লায়েক আলি খান, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সাহিত্যলোক, ২০০০
২. পরমেশ আচার্য, 'ছোটোগল্পে মুসলমান সমাজঃ সমীক্ষা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০০১
৩. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা.), 'বিশ্বায়ন ও বাংলাসাহিত্য', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষৎ, ২০১৬s

সহায়কপত্রিকা ঃ

১. রবিন পাল, বিশ্বায়ন ও বাংলা গল্প উপন্যাস', পরিকথা ডিসেম্বর ২০১৫
২. দৈনিক এইসময়, ১২ অগস্ট ২০১৮

সু বো ধ ম ণ্ড ল

প্রেমে অপ্রেমে আফসার আমেদের গল্প

বাংলা সাহিত্যের এক 'অন্য রকমের'[১] গল্পকার আফসার আমেদ। আফসার আমেদ বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে, তবে বাংলা গল্পের ধারায় তাঁর লেখা গল্পগুলো এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মুসলমান সমাজের সমস্যা-সংকটকে তিনি ভাষারূপ দেন। বিশেষত মুসলমান নারী সমাজের অন্দরের কথা শোনা যায় আফসার আমেদের লেখালেখির মধ্যে। তবে অল্প দিনের মধ্যে সম্প্রদায়ের গণ্ডী পেরিয়ে তিনি সামগ্রিকভাবে মানব সমাজের সমস্যা-সংকটকে তাঁর সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন। সাধারণত নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত জীবনকেই তিনি দেখতে চেয়েছেন। তবে যে জীবনকে তিনি তাঁর সাহিত্যের বিষয় করেছেন, যে জীবনকে তিনি দেখতে চেয়েছেন, তাকে সামগ্রিকভাবে তিনি দেখতে চেয়েছেন এবং পাঠককে সেভাবে দেখাতেও চেয়েছেন। আফসার আমেদের গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সোহারাব হোসেন বলেছেন—

"গল্পকার আফসার আমেদের স্বরুপ-স্বভাব-স্বকীয়তার আলোচনার আগে ওই বিশিষ্টতার ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা দরকার। বাংলা গল্প ষাটের দশকে এসে স্পষ্টত দুটি ধারায় ভাগ হয়ে যায়। একদিকে ছিল নরনারীর দেহ, দেহজ প্রেম-কামনা, দেহকেন্দ্রিক আলপনা কল্পনা, প্রেম-রোমান্স-রোমান্টিকতার চৌষট্টি কলাবিদ্যার পরতের উন্মোচন। এসবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল সাহিত্যকে বিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করে, সাহিত্যের নির্দিষ্ট বাজার গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে। অন্যদিকে ছোটগল্পের আর একটি ধারা অবস্থান করছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। এই ধারার অবলম্বন হল পূর্ণাঙ্গ মানব দেহ—মানুষের মন, মনন, লড়াই, আপস, প্রবৃত্তি, সমাজ, আন্দোলন সমেত সম্পূর্ণ মানুষের আত্মার উন্মেষণাতে এই ধারা বিশিষ্ট হল। এঁরা গল্পের নতুন আস্তানা নির্মাণ করলেন। এই আস্তানার পরিকাঠামো ও চালচিত্র গড়ে

উঠল সততা, মুক্তি, জীবনের পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতা, মানুষের চিন্তার নতুন বিন্যাস, শিল্পের ও সমাজের সত্যমূর্তি দেখার অভ্যাস ও সাহসে।—এই ধারা বাংলা গল্পের আসরে নতুন পথের ইশারা ছিল। মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, বিমল কর, অসীম রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিয়দংশে সমরেশ বসু প্রমুখ এই ভিন্নমাত্রায় সাহিত্যধারাকে পুষ্ট করলেন। ষাটের পর সত্তর এসে এই ধারাটি বলবান হল—বিবর্তিত হল। সত্তরের লেখকরা জীবনের ও জগতের মুখোশকে খুললেন, ভাঙলেন এবং সেই ভাঙা-ছেঁড়া মুখোশের মধ্য দিয়ে মানুষের সত্য মুখটিকে মূর্ত করলেন। সত্তরের লেখকরা নির্মাণ করলেন ভূমিপুত্র মানুষের মুখকে—মানুষের লড়াই করা, লাঞ্ছিত হওয়া, গুলি খাওয়া, মাটিতে লোটানো, মাটি থেকে উঠে দাঁড়ানো, বাঁকাচোরা, চোয়াড়ে চোয়াড়ে এবং সত্য মানুষের মুখকে। এই ধারায় উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যের ছবি রাখলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, উদয়ন ঘোষ, অভিজৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র, কিন্নর রায়, রক্তিম ইসলাম প্রমুখ। আফসার আমেদ এই ধারার সার্থক উত্তরসূরি।”[২]

আফসার আমেদের সাহিত্যচর্চা শুরু **১৯৮২** সালে ‘ঘরগেরস্তি’ উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। এরপর ‘বসবাস’, ‘সানু আলির নিজের জমি’, ‘আত্মপরিচয়’, ‘স্বপ্ন সম্ভাষ’, ‘খণ্ডবিখণ্ড’, অন্তঃপুর’, ‘ধানজ্যোৎস্না’, ‘সঙ্গ নিঃসঙ্গ’, ‘ব্যথা খুঁজে আনা’, ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা’, ‘কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক’, ‘দ্বিতীয় বিবি’, ‘এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা’, ‘অলৌকিক দিন রাত’ ‘খোঁজ’, ‘অশ্রুমঙ্গল’, ‘জীবন জুড়ে প্রহর’, ‘মেটিয়া ব্রুজের কিস্‌সা’, ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’, ‘হিরে ভিখারিনী ও সুন্দরী রমণী কিস্‌সা’—প্রভৃতি প্রায় ত্রিশটি উপন্যাস লিখেছেন, লিখেছেন তিন শতাধিক গল্প। ‘আফসার আমেদের ছোটগল্প’, ‘প্রেমে অপ্রেমে একটি বছর’, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’— প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তাঁর গল্পগুলি। সাহিত্যচর্চার জন্য বিভিন্ন সময়ে বহু পুরষ্কারে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। ‘হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা’

উপন্যাসের জন্য ‘বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার’, ‘আত্মপরিচয়’ উপন্যাসের জন্য ‘সোপান’ পুরস্কার, উর্দু ভাষায় লেখা ‘সাড়ে তিন হাত ভূমি’ উপন্যাসের অনুবাদ করে পেয়েছেন ‘সাহিত্য আকাদেমি’ পুরস্কার, ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসের জন্য ‘সাহিত্য আকাদেমি’ পুরস্কার ও গল্প লেখার জন্য পেয়েছেন ‘সোমেন চন্দ পুরস্কার’।

উপন্যাস সাহিত্যে আফসার আমেদের প্রতিভা বিশেষ প্রচারিত ও জনপ্রিয় হলেও বাংলা সাহিত্যের গল্পের জগতে তার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যাবে না। সময়ের দাবী মেনে তিনি মানুষের আনন্দ-বেদনা-দুঃখকে ভাষারূপ দিয়েছেন। আফসার আমেদের গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে একুশ শতাব্দীর মানব-মানবীর প্রেম। বিশ্বায়ন পরবর্তী বিশ্বের মানব-মানবীর প্রেমকে আফসার আমেদ একেবারে নির্মোহ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন। বিশ্বায়ণ পরবর্তী ‘একলা ঘরের দেশে’র মানুষরা ‘একলা থাকার অভ্যেস’ করে নিয়েছে। বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদেরকে গণ্ডিবদ্ধ করেছে স্বনিয়ন্ত্রিত পরিসরে। ব্যস্ততম পৃথিবীর যান্ত্রিক মানুষদের ভালোলাগা, ভালোবাসা, প্রেম-প্রণয়-বিরহের চরিত্র গেছে পাল্টে। আধুনিক বিশ্বের অত্যাধুনিক মানুষদের মনস্তত্বের জটিল স্তরগুলিকে একটু একটু করে উন্মোচন করার মাধ্যমে মূল বিন্দুতে পৌঁছতে চেয়েছেন আফসার আমেদ। তাই তাঁর গল্পে প্রেমের এক স্বতন্ত্র চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

আফসার আমেদ তাঁর গল্পে নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের নানাবিধ সমস্যাকে ভাষারূপ দিয়েছেন। বিশেষত মানুষের হৃদয় সম্পর্কের জটিলতা, গার্হস্থ্য জীবনের সমস্যা ও সংকটকে তিনি তুলে ধরেছেন গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে। বিশ্বায়নপরবর্তী সময়ের ব্যস্ততম মানুষের হৃদয়ের অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন তিনি নিজের মতো করে। আধুনিক সভ্যতার অত্যাধুনিক মানুষের হৃদয়ের জটিলতা, অমানবিকতা, অবসাদ, বিষণ্ণতাকে অনুসন্ধান করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিতে। মানুষের হৃদয় সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের জটিলতা, প্রেম, বিরহ, বিষণ্ণতা, ভালোবাসার জটিলতাকে সময়ের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ কারণে তাঁর সাহিত্যের

একটা বড় অংশ জুড়ে মানুষের ভাঙ-গড়া সংসার জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। দেখা যায় নর-নারীর প্রেম-বিরহের নানাবিধ চিত্র। প্রেমে-অপ্রেমে তাঁর গল্পের জগৎ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

আফসার আমেদ 'বিরহ' গল্পে সইফু নামের এক হতদরিদ্র মানুষের অভিনব জীবন কাহিনি তুলে ধরেছেন। সইফু এলাকায় এলাকায় গিয়ে ঝালাইয়ের কাজ করে। ঝালাইয়ের কাজ করতে সে আমতা থেকে সুদূর বীরভূমে চলে যায়। এরপর সেখান থেকে রামপুরহাট। রামপুরহাটে গিয়ে পাথরের লরিতে কাজ করে পয়সা কামাতে থাকে এবং সে পয়সায় সাট্টা খেলা শুরু করে সইফু। এভাবে সেখানে প্রায় পাঁচ বছর থাকতে থাকতে স্ত্রী বদরনকে ভুলে যায় সইফু। গ্রামে গুজব রটে যায় বাংলাদেশে গিয়ে মারা গেছে সে। আর তাই তার স্ত্রীকে আবার বিয়ের ব্যবস্থা করে তার শ্বশুরেরা। সইফু গ্রামে এসে জানতে পারে তার স্ত্রীকে আবার বিয়ে দিয়েছে বিপত্নীক হানিফের সঙ্গে। 'সইফু বদরনকে তার বউ হিসেবেই রেখে গিয়েছিল। তারপর বদরন অন্যের বউ হয়ে যায় কি উপায়ে? আসলে বদরন ন্যায্যত এখনো তার বউ। কিন্তু বদরন তার ঘরে নেই। তার অপেক্ষায় নেই। সইফুর কাছ থেকে সে মন ফিরিয়ে নিয়েছে। ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে যায় সইফু'[৩]। সে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে স্ত্রী বদরনকে। আজব চরিত্রের মানুষ এই সইফু। সে ভাবে তার নিজের বউ বদরন যদি অন্য কারোর বউ হয়ে যায় তবে তো তার কিছু করার নেই। অসহায় হয়ে সে ঠিক করে নেয়, 'পাঁচ বছর যখন বদরনকে ছেড়েছিল, সারা জীবনই বদরনকে ছেড়ে থাকবে'[৪]। পাঁচ বছর পর নিজের বাসভূমিতে ফিরে সে লক্ষ্য করে নিজের জন্মভূমির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। আর জন্মভূমির বদলের যাওয়ার সঙ্গে সে তুলনা করে স্ত্রী বদরনের পরিচয় বদলে যাওয়াকে। আপনভোলা এই মানুষটি তার জন্মভূমির পরিবর্তন বদলে যাওয়াকে লক্ষ্য করে মেনে নিতে থাকে বদরনের পরিচয়ের বদলে যাওয়াকে—

"বদরন তার আর বউ নয়। সইফুর হঠাৎই মনে হয়। এই প্রেক্ষিতে সেটা না একটা কেউ কারো বউ হয়েই থাকে। বদরন কারো বউ। পাঁচ বছর বদরনকে ছেড়ে থেকে, পাঁচ বছর পরে ফিরে এসে একইভাবে বদরনকে দেখবে তা হয় না। বদরনের অবস্থান বদলে যেতে বাধ্য। যেমন রকম আমতা শহর বদলে গেছে। এই বদলের মধ্যেই নিজেকে সঁপে দিচ্ছিল সইফু। মেনে নিচ্ছিল বদরনের অপ্রাপ্তিকে। এটা একটা অভাববোধ ছাড়া কিছু নয়।"[৫]

এখানে আফসার আমেদ উদাসীন সইফুর পরিবার ও সংসারের প্রতি দ্বায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও তার ফলস্বরূপ তার সংসার ভেঙে যাওয়ার এক ট্র্যাজিক পরিণতিকে দেখাতে চেয়েছেন গল্পকার। অবশ্য এ পরিণতির জন্য সইফুর বিশেষ আক্ষেপ নেই। পেটের দায়ে দীর্ঘদিন স্ত্রীকে ছেড়ে থাকতে থাকতে স্ত্রীর প্রতি তার আবেগ, উন্মাদনা কেটে গেছে। স্ত্রীর প্রতি তার প্রেম-ভালোবাসা-মোহ আর বিশেষ নেই। জীবনের কঠিন পথ চলতে চলতে সে জীবনের বাস্তবতাকে চোখে দেখেছে, সব অবস্থাকে মানিয়ে নিতে শিখেছে। বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি মানুষের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করে, মানুষের মনকে কিভাবে ভাঙা-গড়া করে তার এক নির্মম ও নির্মোহ বিশ্লেষণে নির্মাণ করেছেন সইফু চরিত্রকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে প্রেমের পরিবর্তে অভ্যাসের দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন এখানে। দাম্পত্য সম্পর্ককে আবেগের পরিবর্তে কঠিন বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন তিনি। তাই গল্পের শেষে দেখা যায় সইফুর বউ বদরনকে হানিফ বিয়ে করার পরও সইফু নির্লিপ্তভাবে বলতে পারে, 'কোনো আবেগ নয়, দেখা করলে দেখা করা যায়। না দেখা করলে কি ক্ষতি হয় সে জানে না'[৬]। বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উদাসীন, আপনভোলা সইফুকে কেন্দ্র করে প্রেম-অপ্রেমের এক ট্র্যাজিক কাহিনীকে গল্পের পরিসরে ধরতে চেয়েছেন গল্পকার।

'সমুদ্র নিলয়' গল্পে বিচিত্র এক সংসার জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। আঠারো বছরের আলেয়া আর পঞ্চাশোর্ধ গহর আলির দাম্পত্য জীবনের এক বিচিত্র কাহিনি

এখানে উপস্থাপন করেছেন। মুসলমান সমাজের বহু বিবাহ ও অসমবয়সী বিবাহের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন এক অষ্টাদশী যুবতী আলেয়ার প্রেম-বিরহকে।

বিবাহের পূর্বে আলেয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গাজির। গাজির সঙ্গে আলেয়ার ভাব থাকলেও তাদের প্রেমের গাঢ়তা ছিলনা কখনও, বরং আলেয়ার প্রতি গাজির ছিল এক শীতল উদাসীনতা। গাজি 'মেটেবরোজে' কাজ করতো। মেটেবরোজে যাওয়ার পর আলেয়াকে ভুলে যেত সে। চার ছ মাস পরে যখন সে গ্রামে ফিরত তখন মনে পড়ত আলেয়াকে। তার এই মনে পড়ার মধ্যে প্রেমের টান থাকে না। গাজি–আলেয়ার এই রকম এক প্রেম-অপ্রেমের পরিস্থিতিতে পঞ্চাশোর্ধ গহরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় আলেয়ার। গাজির উদাসীনতা আলেয়াকে গাজির প্রতি অভিমানী করে তোলে। আর এই অভিমান থেকে সে বাবার চেয়ে বেশি বয়সী গহরকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়। তার প্রতি গাজির উদাসীনতার প্রতিশোধ নিতে আলেয়া রাজি হয় গহরকে বিয়ে করতে—

"গাজি বলেছিল, তাকে সে বিয়ে করবে। গাজি তাকে আর বিয়ে করতে পারেনি। মেটেবরোজ থেকে চার-ছ মাস ভুলে থাকত। এই ফাঁকে গহরের সঙ্গে আলেয়ার বিয়ে হয়ে যায়। এবং আলেয়া মনে করে এটাই ঠিক হয়েছে। গাজির ওপর তার প্রকৃত প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।"[৭]

বিয়ের পর আলেয়া স্বামী হিসেবে বাপ বয়সী গহরকে মেনে নিলেও, পঞ্চাশোর্ধ স্বামী আঠারো বছরের আলেয়ার শরীরী কামনা বা উন্মাদনা মেটাতে পারে না। তাছাড়া স্বামীর প্রথম পক্ষ আলেয়ার 'বড়োবুবু' রাতের বেলায় আলেয়ার কাছে স্বামীকে যেতে দিলেও, দিনের বেলায় তাদের মেলামেশাকে পছন্দ করে না সে। তাছাড়া বাবার বয়সের থেকে বেশী বয়সী স্বামীর সঙ্গে দিনের বেলায় মেলেমেশা করতে এক 'অদ্ভুত জড়তা' কাজ করে তার মধ্যে। এজন্য স্বামীকে সব সময়ের জন্য পাওয়া হয় না যুবতী আলেয়ার। এসব কারণে আলেয়ার মধ্যে এক অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে; শরীরী চাহিদার অতৃপ্তি কাজ করে তার মধ্যে।

স্বামীর শরীরের স্পর্শে তাই আলেয়ার ‘বুকটা ভারী হয়ে ওঠে অনুভব করে। সকল জননীত্ব এসে তার বুকে ভর করছে। কলার কাঁদির মতো ভার হয়ে ঝুলে আছে তার স্তন দুটি। তার ভীষণ ভার। পায়ে শিশুর হাতের আঁচড়ানি, কাতরতা। বুক টন টন করে ওঠে। স্তন উসখুস করে। স্তন দুটি দুধে ভরে গেছে। টন টন করে ওঠে। শিশুটি পায়ের তলায়। বাড়ির পিছনে বড়োবুবুর গলা পাওয়া যায়। গহরের পিঠ থেকে হাত দুটি সরিয়ে নেয়। পায়ের তলায় শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। কোলে বসিয়ে শিশুকে স্তন দেয়। বুক টন টন করছে। একেবারে পেনিয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে যন্ত্রণা সারায়’[৮]। স্বামীর বয়স, স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও অন্যান্য পারিপার্শিক প্রতিবেশে আলেয়ার শরীরী চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে না। এক অপূর্ণতা সর্বদা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে। আলেয়ার এই অতৃপ্ততা ব্যাপক আকার ধারণ করে যখন আলেয়ার পূর্বপ্রণয়ী গাজী গ্রামে আসে এবং তার স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলের মেয়ে মাসুরার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। গহরকে বিয়ে করার পর ‘গহর তাকে অধিকৃত করে ফেলেছে। এখানেই আলেয়ার বেশী নিশ্চিন্ততা। তবে গাজি এলে তার ভালো লাগে। তবু তো জানাশোনা ছিল। ভাব সাব। গাজিকে দেখতে পেলে ভালোই লাগে আলেয়ার।...কিন্তু গাজির প্রতি আবেগ আকাঙ্ক্ষা তার ফুরিয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে যা, তা হল চোখের দেখা। চোখের দেখার আবেগেই আলেয়া নরম হয়ে উঠেছে বার বার। ভিজে হয়ে উঠেছে। গাজি কথা বলতে এলে বলবে না। তাকে এ ঘরে আসতেও বলবে না। সে তো গাজির কাছে তার কিছু চায় না!’[৯] কিন্তু আমরা দেখি গাজির প্রতি অভিমানবশতঃ আলেয়া গহরকে বিয়ে করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার মধ্যে তার অভিমানী হৃদয়ের আবেগ ও আঠারো বছর বয়সের হঠকারিতা যতটা ছিল, গহরের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ছিল না তার বিন্দুমাত্র। তাই শেষে দেখা যায় গাজির সঙ্গে মাসুরার সম্পর্ক গড়ে উঠলে আলেয়ার মধ্যে প্রবল ঈর্ষাবোধ জাগ্রত হয়, জেগে ওঠে পূর্বপ্রণয়ী গাজির প্রতি তার অধিকারবোধ। ঈর্ষা ও অধিকারবোধ ছাড়াও গাজির প্রতি ছিল তার অপূর্ণ প্রেম পিপাসা। আলেয়াকে প্রতিনিয়ত অবহেলা

করে ও আলেয়ার প্রতি উদাসীন থাকার ফলে গাজীর প্রতি আলেয়ার অভিমান, প্রতিশোধেচ্ছা যেমন কার্যকর হয়, তেমনি ভিতরে ভিতরে তৈরি হয় প্রচ্ছন্ন আকর্ষণবোধ ও আবেগের উন্মাদনা। গহরকে বিয়ে করে গাজিকে শাস্তি দিতে গিয়ে সে নিজেই শাস্তি পেয়েছে। গহরকে বিয়ে করে গাজিকে হারিয়ে দিতে গিয়ে সে নিজেই হেরে গেছে। গাজির প্রতি অভিমান ও প্রতিশোধেচ্ছা থেকেই পঞ্চাশোর্ধ, বাবার চেয়ে বেশি বয়সী গহরকে বিয়ে করার হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয় আলেয়া। গহরকে বিয়ে করে, তার সংসার সামলে, সন্তান প্রতিপালন করে সুখে থাকতে চায় আলেয়া; আলেয়া চেয়েছিল তাকে অবহেলা করা গাজিকে দেখাতে যে, সে তাকে ছাড়া বেশ সুখে আছে। কিন্তু যখন গাজি গ্রামে ফিরে মাসুরার সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন তার মধ্যে প্রবল ঈর্ষা জেগে ওঠে। গাজির কাছে সে হেরে যেতে থাকে। মাসুরার সঙ্গে যখন গাজির প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন গাজিকে জয় করতে না পারার ব্যর্থতা তার হৃদয়কে রক্তাক্ত করে, বিচলিত করে। মাসুরার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠায় গাজির ওপর যোগ্য প্রতিশোধ নিতে না পারার যন্ত্রণা তার হৃদয়কে বিচলিত করে। তাই ‘বসে বসে দাহ অনুভব করে আলেয়া। একটি মুহুর্তে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে গাজি। গাজি মাসুরার সঙ্গে কেন প্রেম করবে? এটা ঘটতে দেওয়া যেতে পারে না। অন্য কেউ নয়, সে তো গাজি। গাজি তার পূর্ব-প্রেমিক। এখনো কি দেখার টান ছিল না উভয়ের মধ্যে? যেটুকু অবশেষ ছিল, সেটুকু গোপনে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেখানে ঢুকে পড়েছে মাসুরা। মাসুরাকে ভুলিয়ে ফেলেছে গাজি। এক অসহায়তা বিপন্নতা এসে আলেয়াকে আলোড়িত করে। গাজি অন্যায় করছে। তার প্রতি অন্যায় করছে।”[১০] এভাবে গাজির উপেক্ষা, গাজির কাছে হেরে যাওয়া আলেয়াকে ব্যাথিত করে প্রতিনিয়ত। গাজির প্রেমহীনতা তার হৃদয়কে রক্তাক্ত করে।

আলেয়ার জীবন শুধু অপ্রাপ্তির। গাজিকে ভালোবেসেও সে প্রতিনিয়ত তার কাছ থেকে পেয়েছে অবহেলা আর উদাসীনতা। বাবার চেয়েও বেশি বয়সী গহরকে

বিয়ে করার পরও প্রথম পক্ষের স্ত্রীর জন্য সে স্বামীর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না স্বাভাবিকভাবে। তাছাড়া বাবার চেয়ে বেশি বয়সী স্বামী অষ্টাদশী আলেয়ার আবেগ, আকাঙ্খা, শরীরী চাহিদা মেটাতে পারে না স্বাভাবিকভাবেই। তার এই অচরিতার্থ কামনা, বাসনা, অপ্রাপ্তি প্রকট হয় গাজি-মাসুদার সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর। অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা আর হেরে যাওয়ার দুঃখে 'ঘাটে এসে কাঁদতে বসে আলেয়া। সমুদ্রের জলের মতো, চোখের জল তার ঠোঁটে পড়ে, লবণাক্ত স্বাদ পায়। সমুদ্রের নোনতা স্বাদ শুধু নয় সমুদ্রের মতো বিশাল আকাঙ্খা বোধ করে আলেয়া। ধীরে ধীরে কেঁপে উঠছে তার শরীর। ঠোঁট নড়ে। বুকে ভার লাগে। থেকে থেকে ধাকাচ্ছে বুক। নরম জ্যোৎস্না। চারদিক হিমেল হাওয়া জোনাকি, কুয়াশা—দূরে সমুদ্রের নিলয়য়। সেদিকে তাকিয়ে থাকে সে'[১১]। এভাবে আলেয়ার আবেগ-আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ-বিরহ, প্রেম-প্রেমহীনতার এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন আফসার আমেদ।

'প্রেম' গল্পে প্রেমের এক অভিনব দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবয়সী কণিকা ও শিলাদিত্যর মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এর মধ্যে হঠাৎ করে বিয়ে হয়ে যায় কণিকার। শিলাদিত্য কণিকার নতুন ঠিকানা আর খোঁজেনি, খোঁজার প্রয়োজনও বোধ করেনি, কারণ তাদের প্রথম পরিচয় ভালোবাসার পর্যায়ে যায়নি। এরপর এগারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। হঠাৎ করে আবার পরিচয় হয় তাদের। মধ্যবয়সী শিলাদিত্য ও কণিকা নিজেদের মতো করে একটা প্রেম সম্পর্ক গড়ে তোলে নিজেদের মধ্যে। মাঝবয়সী এই দুই নরনারী নিজেদের মতো করে একটা প্রেমের বলয় তৈরি করে নেয় নিজেদের মধ্যে। বিবাহ পূর্ববর্তী সময়ে এই দুই নরনারীর মধ্যে যে অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছিল, সে অনুরাগ প্রেমে পরিণত হওয়ার পূর্বেই বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তাই অপ্রাপ্তির শূন্যতাবোধের জন্যই কণিকা-শিলাদিত্যর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও আলাদা সংসারে থেকে নিজেদের মতো করে একটা প্রেমসম্পর্ক তৈরি করে নেয়। এই দুই নরনারীর সুপ্ত সে প্রণয় বিবাহ পরবর্তী সময়ে

পরিণতি লাভের একটা সুযোগ পায়। এরা দুজন আলাদা সংসারে থেকেও বিবাহবহির্ভূত প্রণয়ের একটা সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। অবশ্য বিবাহবহির্ভূত তাদের সে প্রণয়ের মধ্যে কোনো অবৈধ বাসনা ছিল না, নেই কোনো শরীরী চাওয়া পাওয়া, আছে কিছু সময় একসাথে কাটানো, পরস্পরের প্রতি ভালোলাগা। নিজেদের সংসারের সব কিছু দেখাশোনার পর, নিজেদের সাংসারিক ও পারিবারিক কর্তব্য পালনের পর অবশিষ্ট সময়ে কণিকা-শিলাদিত্য নিজেদের মধ্যে পূর্বপ্রণয়ের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে চায়—

"রমার কথা কণিকাকে বলবে না। বলার নিয়ম নেই। নিজেরাই অলিখিত এই নিয়ম চালু করছে। কেউই কারও সংসারের কথা বলে না। সংসারের কোনও সমস্যার কথা বলে না। দিব্যি একটু সময় নিজেরা নিজেদের মধ্যে থাকে। অথচ তারা ঘনিষ্ঠ স্বরে কথা বলে না। নিজেরা নিজেদের দেখে। আর প্রয়োজনীয় কথা বলে। হাত ধরার আকুলতা থাকে, কিন্তু হাত ধরে না। বয়সটা কম হলে হয়তো হাত ধরতে পারত। এই মধ্যচল্লিশ বয়সে বন্ধুত্বের নিয়মও যেন বদলে গেছে। রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটে। ভাঁড়ে চা খায়। দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে দু-একটা কথা বলে। সেই চাহনিতে যেন নিজেরা কত অচেনা। নিজেরা নিজেদের চেনেনা তেমন করে। অথচ চাহনির মধ্যে মায়া থাকে। একটু কাছে এসে দাঁড়ায় নিজেরা। এই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে মনে হবে নিজেরা নিজেদের যেন কত চেনে।"[১২]

দুজনের চলা ফেরা আচরণে বোঝা যায় যে এদের বর্তমান সম্পর্কের কারণ পূর্বের সম্পর্কের অতৃপ্ত বাসনা, প্রেমসম্পর্কের অপূর্ণতা। বিবাহপূর্ববর্তী জীবনের অনুরাগ পরিণতি না পাওয়া, বিবাহ পরবর্তী জীবনে দুজনের মধ্যে আকস্মিকভাবে পরিচয় ঘটার ফলে তাদের দুজনকে নতুন করে কাছে আনে। তবে তাদের এই সম্পর্কের মধ্যে কোনো ঘণিষ্টতা সৃষ্টি হয়নি। দু'জনের কাছে দু'জনের চাওয়া পাওয়ার কিছুই ছিলনা, দু'জন দু'জনকে নিবিড়ভাবে পেতে চায়নি কখনও। বরং তাদের সম্পর্কের মধ্যে ছিল চরম শীতলতা, অভ্যস্ততা, অপ্রেম—এ যেন এক অন্য

প্রেম। তাই দেখা যায় শিলাদিত্য-কণিকা সাক্ষাৎ করার পর ঘরে ফিরতে রাস্তায় হাঁটতে দিনের শেষে কখন 'কণিকার বাস এসে কণিকাকে নিয়ে গেছে, খেয়াল করেনি শিলাদিত্য। এখন সে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রমার কথাই ভাবে'[১৩]। প্রেম ও প্রেমহীনতার এক নতুন চিত্র তুলে ধরেছেন এ গল্পে।

'নষ্ট দুপুর' গল্প একটা মৃত প্রেমের গল্প। সৌরভ-অনিন্দিতার মধ্যে প্রেম ছিল। কিন্তু অনিন্দিতাকে ফেলে সৌরভ বিয়ে করে স্বস্তিকাকে। অনিন্দিতাও বিয়ে করে সৌরভের বন্ধু শাশ্বতকে। সৌরভ এক সপ্তাহের ছুটিতে কানপুর থেকে নিজের পরিবারের কাছে আসে। কিন্তু বাড়ি ফিরে মনে পড়ে যায় তার পূর্বপ্রেমিকা অনিন্দিতার কথা। অনিন্দিতা-সৌরভের প্রেমের সম্পর্ক ছিল কলেজ জীবনে। কিন্তু হঠাৎ করে তাদের সে প্রণয়ের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। সৌরভকে অবহেলা করতে থাকে অনিন্দিতা। অভিমানে সৌরভ বিয়ে করে নেয় স্বস্তিকাকে। বাড়ি ফিরে অনিন্দিতার কাছে নির্জনে দেখা করতে যায় সৌরভ। কিন্তু স্বস্তিকার কাছে গিয়ে সে দেখে একই উদাসীনতা তার মধ্যে সমানভাবে জাগ্রত। অনেক আবেগ, আগ্রহ আর প্রেম নিয়ে অনিন্দিতার কাছে বহুদিন পর গিয়েও তার কাছ থেকে পায় একইরকম নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা। অনিন্দিতার উপেক্ষায় সে মর্মাহত ও বিষণ্ণ হয়। অনিন্দিতার কাছে নির্জনে দেখা করতে গিয়ে হতাশ হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সৌরভ ভাবে 'কেন এল সে? দুপুরের ভাতঘুম তার চেয়ে জরুরি ছিল না কি? এই নষ্ট দুপুর তার কী কাজে লাগবে? স্মৃতিকে আহত করে রাখবে সারাজীবন'[১৪]।

সৌরভের সঙ্গে অনিন্দিতার প্রেম-সম্পর্ক পরিণতি পায়নি। অনিন্দিতার অবহেলা এবং অনিন্দিতার কাছে পরাজয়ের অভিমানে সৌরভ অন্য মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে ঠিকই, কিন্তু অনিন্দিতার কাছে এই পরাজয় সে মানতে পারে না কখনও। পারে না বলেই সে বিয়ের পরও ছুটে যায় অন্যের স্ত্রী হয়ে যাওয়া তার পূর্বপ্রেমিকা অনিন্দিতার কাছে। অবশ্য এবারো গিয়ে দেখে তার প্রতি অনিন্দিতার

একই রকমের উপেক্ষা উদাসীনতা। এখানে আফসার আমেদ প্রেম-মনস্তত্ত্বের এক জটিল চিত্র তুলে ধরেছেন।

আফসার আমেদের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আধুনিক মানুষের প্রেম-প্রণয় ও দাম্পত্য জীবনের গভীর সংকটের চিত্র। কখনও বিবাহপূর্ববর্তী প্রণয়, কখনও বিবাহপরবর্তী প্রণয়, কখনওবা বিবাহবহির্ভূত প্রণয়ের সংকটকে তুলে ধরেছেন তিনি সময়ের প্রেক্ষাপটে। তবে আফসার আমেদ যে প্রেমের কথা বা অপ্রেমের কথাকে তাঁর সাহিত্যে দেখাতে চেয়েছেন, তার মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের কথা শোনা যায় না। আধুনিক মানুষের মনস্তত্বের বহুকৌণিক চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রেম-প্রণয়কে তিনি অন্বেষণ করেন নিজের মতো করে। তাঁর গল্পে একদিকে যেমন দেখা যায় প্রেমের আবেগ, উন্মাদনা, তেমনি আবার দেখা যায় পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সে আবেগী প্রেমের স্তিমিত হয়ে পড়া। সময়ের দাবী মেনে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের হৃদয় সম্পর্ককে তিনি দেখাতে চান। আধুনিক মানুষের প্রেম-মনস্ত্বের জটিলতার সামগ্রিকতাকে তিনি দেখাতে চান তাঁর গল্পে। তাই বলা যায় প্রেমে-অপ্রেমে আফসার আমেদের গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে এক নতুন সুর সংযোজন করে। জন্মলগ্ন থেকে বাংলা সাহিত্য যে প্রেমের চিত্র তুলে ধরে আসছে আফসার আমেদের প্রেমের গল্পগুলো তার মধ্যে স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র নির্দেশ:

১। 'আফসার আমেদের গল্প: পরিবর্তনশীল গ্রামজীবনের মহাকাব্য', 'বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি, সোহারাব হোসেন,করুণা
প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ২৬৭

২। তদেব, পৃ. ২৬৭-৬৮

৩। 'বিরহ', 'আফসার আমেদ সেরা ৫০ টি গল্প', আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৯৩

৪। তদেব, পৃ. ৯৪
৫। তদেব, পৃ. ৯৮
৬। তদেব, পৃ. ৯৮
৭। 'সমুদ্র নিলয়', তদেব, পৃ. ১০০
৮। তদেব, পৃ. ১০৫
৯। তদেব, পৃ. ১০৬
১০। তদেব, পৃ. ১০৭
১১। তদেব, পৃ. ১০৮
১২। 'প্রেম', তদেব, পৃ. ২৫৬
১৩। তদেব, পৃ. ২৫৯
১৪। 'নষ্ট দুপুর', তদেব, পৃ. ৩৯৭

অ সী ম হা ল দা র

বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চায়েতিরাজ : আফসার আমেদের ‘ধ্যানেজ্যোৎস্না’

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই কম বেশি কার্যকরী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতেও তার ব্যতিক্রম নয়। ই. এরিক জ্যাকসনের মতে ‘স্থানীয় সরকার বলতে বোঝায় গণনির্বাচিত পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় সেবামূলক এবং অন্যান্য বিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা করা। এই পরিষদগুলো নির্বাচিত হয় তাদের প্রশাসনভক্ত এলাকাগুলিথেকে।’ ব্রিটিশ শাসনের আগেই ভারতে গ্রাম পরিষদের অস্তিত্ব ছিলো। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে সজাগ থাকতো গ্রাম পরিষদ বা গ্রামসভার সদস্যরা। ইংরেজ আমলে ভারতে ১৮৭০ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সদস্যদের নির্বাচন করতেন গ্রামীণ মানুষদের শাসনে রাখার জন্য। লর্ড রিপন ১৮৮২ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোকে ঢেলে সাজাবার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান। পরবর্তীতে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাস হয়, যাতে তিনটি স্তর ছিল। যথাক্রমে জেলা পরিষদ, স্থানীয় পরিষদ, ইউনিয়ন কমিটি। ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন পাস হলে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি আরো ব্যাপক অংশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ সালে পঞ্চায়েত আইন পাশ হয় এবং ১৮৫৭ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৬৩ সালে আইনের কিছু সংশোধন হয়। ১৯৭৩ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয় এই রাজ্যে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদে বিভক্ত হয় স্তরগুলি। যদিও সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি পঞ্চায়েতের অনুকূলে ছিলো না।

১৯৬৫ সালের রাজ্য জুড়ে সংগঠিত হয় খাদ্য আন্দোলন। স্ট্রাইক, বনধ, ধর্ণা, মিছিল সব মিলিয়ে রাজ্যের রাজনীতি ছিল অশান্ত। একটির পর একটি সরকারের পতন এবং উত্থান ঘটেছে এই সময়কালে। ১৯৭২ সালে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গণতন্ত্রের সব নিয়ম-কানুনকে ধুলিস্যাৎ করে। এই সরকার ১৯৭৩ সালে নতুন করে রচনা করে পঞ্চায়েত আইন। এই আইনে বলা হয় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা। কিন্তু এই আইন কার্যকর করেনি কংগ্রেস সরকার। কারণ, প্রধানত রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং সমাজ পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার অনুকূলে ছিলো না। “দারিদ্র্যের হার ৫৮.৪ শতাংশ। জাতীয় গড় ৫১.২ শতাংশ। সমাজে বড় জমির মালিকদের দাপট। এরাই ছিলেন কংগ্রেস দলের ভোট-

ব্যাঙ্ক। 'ঘোষ মেশিন' নামে পরিচিত এই ব্যবস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল জমিদার, জোতদার, মহাজন এবং খাদ্যদ্রব্যের কারবারী। এঁরাই ঠিক করতেন সরকারি সুযোগ-সুবিধা কিভাবে বন্টিত হবে এবং কারা পাবেন এইসব।"[১] ১৯৭৭ সালে পরাজিত হয় কংগ্রেস দল। বিপুল ভোটে ব্যাপক জনগণের সমর্থনে এবং গণচেতনায় ও আবেগঘন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে ক্ষমতা দখল করে বামফ্রন্ট। বামফ্রন্ট সরকার বামপন্থী দলগুলির একটি কোয়ালিশন সরকার। সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে এই সরকারের শরিকরা একত্রিত হয়েছে মূলত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ দ্বারা সহমতের ভিত্তিতে। গৃহীত এই কর্মসূচির লক্ষ্যে, সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মঙ্গল সাধন করা, শ্রমজীবী মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা এবং সমাজের পশ্চাৎপদ মানুষের অংশকে সমাজের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা। স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি গ্রামের প্রশাসনকে গণতন্ত্রীকরণ করা এবং শ্রমজীবী জনতাকে যন্ত্রণার যাঁতাকল থেকে মুক্তি দেবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার শীঘ্রই পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করি। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জুন এ রাজ্যের সর্বত্র পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদ মোট ৫৫,৬৫০টি আসনে নির্বাচন হয়। ভারতে এই ধরনের নির্বাচন এর আগে হয়নি। দরিদ্র, ছোটো চাষিদের মধ্যে থেকেই অধিকাংশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কলকাতাকে দেশের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র রূপে গণ্য করা হয়। নাচ, গান, বাজনা, নাটক, সিনেমার পাশাপাশি বাঙালীর সাহিত্যচর্চার প্রবণতা সর্বজনবিদিত, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতাও যুক্ত হয়েছে। তাই বাঙালি সাহিত্যচর্চায় অনিবার্যভাবে ঢুকে যায় রাজনৈতিক চিন্তা চেতনাও। সমাজ সময়কে উপেক্ষা করতে না পারা সাহিত্যিকদের কলমে উঠে আসে পঞ্চায়েত প্রসঙ্গ। গল্প উপন্যাসের কাহিনীর পেক্ষাপটে গ্রাম এবং পঞ্চায়েতের গতি প্রকৃতির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়। সচেতন পাঠক অনায়াসে ধরতে পারেন লেখকের রাজনৈতিক উপলব্ধিকে। দেশ, কাল, সমাজ, সময়কে ভাষার মুন্সিয়ানায় সাজিয়ে আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ্যতার সীমানাতেও পাঠকবর্গকে পৌঁছে দেন সচেতন লেখক। একসময় ভূমিসংস্কার প্রভৃতি করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত বিভাগ অনেকের সমর্থন পেয়েছে। আবার ক্ষুব্ধও হয়েছে কেউ কেউ। সমাজে এসেছে ভিন্নতা জটিলতা। বাংলা কথাসাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা

আফসার আমেদ–এর ‘ধ্যান জ্যোৎস্না’ (২০০৩) উপন্যাসে সেই ছবি দেখার চেষ্টা করব।

“গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা আমাদের ভারতীয় মুসলমান সমাজের ভেতরে–ভেতরে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে নতুন নতুন কাজের সুবাদে ভারতীয় মুসলমানরা সেখানে যাচ্ছেন ও সেই উপার্জিত বিদেশী অর্থ আমাদের গ্রামে গ্রামে এসে পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের মুসলমান সমাজ শরীয়তের ও সমাজে নানা সংস্কারে বাঁধা পড়ে আছে। সেই বন্ধন সবচেয়ে কঠিন হয়ে বাজে মুসলমান সমাজের মেয়েদের জীবনে। বিবাহ বিচ্ছিন্না সেই মেয়েরা এক সংসার থেকে আর এক সংসারে জান স্মৃতি আর নতুন সম্পর্ক নির্মাণের দ্বন্দ্বে ও প্রতিশ্রুতিতে।” আফসার আমেদের ‘ধ্যান জ্যোৎস্না’ উপন্যাসের পরিচয় লিপিটি পাঠ করে বোঝা যায় এই কাহিনীর কেন্দ্রে আছে একটি মেয়ে। গ্রাম্য বিবাহবিচ্ছিন্না মুসলিম মেয়ে সখিনার জীবন প্রবাহকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছেন লেখক। তারই মাঝে মুসলিম সমাজে পঞ্চায়েতের প্রভাব নজর কেড়েছে আফসার আমেদের। তিনি সেই উপলব্ধিকে আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন।

সখিনার প্রথম স্বামী দরিদ্র কাঠমিস্ত্রি নুর আলি। বিয়ের আড়াই বছর পর তুচ্ছ একটা কারণে পতিপত্নীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিচ্ছেদ ঘটে যায়। আর তার কারণ “কনের বাবার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল রাজহাটি অঞ্চলের অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধান। কনের ভাসুর যাতে কৃষিঋণ পায় সে ব্যাপারে কনের বাবাকে বেশ কয়েক বার বলে কনের ভাসুর। যাতে কনের বাবা আত্মীয় অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধানকে সুপারিশ করে।”[২] প্রসঙ্গত দরিদ্র চাষীদের জন্য পঞ্চায়েত থেকেই ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। জওহর রোজগার যোজনা, সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি, জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি প্রকল্পগুলির সহায়তা দিতে পঞ্চায়েতই এগিয়ে আসে।

নুরের দাদা কৃষিঋণ না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়। পঞ্চায়েত অফিসে সালিসী ডেকে বিচ্ছেদ হয়ে যায় নুর ও সখিনার। এতে উভয় পক্ষই কর্তৃত্বদের সায় ছিলো। অন্যথায় পঞ্চায়েত বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতো। গ্রামের বহু সমস্যা পঞ্চায়েত আলোচনা করে মিটিয়ে থাকে। এতে আইনি ঝামেলা ও অর্থ অপচয়ের বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পায় গ্রাম্যজনেরা। সালিসীর জন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের, বিশেষত প্রধানদের, অনেক সময় দিতে হয়। জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়া থেকে আরম্ভ করে পারিবারিক নানা ধরনের সালিসী পঞ্চায়েত করে, গরীবদের ভেতরে কিছু ঝগড়া

আগে বাড়তে বাড়তে থানা আদালত পর্যন্ত গড়াত। আজকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না। গ্রামের স্বচ্ছল ও গরিবদের ঝগড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত মিটিয়ে দিচ্ছে। আইনত বিচার করার অধিকার পঞ্চায়েতের নেই। তারজন্য 'ন্যায় পঞ্চায়েত' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা আছে, কিন্তু গ্রামের লোক বসে থাকেনি, ঝগড়া মেটাবার জন্য তারা পঞ্চায়েতের কাছে আসছে, পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছে। পঞ্চায়েত সত্যি সত্যি বিচার করে না, সালিশী করে। কোনো পক্ষ না মানলে থানা আদালত করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই করছে না। থানা আদালত, দালাল ও উকিলদের হয়রানি থেকে গরীবরা বেঁচেছে, দুর্দশার সুযোগে যারা পয়সা করতো তারা চটলেই গরীবের মস্ত লাভ হয়েছে। এর থেকেও লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে, যেসব পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে সেসব অঞ্চলে গ্রামের গরিবদের বিভিন্ন অংশের ভেতরে একটা ঐক্য এসেছে, শ্রেণী হিসেবে গরিবদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে এবং গাঁয়ের ঝগড়াঝাটিগুলিতেও হয়ে দাঁড়ায় বড় বাঁধা। ভাল অঞ্চলগুলোতে এই বাধা প্রায় দূর হয়ে যাচ্ছে”[৩] নুর ও সখিনার বিচ্ছেদ হলেও তারা পরস্পরকে ভালোবাসত। নুরের দেওয়া পথটা তাই শত দারিদ্রের মধ্যেও বিক্রি করেনি সখিনা। নুর আরবে কাজ করে স্বচ্ছলতা আনে নিজের সংসারে। ফুলসরাকে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করে দেয়। তবে মেহের আলী ও সখিনাকে ভোলেনি। সামাজিক অনুষ্ঠানে নুর আমন্ত্রণ জানাতো সখিনার দ্বিতীয় পতি মেহেরকে সপরিবারে। অর্থ সাহায্য করতেও কার্পণ্য করেনি আর্থিক অবস্থা ফেরানোর লড়াইতে নামা কৃষক মেহের আলিকে। মেহের সখিনার নাকচচাবিটা নুরকে বন্ধক দিয়ে হাজার টাকা নিয়ে ঋণ শোধ করে। পরে টাকা ফেরত না নিয়েই নাক চাবিটা ঘুরিয়ে দেয় মেহের তথা সখিনাকে।

দরিদ্র চাষীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ অনৈতিক মুনাফা লুটতে চায়। উচ্চফলনশীল ধান চাষ করতে দরকার ট্রাক্টর, স্প্রে মেশিন, ধান ঝাড়া মেশিন, অথচ অধিকাংশ চাষীদের হাতে সেই সব সরঞ্জাম থাকে না, বাধ্য হয়েই ধনী ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হতে হয় তাদের। রহমতের মতো ব্যবসায়ীরা সামান্য টাকা দিয়েই অত্যাচার শুরু করে অসহায় কৃষকদের প্রতি। সখিনার মতো অসংখ্য মেয়েদের দিকে লোলুপ হাত এগিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না। যদিও রহমতে ৪৩০ টাকার কর্জ মিটিয়ে দেয় সখিনার বর্তমান স্বামী মেহের আলি। সখিনা ভাবে চাষে খাটা লোকটার চাষ করবার আজ আর অধিকার নেই। উচ্চফলনশীল চাষ করবার অনুপযুক্ত মেহের। গ্রীষ্মে এই চাষ করতে হয়। জল কিনতে হয়। সার কিনতে

হয়। কীটনাশক কিনতে হয়। যন্ত্রচালিত লাঙল দিয়ে চাষ করতে হয়। বীজধান আর গতর দিয়ে আজ আর চাষ হয় না। আধুনিক কৃষি পদ্ধতির হাতে পড়তে হয় তাদের। ব্যবসার মতো টাকা লগ্নী করতে পারে জমিতে। রহমতের মতো মানুষদের হাতে পড়তে হয় তাদের। রহমত ব্যবসায়ী বটে, আবার দুশ্চচরিত্রও।”[৪] রহমত শ্রেণির মানুষদের হাত থেকে চাষিদের বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এসেছে পঞ্চায়েত। লেখকের মতে “তৃণমূল পর্যন্ত পঞ্চায়েতরাজ পৌঁছে গেছে। পঞ্চায়েত আজ এই প্রশাসন। পঞ্চায়েতের হাত ধরেই কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ। কৃষিঋণ থেকে শুরু করে কৃষি–যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাঙ্কঋণ, স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণ পঞ্চায়েতের সুপারিশ ক্রমে বাস্তবায়িত হয়। সেই সব উপকরণ কৃষিতে সংযুক্ত হচ্ছে। কৃষিকে কেন্দ্র করে নতুন এক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।”[৫]

একজন প্রান্তিক চাষের পক্ষে একই জমিতে তিন বার ফসল ফলানো কঠিন। আর্থিক সঙ্গতির অভাবে আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে ফসল ফলাতে পারে না। ট্রাক্টর, পাম্প, ধান ঝাড়াইয়ের মালিকদের সঙ্গে জড়িয়ে যায় তারা নানান জটিল লেনদেনের সম্পর্কে। এই মালিকদের অনেকেই পঞ্চায়েতের সুপারিশে লোন নিয়ে যন্ত্রপাতির মালিক। সমাজে নতুন ধরনের সম্পর্কের অবতারণা করেছে পঞ্চায়েতিরাজ।

সূত্র নির্দেশ :

১। বিকেন্দ্রীকরণ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন : পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা / প্রভা দত্ত (উন্নয়ন সংগ্রাম, গণশক্তি, ২০০৬)
২। ধান জ্যোৎস্না ও ব্যথা খুঁজে আনা / আফসার আমেদ (দে'জ, ২০০৩)
৩। গ্রামীণ জীবনে পঞ্চায়েত / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, CPI(M), ১৯৮২
৪। ধান জ্যোৎস্না ও ব্যথা খুঁজে আনা / আফসার আমেদ (দে'জ, ২০০৩)
৫। তদেব

তথ্য সহায়তা :

১। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ / উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২। আমরা চলি সমুখপানে : ৩০ বামফ্রন্ট সরকার / তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩। পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০০৩ / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, CPI(M)
৪। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে পঞ্চায়েত / সূর্যকান্ত মিশ্র
৫। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা / অসিত কুমার বসু

ম নো র ঞ্জ ন ন স্ক র

আফসার আমেদের ছোটগল্পে অন্তঃপুরের উদভাস

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য আফসার আমেদ (১৯৫৯–২০১৮) এক ব্যতিক্রমী কথাকার। মৃত্তিকালগ্ন জীবনের, বিশেষভাবে গ্রাম-নির্ভর মুসলমান সমাজের নারী জীবনের কথা তাঁর মতো সহমর্মিতা ও সমবেদনা নিয়ে আর কেউ দেখেছেন বলে মনে হয়না। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে মুসলমান নারীকে যেভাবে এবংবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে অসহায়ভাবে জীবন যাপন করতে হয়, তা মরমি বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তিনি ছোটগল্পে ভাষা-শরীর দিয়েছেন। একদিকে গ্রামীণ মুসলমান সমাজের পিছিয়ে পড়ার কারণ, অন্যদিকে মুসলমান মেয়েদের দুর্দশা–বঞ্চনা, অবমাননা, লাঞ্ছনা, এবং সর্বোপরি অগত্যা মানিয়ে নেওয়া – এই পরিণতিকে তিনি নিপুণভাবে তুলে ধরেন তাঁর ছোটগল্পে। প্রসঙ্গত, সামাজিক এবং ধর্মীয় শোষণের বিচিত্র ঠিক দক্ষ পর্যবেক্ষকের মতো গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। যে চরিত্রগুলো তাঁর রচনায় উঠে এসেছে মনে হতে পারে ব্যক্তিগত জীবনে পরিচয় না থাকলে এমন প্রাণবন্ত ভাবে তাদের রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কথাকারের শব্দপ্রয়োগের আশ্চর্য কুশলতা।

সাহিত্য–সৃজনের আদিকাল থেকেই নারীই হয়েছে সাহিত্যের বিষয়। নারীর রূপ, নারীর প্রেম, নারীর ভাবনা – পুরুষের চেতনার রঙে উদ্ভাসিত। পুরুষ মনে তরঙ্গ তোলে নারীর প্রেম ভাবনা। কাব্যেও নারীর বিভিন্ন অনুষঙ্গ বর্ণনার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ ও মনোভঙ্গির স্বীকরণ আছে। জীবন-উপলব্ধি শিল্পরূপ নির্মাণে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে। বিশেষত, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন থেকে নারীবাদী চিন্তনের প্রসার দৃঢ়তর হয়েছে ও ব্যপ্তি পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে ভারতীয় সমাজ-সমর্থিত পিতৃতন্ত্রের স্বীকৃতি থাকাই স্বাভাবিক। গোটা উনিশ শতকে আমরা তেমনি পেয়েছি। ''কখনও বিরুদ্ধতায়, কখনও ভক্তিতে, প্রেমে, স্নেহে, কারণ্যে এই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত।''[১] সামাজিক অনুশাসনে মুসলমান নারীর বিদ্যার্জন প্রায় নিষিদ্ধ ছিল বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। নারী ছিল প্রধানত গৃহে অবরুদ্ধ। তার ভূমিকা ছিল পুরুষের সেবায়, গৃহকর্মের শৃঙ্খলা-বিধানে, সন্তান-ধারণে ও সন্তান-পালনে সীমাবদ্ধ। পুরুষের দাবি, অনুশাসন, প্রত্যাশা, উপভোগ, স্বাধীনতা – নারীর মনে কোন্ অনুভূতি সঞ্চার করেছিল, তা চিরকালই থেকে গেছে গেছে অ-প্রকাশিত। আফসার আমেদ মুসলমান সমাজের অন্তঃপুরবাসিনীর সেই মনোভুবনকে উদ্ভাসিত করেছেন।

দে'জ প্রকাশিত, আফসার আহমেদ 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (২০১৮ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ) থেকে কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে অন্তঃপুরের উদ্ভাসকে আমরা দেখবার চেষ্টা করব। 'সঙ্গ' প্রকাশিত হয় শারদীয় আজকাল-এ ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে। গল্পের কথাবস্তু অতি সাধারণ। স্ত্রী মরিয়ম ও স্বামী মতিনের দাম্পত্য সম্পর্কে তিরিশ বছরের। মতিন সম্পর্কে মরিয়মের রাগ ও অভিমান দুইই আছে। মেয়ে-জামাই, দুই ছেলের বউ হয়েছে। কম বয়সী আরো দুটি ছেলে ও এক মেয়ে আছে মরিয়মের। তবুও স্বভাবের বদল হয়নি মতিনের। সে স্বার্থপর, অলস, একগুঁয়ে। বাড়িতে বনিবনা হলে কথায় কথায় রাগ দেখিয়ে হুগলির এক মসজিদে ইমামের কাজ করতে চলে যায় সে। একদিন সেই মরিয়মের বাড়িতে মেয়ে-জামাই এসেছে। অনেক কিছু রান্না করেছে মরিয়ম। তাদের খাওয়ার আগে, রান্না তখনও শেষ হয়নি পুরো, মতিন ভাত খেতে চায়। জামাইকে তার জুতো কিনে দেবার কথা বলে। এমনকি জামাইয়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সে বিড়ি খায়। যখন ইচ্ছে, তখন সে খেতে চায়; নইলে হুগলিতে মসজিদে চলে যাবে। তাই সে ব্যাগ গোছাতে থাকে। মরিয়ম তখন তার ছোটো মেয়েকে বলে তার আব্বাকে ভাত দেবার জন্য। গল্পের শেষটা অন্যরকম।

সব কাজ সেরে মরিয়ম পুকুর ঘাটে যাবে। তখন তার পুকুরের জলের জন্য শরীরটা ছটফট করছে।

গল্পকথা এটুকুই। কিন্তু অন্তঃপুরের উদ্ভাস জানতে গেলে আখ্যানের অনুপুঙ্খ পাঠ বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। অন্তঃপুর মানে তো শুধু শরীর নয়; নারীর সঙ্গে, নারীর জীবনের সঙ্গে নানা মাত্রায় জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বাস্তবতার কথা। 'সঙ্গ' গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদেই কথক জানিয়ে দেন 'সংসারের জীব মরিয়ম'। সংসারের জীব বললে এখানে কোন বিশেষ মর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয় না। বরং বোঝায় যে কোনও গৃহপালিত জীবের মতো তার অবস্থান। সে যে মানুষ, একজন স্ত্রী, তারও আছে মনোময় এক অস্তিত্ব, অনুভূতি; স্নেহ, প্রেম, রাগ, মনখারাপ করা, ভালো না লাগাসহ এক অনেকান্তিক অস্তিত্ব – তা যেন মুহূর্তেই নাস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু তার পরেই লেখক যখন মরিয়ম সম্পর্কে জানান – "বুকের পাতায় নরম ও আর্দ্রভাব আজও সে হারিয়ে ফেলেনি। সংসারে মন ও শরীরের নানা খাতে খরচ হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত তবুও স্নিগ্ধ যথেষ্ট হয়ে যায় মতিনের জন্য।" – এ কথায় বোঝা যাচ্ছে যে মনের মধ্যে আজও মরিয়মের ভালোবাসা আছে মানবিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যে মন এখন উদ্দীপ্ত হয়। লোকালয়ের নানা আন্দোলনে আন্দোলিত হয় এখনও। কিন্তু শরীরে নানা খাতে মন যে প্রতিনিয়ত নানা খরচ হয়ে চলেছে – এ বিষয়টি বিশেষভাবে বুঝে দেখবার অবকাশ তৈরি করে।

মতিনের স্বামী। বিবাহিত তিরিশটা বছর জ্বালিয়ে খাক করেছে তাকে। গল্পের সময়ে মতিন লোকটা আরো বুড়ো, ক্ষয়াটে এবং শয়তান হয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, যে লোকটার সঙ্গে মরিয়ম তিরিশ বছর ঘর করল, সেই লোকটার চরিত্রগত কোনো উত্তরণ নেই; আছে অবনমন। অথচ সেই অবনমনমুখী লোকটার সঙ্গে মরিয়মকে আজও কেবল মানিয়ে চলতে হয়। এছাড়া তার উপায় নেই কোনো।

ছয় ছেলে-মেয়ে ও তিন বউ-জামাইয়ের ভরা সংসার পেলেও মরিয়মের নিজের কোন জগত নেই, জগৎ যে নেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভরা সংসারের মধ্যে মতিন বিশৃঙ্খলা পাকালে মরিয়ম যখন তীব্র হয়ে ওঠে। মরিয়ম তীব্র হয়ে উঠলে স্বাভাবিকভাবে ক্ষেপে যায়। তখনই - "লোকটা ঝোলায় লুঙ্গি গামছা নিয়ে হুগলির এক গ্রামের মসজিদে ইমামতি করতে চলে যায়। অভিমান বসত।" - অথচ আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিবোধই জানান দেয় অভিমান হওয়ার কথা মরিয়মের। কিন্তু অভিমানবশত তিরিশ বছরের দাম্পত্য সঙ্গীকে ফেলে রেখে মতিন চলে যায়। যদি মরিয়মের নিজস্ব জগত থাকত, কিংবা নিজের কণ্ঠস্বরের জোর থাকত তাহলে সে আটকাতে পারত মতিনকে। এ যেন চোরের মায়ের বড় গলা। মিতিন নিজে অন্যায় করছে আবার নিজেও তেজ দেখিয়ে অভিমান করছে। নারীর কোথাও যে কেউ নেই তা কি স্পষ্ট হয়ে যায় না? "অন্তত মরিয়মের মত মুসলমান সমাজে নারীর ক্ষেত্রে? তাই এ ঘটনার পরে পরেই কথক জানিয়ে দেন অগত্যা - "সংসারে থাকার অভ্যাস যে মানুষটির তার পক্ষে এ ব্যবস্থা বড় কষ্টকর। ...সংসারে জ্বালানো-পোড়ানো মতিনের স্বভাব। মতিনের জ্বালানো-পোড়ানো মেনে নিলে সব ঠিক আছে। না নিলে লোকটা মৌলবির বেশ ধরে পালাবে।

ফুল জমতে জমতে একসময় পাত্রী হয়ে যায়। মরিয়ম অপমান সহ্য করতে করতে গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। মরিয়ম চায় লোকটা সংসারে থাকুক। তার জন্য মতিনের অনেক বদভ্যাস ও খারাপ আচরণ মেনে নিতে হচ্ছে মরিয়মকে। তিরিশটা বছর নিয়ে তো আছে লোকটাকে মরিয়ম! অবশ্য পাঠকের তখন আর জানতে বাকি থাকেনা কী-ভাবে আছে এই মরিয়ম।

অবিচ্ছিন্ন নিশ্চিত আশ্রয় মরিয়মের যে নেই তা স্পষ্ট করে তোলেন আফসার আমেদ। রান্নাবান্না সময়। গ্রীষ্মের দিন। বড়ো বেশি অগ্নিময়তা। মেয়ে জামাই এসেছে। বেলা দশটা থেকে রান্নাঘরে ঢুকেছে মরিয়ম। জামাই-মেয়ের জন্য রান্নাবান্না

ভালো মতো করতে হচ্ছে। একটু শীতল বাতাসের জন্য প্রাণ হাঁসফাঁস করছে। শরীরও আরাম পেতে চায়। দুপুরে একটু না ঘুমোলে উপায় নেই। কিন্তু সেই আরাম পাবার সুযোগ তার নেই। নেই কেননা ঘরের অভাব কথক জানান –

"দুই ছেলের বউয়ের দুটি ঘর। মেয়ে জামাই তাদের ঘরটা দখল করেছে। পাশের ঘরটাতে মতিন একাই দখল করে আছে। মরিয়ম নিজের স্বার্থের কথা ভাবলে, মতিন যদি চলে যেত, তাহলে দুপুরে অথবা রাত্তিরে পা ছড়িয়ে আয়েশ করে ঘুমতে পারত। তা পারছে না, তবুও লোকটা চলে যাক এটা চায়না মরিয়ম।"

---- লক্ষণীয়, যে পরিস্থিতিতে বিশ্রামের প্রয়োজন নারী-পুরুষ – উভয়েই; সেই গরমের দিনে পাশের ঘরটাতে মতিন একাই দখল করে আছে। মরিয়মের জন্য, মরিয়মের বিশ্রামের জন্য তার হেলদোল নেই কোনো। মরিয়মের এই কষ্টকথা শুধুমাত্র মরিয়মের কষ্টে আটকে থাকে না; সে কষ্ট বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান পরিবারে বাস্তব হয়ে ওঠে। মরিয়ম যেন বাংলার নারী রূপের প্রতীক হয়ে ওঠে।

জীবনে দারিদ্র থাকতে পারে, কিন্তু জীবন যে কোনও ভাবেই দরিদ্র নয় – এমনই এক মায়াময় উপলব্ধির জগতে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও গল্প–কথক মরিয়মকে নিয়ে যাওয়ার অবকাশ তৈরি করে দেয়। জীবনে ছোট ছোটো স্বপ্ন, আশা, মায়ার হাতছানি থাকে বলে জীবন যে গতিশীল থাকে; – তেমনই এক মায়া – পরিবেশ রচনা করেন কথাকার আফসার। গ্রীষ্মের দাবদাহে আর ভীষণ কর্মব্যস্ততায় যখন ক্লান্ত শরীর তার আরাম পেতে চায়, তখন হঠাৎই "কোথায় যেন একটা পাখি মিষ্টি সুরে ডাকছে। কোথায়? কোনদিকের গাছপালায়?" পাখির মিষ্টি সুর মরিয়মের কানে আসে ঠিকই। কিন্তু রান্নাঘরে রান্না করতে করতে দিক নির্ণয় করবার টুকরো অবকাশ সে পায় না। পাখির ডাক কোথা থেকে আসছে, তা বুঝতে গেলে রান্নার আয়োজন থেকে সে সরে যাবে। যদি তা সে সুযোগ থাকত তাহলে সে হয় রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখত, না হলে একটু বাইরে বেরোত; তাতেও যদি পাখিটার অবস্থান খুঁজে না পায় তাহলে "ঘাটের দিকে তাকে আপন মনে দাঁড়াতে হতে পারে।"

বস্তুত, সংসারের নিরবচ্ছিন্ন কাজ আর ব্যস্ততার মধ্যে মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে। দরকার হয় মুক্তির। অথচ সে মুক্তির অবকাশ মধ্যবিত্ত জীবনে খুব একটা আসে না। আর নারীর জীবনে তা তো আরও দুর্লভ; অন্তত মরিয়মের ক্ষেত্রে। অন্তর্গত নৈঃসঙ্গের অন্তর্লীন অন্তর্বেদনা তাই ক্ষণিকের জন্য হলেও আনমনা করে তুলতে পারত মরিয়মকে। তাই কথক এমনই একটা অবকাশ তৈরি করে দেন তার বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে। "তাকে আপন মনে দাঁড়াতে হতে পারে।" কিন্তু বাস্তব অন্যকথা বলে। সে সুযোগ হয়ে ওঠে না। তার কারণ মেয়ে-জামাইয়ের আসা, রান্নাবান্নার ব্যস্ততা। কিন্তু এত বাস্তবনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মরিয়মের মধ্যে একই সঙ্গে চিন্তা-আর-জিজ্ঞাসার স্রোত বইয়ে দিলেন কথক। অতি মসৃণভাবে তার অন্তর্চেতনার চারিয়ে দিলেন সাহসিক সত্তা আর অন্তর্গত সত্তার এক হিমেল টানাপোড়েন। লেখকের উচ্চারণে – "অথচ পাখিটাকে দিয়ে নিজের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালে ভালই লাগতো তার।" এই নিজের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটানো জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষিত নয় কি?

যার জীবনের সঙ্গে ত্রিশটা বছর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে, তাকে না মানানো ছাড়া আর উপায় কি? তাই মতিনের নানা রকম বদভ্যাস মরিয়মের চোখে পড়লেও মতিনের পক্ষে সে থেকে যাচ্ছে। জামাইয়ের জন্য ডিম ভাজবে বলে ঘর থেকে ডিম আনতে গিয়ে মরিয়ম দেখে একটা ডিম কাঁচা, সে চুষে চুষে খাচ্ছে। নিজের মনে মনে সে বলে – "ওই লোকটা কিনা মৌলবি, সে মসজিদে ইমামতি করে?" নিজের রাগ দাঁতে চেপে রাখল মরিয়ম। কিছু বলল না। বরং একটু নরম সুরে বলে – "কি গো, এত বেলা হ'য়ে গেল, এখুনো গোসল করে এলেনি?" সুর তাকে নরম করতেই হয়। কী সে করবে এছাড়া? তিরিশ বছরে যে শোধরাল না, তাকে বলা মানে তো পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। হৃদড় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে কারই বা ভালো লাগে?

রান্নাঘরে মতিন মাংস চাখতে থাকে। উবু হয়ে বসে। মতিন মরিয়মের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে মরিয়ম বলে –

"আলসকে বলে দোব; তোমার জন্যে একখানা লতুন থামি এনে দিবে।"

'আর গেঞ্জি?'

'গেঞ্জির কথাও বলব।'

'জামাইকে বলেছি, জুতোর কথা।'

– এতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু জামাইকে জুতো কিনে দেবার কথা বলতে শুনে মরিয়ম গুম মেরে থাকে। "জামাইয়ের কাছে মান ইজ্জত সব দিয়ে দিল।" নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে, বিশেষত নারী জীবনে টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত না থাক সম্ভ্রমবোধটুকু তার সম্বল। মতিন মরিয়মের জীবনে এই সম্মান বোধটুকুই তো মরিয়মের সম্বল–আশ্রয়। মতিন সে ইজ্জতটুকু পর্যন্ত জামাইয়ের কাছে রাখতে পারল না! এমনই বেআক্কেলে বেহড্ড সে। মতিনকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয় মরিয়মকে। বড়ো ক্লান্তি বোধ হয় তার। জীবনে না আছে শান্তি, না আছে সুখ, না স্বস্তি। মন তার খারাপ হয়ে যায়। সে ভাবে – "নির্জনে কোনো গাছ পেলে মনের কথা তাকেই শোনাত এমনই তার মনের দুঃখ।" – মরিয়মের এই উক্তিতে তার দুঃখবোধের চরিত্রটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে জানিয়েছে তার আকাঙ্ক্ষিত দুটি উপাদানের কথা। – একটি হল নির্জনতা এবং অন্যটি নির্জন পরিসরে কোনো গাছ। আমরা জানি মানুষ কখন নির্জনতা সন্ধান করে। যখন মানুষ চূড়ান্ত একা হয়ে যায় এবং আত্মসম্বিৎসহ আত্মজিজ্ঞাসায় উন্মুখ হয়ে ওঠে তখন সে নির্জনতা আকাঙ্ক্ষা করে। তাই মরিয়মের কাছে অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে নির্জনতা। অন্যদিকে প্রশ্ন জাগে কেন গাছ?

আসলে আমরা লোককথাও মৌখিক পরম্পরা সূত্রে জানি গাছ মানুষ তথা সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কত নিঃসঙ্গ মানুষের

দুঃখ–সুখের সাক্ষী সে; একই সঙ্গে নীরবও। সেই আবার আশ্রয়দাতা। তেমনিই মরিয়মের জীবনে যা কিছু ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণা, অপমান – সবই সে নির্জনে গাছকে বলবে। গাছের বড়োত্ব–মহিমাই একমাত্র পারবে তার যন্ত্রণাকে, তার দুঃখ কথাকে পরম মমতায ও ধৈর্যসহ শুনবে। সংসারে এক ধরনের মানুষ আছে যারা শুধু অন্যের জন্য সারাজীবন আত্মদীপ হয় আলোই দিয়ে যায়। অথচ নিজের কথা – দুঃখ অভাব – অভিযোগ – অনুযোগ শোনাবার মতো কোন জায়গা থাকেনা। মরিয়ম তিরিশটা বছরই শুধু পরিবারের জন্য খেটে গেল। একদিনের জন্যেও মতিন তাকে বোঝেনি। বুঝবার জন্যে কোন অবকাশ দেয়নি। তার মনকে গুরুত্ব দেয়নি। এইজন্যে মরিয়ম মনের কথা শোনাতে চেয়েছে গাছকে। যে কথা মনের গভীরে নিবিড় ভাবে সঞ্চিত আছে যে কথা কেউ বোঝেনি, সে কথা গাছকে শুনাতে চেয়েছে এমনই বিবিক্ত মরিয়ম।

আবার রান্নাঘর থেকে লক্ষ রাখতে হয় মেয়ে-জামাইয়ের ঘরটাকে, কেননা ঘর থেকে জামাই উঠোনে বেরোলে, নিজে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। তখন সে গায়ে ঢাকাঢুকি দিতে পারে; মাথায় আঁচল তুলে দেবার সময় পাবে। তা নাহলে অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হবে। সেই তো প্রথম জামাই। জামাইয়ের সঙ্গে সলব্ধ–সম্ভ্রমের দূরত্ব রাখা–একটি সংস্কৃতির মনোভঙ্গির পরিচয় সেটা মরিয়মের আচরণ ও উচ্চারণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতঃপর যেন ড্রামাটিক রিলিফের মতো গল্পের ঘটনার কিছু পরিবর্তন হয়। মেয়ে–জামাই যে ঘরে আছে, সে ঘরে একটা আড্ডার আবহ তৈরি হয়। মেয়ে–জামাইয়ের সঙ্গে আছে ছোটো মেয়ে সাবিনা। দুলা–ভাই আর শালির চলে খুনসুটি। এ করে সে ঘরে আসে মেজ শালাজ। উদ্দেশ্য – দুদণ্ড জামাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা – ইয়ার্কি করা। সে কাঁচা পোয়াতি। বারো দিন হল খালাস হয়েছে। মরিয়ম তাকে কাজ করতে দেয় না। তোলা–জল দেয়। কন্যা–সন্তান প্রসব করেছে। মেয়েটিকে

ঘুম পাড়িয়ে নন্দাইয়ের ঘরে খুনসুটি করতে গেল। মরিয়ম বলছে সে প্রসঙ্গে – ''করুক। যাক।'' – কথাকার অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে গ্রাম-নির্ভর জীবন যাপনের ছবি তুলে ধরেন এখানে। জামাই মানে আদরের ধন। শালাজ-শালি সকলেই মিলে টুকরো টুকরো ইয়ার্কি, আড্ডা চালাবে, – এটা প্রথালালিত বাংলার অভিন্ন সংস্কৃতি। একদিকে এই জামাই-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি, অন্যদিকে মরিয়মের বক্তব্যে মমতাময়ী মায়ের স্নেহ প্রশ্রয় অনতিপ্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। মেজো বউমা কাঁচা পোয়াতি হবার কারণে তার প্রতি যত্ন ও সেবার ত্রুটি নেই তার। 'তোলা ভাত–পানি দেয়।' দীর্ঘ বেশ কয়েক মাস গর্ভধারণের কারণে সেজ বউমা বেরোতে পারেনি; মন তার বদ্ধ হয়ে আছে। তাই জামাইয়ের সঙ্গে আড্ডা ইয়ার্কিতে মরিয়মের আপত্তি থাকে না; বরং ইতিবাচক সম্মতিই দিয়েছে।

মরিয়ম জানে " নিজের সংসারে নিজে রান্না করাটা হাতে রাখলেই সুখ।" মেজ বউ যেহেতু কাঁচা পোয়াতি তাকে দিয়ে সংসারের কোনো কাজ তখন সে করায় না, বড় বউ পুকুরঘাটে 'মাজাঘসা ও ধোয়াপাকলা' করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে শাশুড়ি মাকে সে রান্নার জোগাড় দেয়। কেউ কেউ রান্না বসিয়ে দেবে ---মরিয়মের সুখ নেই। আসলে এখানে নিজে রান্না করার নেপথ্যে রয়েছে স্পষ্ট অভিপ্রায়। প্রথমত দুই ছেলে মরিয়মের তেমন বড়ো রোজগারের কাজ করেনা। বড়ো ছেলে পাড়ায় পাড়ায় ঘট, সরা প্রভৃতি জিনিস ফেরি করে। আর মেজ ছেলে চাষা, জন খাটে। রোজগার কেমন হবে –এ থেকে বোঝা যায়। সেই রোজগারের সংসারে মরিয়ম চায় মেপেজুখে সংসার চালাতে। সেজন্যে রান্নার দায়িত্ব নিজে নিয়েছে। শুধু তাই নয় অন্য একটা দিকও এর পেছনে আছে তা বোঝার অসুবিধা হয় না। পরিবেশনে যদি মমতা না থাকে, তা হলে ক্ষুন্ন মন হবার সম্ভাবনা অনিবার্য। আর সেই মনক্ষুন্নতার কারণে সংসারে সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য নিশ্চিত। তারই পরিণতি পৃথগন্ন হওয়া। মরিয়ম এ সবই বোঝে। বোঝে বলেই তো এত পরিশ্রম করে রান্নার কাজটা হাতে রেখে সুখ অনুভব করে। এছাড়া অন্য একটি দিক একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

হাত গেলে ভাত যাবে। কাজে কর্মে সচল থাকলে শরীর–মনও সক্রিয় থাকবে। তাছাড়া সংসারে কর্তৃত্বটা হাতে রাখা যাবে। তিরিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে যে মতিন তাকে সামান্যমাত্র বোঝার চেষ্টা করেনি। তেমন গৃহিণীর ক্ষেত্রে সংসারের এরকম টুকরো টুকরো কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে যন্ত্রণা গেলা ছাড়া আর কোন পথ আছে?

অভাবের সংসারে সবদিক থেকে যাতে আয় রোজগার হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয় মরিয়মের। যাতে দুটো পয়সা হাতে আসে। তাই বোনের কাছ থেকে সাতদিনের বাচ্চা এনে বড় করছে। সেটা আবার পোয়াতি হয়েছে। বিদগ্ধজনেরা অবশ্য এর মধ্যে উর্বরতার সংস্কৃতির সন্ধান করতে পারেন; কিন্তু সহজভাবে বোঝা যায় এই ছাগল পোষানি নেওয়ার মধ্যে সংসারে অর্থাগমের দিকে মনোযোগ মরিয়মের টনটনে। কিন্তু অন্য একটি দিকও অনতিপ্রচ্ছন্ন; – বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে হাঁস–মুরগি পশুপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ভূমিকা রাখে। বিশেষত নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে এরকম দু-একটি করে ছাগল গরু পোষা এবং মাঠের ঘাস–বিচুলি, লতা–পাতা দিয়ে তাদের খাদ্য যোগানো অতিপরিচিত ছবি। মুসলমান সমাজে এছবি তো আরও স্পষ্ট; অন্তত গ্রামীণ সমাজে। মরিয়মের – "এই সব নিয়ে তার সংসার।"

জামাই আলতাফকে দেখি শালি সাবিনার কোনো একটি কথার প্রসঙ্গে 'খপ করে' হাত ধরতে। এই হাত ধরাটা নির্জনে নয়, বউ ও শালাজের সামনে। সাবিনা শালিক পাখির মতো চেঁচামেচি জোড়ে তাতে। আরও জানাচ্ছেন, –

"জারনা তক্তপোশে বসে পা দুটি নিচে নামিয়ে দিয়ে দোলাতে থাকে। মেজ বউ সাধনার অন্য হাতটা ধরে টানছে। হাসির-হবরা আর দাপাদাপি ঘর জুড়ে।"

লক্ষণীয়, কয়েকটি দিক এই পরিস্থিতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। জামাইবাবু এবং শালির মধ্যেকার প্রীতিপ্রসন্ননের সম্পর্কটুকুও অতি মসৃণ থাকে না, বরং একটু

কর্কশকতার অভিমুখী ঠাট্টা-ইয়ার্কি আবহ; তা না হলে লেখক 'খপ করে' শব্দদুটি ব্যবহার করতেনই না। যেন নারীকে চাপিয়ে দেওয়া যায় পুরুষ আধিপত্যের ক্ষমতা। সে কারণে সাবিনার শালিক পাখির মতো চেঁচামেচি। বড়ো বোন জরিনার তক্তোপশে বসে পা নামিয়ে দোলাতে থাকার মধ্যে একদিকে যেমন আছে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে তার উদাসীনতা, অন্যদিকে বাপের বাড়িতে এরকম একটা আবহে মানসিক প্রশান্তির পরিচয়। আবার কিছুটা কষ্টকল্পনা হলেও এরকম ভাবনা একেবারে অসংগত হবে না ; যে সাবিনার হাত ধরা আর জরিনার পা দোলানো – এই ঘটনা দুটি নিছক দুর্ঘটনামাত্র, নাকি দুটি ঘটনার মধ্যে একটি নেতিবাচক ইশারা প্রচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছেন কথাকার? চেয়েছেন বোধ হয়। কেননা আমরা জেনেছি "The foot is the primitive sexual symbol already found in myth." ফ্রয়েড–এর অপরিচিতি এই উক্তিটি যেন এই ঘটনার মধ্যে সূক্ষ্ম যোগসূত্র রচনা করে। আর মেজ বউ সাবিনার অন্য হাত ধরে যখন টানে তখন এক ধরনের নিষেধকে জানান দেওয়ার ইচ্ছে বৈকি! হাসির হররা আর দাবাদাবি চলতে থাকে ঘরজুড়ে। তখন অন্তঃপুরের চালচিত্রটা যে কি তা বুঝতে ভুল হয়না পাঠকের।

ঘষা–মাজা করে আনা থালা-বাসনগুলো নিয়ে বড়ো বউ রান্নাঘরে ঢোকে। চার বছর তার বিয়ে হয়েছে। এখনো পর্যন্ত সে পেটে ছেলে ধরেনি। বাসন-কোসন রেখে বড়ো বউ ধোয়া–পাকলা অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন কাপড়গুলো বাড়িতে টাঙানো দড়িতে শুকোতে দিতে গেল। আমরা লক্ষ করছি বড়ো বউ–এর কিন্তু অবসরের কোনো ফুরসত নেই-ই। শাশুড়ির হাতে হাতে জোগান দেওয়া, ধোয়াপাকলা করে দড়িতে মেলা–ইত্যাদি। এর উল্টোদিকে দেখি কাঁচা পোয়াতি মেজ বউকে তোলা ভাত–পানি দেওয়া হয়, নন্দাইয়ের ঘরে খুনসুটি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। মেজ বউ–এর কথা যদি ছেড়েও দিই তাহলে এখনও থাকে মরিয়মের দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ে জরিনা বাপের বাড়ি এসেছে তার দেওয়া দরকার। ছোটো মেয়ের সাবিনা কি মায়ের হাতের কোন কাজ করতে পারত না? না, তাকে নিয়ে কোন কাজ করতে চাইনি

মরিয়ম। সে তো একদিন শ্বশুরবাড়ি যাবে। বড়ো বউ বিয়ের চার বছরের মধ্যে যেহেতু কোনো ছেলে পেটে ধরলো না, সে কারণে তার প্রতি সূক্ষ্মভাবে এক ধরনের বিরূপতা আছে মরিয়মের। তা না হলে একবার ঘরের কাজ একবার ধোয়া পরিষ্কার করানো – সবাই তো চলছে। সকলের তো শরীর। তার কি কোনো কষ্ট হয় না? আসলে গর্ভধারণ করেননি বলে সূক্ষ্ম একটি রাগ, সাংসারিক কূটবুদ্ধি মরিয়ম প্রয়োগ করে। কথকের একটি বাক্যে সেই বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তোলে। –"সবদিকে নজর আছে মরিয়মের।" আসলে এই 'সবদিকে' শব্দবন্ধটি মরিয়মের মনোভঙ্গিকে আর প্রচ্ছন্ন রাখে না, বরং স্পষ্ট করে তোলে। না হলে অর্থহীন হয়ে যেত অনুচ্ছেদে শেষ বাক্যটি – "সংসারের মধ্যে এক মনোরমতা আছে।"

এরপর আমরা দেখি বাইরে থেকে মতিন মেয়ে সাবিনাকে ডাকে। বাইরে থেকে ডাকার মধ্যে পারস্পরিক শালীনতার ব্যাপারটা বোঝা যায়। জামাই–মেয়ে বউমার আড্ডার আবহে তার প্রবেশ রুচিকর হবে না। তাই। কিন্তু সাবিনা বেরিয়ে এলে মতিন যা বলে তা শুনে মাথায় যেন বজ্রপাত হয় মরিয়মের। মতিন বলে – "জামাইয়ের পকেট থেকে পয়সা লিয়ে যা ত মা বিড়ি কিনতে।" কান খাড়া করেছিল মরিয়ম, লোকটা কী বলে মেয়েকে শোনাবার জন্যে। শুনে বুক ফেটে যায় মরিয়মের। মরিয়ম বলেই ফেলে – "কি বলে বেআক্কেলে লোক!" জামাইয়ের কাছে পয়সা চেয়ে নেশার বিড়ি কেনা – ভাবতেই পারে না যে। মান ইজ্জত সব ধুলোয় মিশে গেল। সাবিনা বোনাইয়ের পকেট থেকে পয়সা নিয়ে বিড়ি কিনতে চলে গেলে মরিয়ম সাবিনার উদ্দেশ্যে গাল দিয়েছে – "বাপ ভাতারি মেয়ে" বলে। এই গালের অর্থ তলিয়ে ভাবলে অত্যন্ত লজ্জাকর। বাপ–মেয়ের অবৈধ শারীরিক সম্পর্ককে বোঝায়। কিন্তু মরিয়ম অত তলিয়ে ভেবে মেয়েকে গাল দেয়নি। সাধারণ লোকসমাজে মহিলাদের মুখে মুখে যে সব গালাগাল লেগে থাকে অভ্যাস বসে তেমনই একটি খারাপ শব্দ প্রয়োগ করেছে মেয়েকে। এতে বরং সমাজচিত্রটা অনেক বেশি বিধ্বস্ত হয়ে ওঠে। লেখকের মুনশিয়ানা এখানে প্রতিভাত।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে লেখক আবার ফিরিয়ে আনেন পাখির প্রসঙ্গ ও মনোরমতার আবহে। – "পাখিটা বুঝি আবার ডাকে। সংসারের মনোরমতাকে আরো বাড়িয়ে দেয় পাখিটা।

ঘাট, অপান বাগান জুড়ে ছড়ায়। পাখিটার অবস্থান খুঁজে বেড়ানোর অবকাশ নেই মরিয়মের।"

সন্দেহ নেই, পাখিটার আবার ডাক আসলে মরিয়মের ক্রম উদাসীন মনোভুবনকে উন্মোচিত করছে। গ্রীষ্মের সেই অগ্নিময়তার দিনে উনুনশালে যেখানে আগুনের জ্বলুনি আছে, সেখানে তো আছে মুক্তি প্রত্যাশী মনের ছটফটানি। পাখিটা তখন কেবলমাত্র বাস্তবের পাখি থাকেনা। একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পাখি। এই পাখিটাই সংসারের মনোরমতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কীভাবে? আসলে পাখি তখন মানুষের উন্মুক্ত সঙ্গচেতনার প্রতীকী রূপায়ণ হয়ে উঠেছে। যে মন সঙ্গকাতর, বিবিক্ত, সেই মনকে আশ্রয়ের আশ্বাস বয়ে আনে এ পাখি। চারিদিকে দেখেছি আনন্দ আবহ। মেয়ে-জামাই-বৌমা- আড্ডা দিতে ব্যস্ত সেই শুধু সাংসারিক প্রাত্যহিতকার কাজে ফুরসত পাচ্ছেনা। তার মনের মানুষটিও সম্ভ্রমহীন, আত্মমর্যাদাহীন একটি অস্তিত্ব মাত্র। সুতরাং সেই মরিয়মের মধ্যে সঙ্গ লিপ্সার এক অনিঃশেষ হাহাকার জায়মান। ভরা সংসার তাই তার এমন মনোরম লাগে। আসলে 'মনোরমত্তা' শব্দের মধ্যে আছে দুটি শব্দের আভাস। একটি মন, অন্যটি রমতা। 'রমতা'-রমণীয়তার ধ্বনি সাম্যকে মনে করিয়ে দেয়। পাখিটার অবস্থান খুঁজে বেড়ানোর জীবনে নেই বলে আমরা জানছি। অর্থাৎ পাখিটার ডাক যেখান থেকে আসছে, সেখানে যাবার মত ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য ও পরিস্থিতি – কোনটাই নেই তার। সংসার কেন্দ্রে বার বার ফিরে আসতেই হবে তাকে। এমনকী মনের মধ্যে যে পাখিটা বাস করে, ইচ্ছাকে মরিয়ম রক্তমাংসের শরীরে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে, যে ইচ্ছার স্বরূপ কেমন, তাও উপলব্ধি করার অবকাশ বা সুযোগ তার জীবনে

আসবে না। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে এমনই আবর্তিত হতে হবে, যেমন আবর্তিত হতে হয় আর পাঁচজন মুসলমান সমাজের সাধারণ নারীর।

সেই অবকাশ মরিয়মের মতো নারীদের জীবনে আসতে দেয় না মতিনের মতো স্বামীরা। বেয়াক্কেল সে মতিন আঙিনায় বসে জামাইয়ের দেওয়া পয়সায় আনা বিড়ি খাচ্ছে। একটু রাগারাগি করলেই সে হুগলি জেলায় ইমারতি করতে চলে যাবে। মরিয়ম তাই আর রাগারাগি করে না। বরং সে চায় – "না। থাক। একটু উল্টোপাল্টা করছে করুক কিছু বলবে না।" এতে রাগে গোপনভাবে নিজের কলজে ছিঁড়তে থাকে মরিয়ম। সংসারের সব গরল আত্মসাৎ করা ছাড়া মরিয়মের অন্য কোনো উপায় থাকে না।

মরিয়ম আঙিনায় এসে মতিনকে গোসল করতে যাওয়ার নির্দেশ দিলে উল্টে মতিন জানতে চায় যে গোসল করে এলেই সে ভাত পাবে কি না। মরিয়ম তাতে ইতিবাচক উত্তর দেয়। তাতেই প্রশ্রয় পেয়ে যায় মতিন। তৈরি হয় প্রেমের এক যাপন পরিস্থিতি –

'রাগ করছিস, আমার উপর?'

'না তো।'

'পিঠ চুলকাচ্ছে খুব, একটু ঘামাচি মেরে দিবি।'

'এখন কী করে পারব?'

'ও তাই ত।' বিড়ি টানতে থাকে মতিন।

লক্ষ করার বিষয় নারীর অন্তর্মনে নিহত রমণীয়তার আকাঙ্ক্ষাকে কথাকার আফসার আমেদ আড়াল করেন নি। সেই দিকটা তুলে ধরার জন্যে পাখির প্রসঙ্গটিকে ভূমিকা বা গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কথোপকথনটিতে মরিয়ম রাগ করছে কি না মতিন জানতে চাইলে মরিয়মের স্বরভঙ্গি বদলে গিয়েছে। মনোভঙ্গির কারণে এই বদল। কথা তাই সংক্ষিপ্ত "না ত।" শুধু 'না' বললে বোঝাত একটি অন্তর্শায়ী

অভিমানের কথা। কিন্তু তার সঙ্গে একটি মাত্র বর্ণ 'ত'-এর ব্যবহার বুঝিয়ে দিচ্ছে মরিয়মের প্রশ্রয় আছে মতিনের প্রতি। মতিন-এর পরে একটু ঘামাচি মেরে দেবার কথা পাড়লে মরিয়ম জানিয়েছে 'এখন কী করে পারব?' অর্থাৎ ঘামাচি মেরে দিতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু সময়টা অনুকূল নয়। আর ঘামাচি মারা আসলে প্রেমের খুনসুটি যাপনের ইঙ্গিত তো! প্রিয়জন – সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন সামান্য ব্যথা দিলে বেশি করে বুকে বাজে। সে ব্যাথা মতিনের বুকে বেজেছে। মরিয়ম বুঝতে পারে। মতিনকে সে চিনবে না তো আর কে চিনবে! তিরিশ বছরের দাম্পত্য যাপন। মতিনের এমন বেয়াড়া আবদার মেটানোর ফুরসৎ নেই এখন মরিয়মের। তবে মরিয়ম জানে কী-ভাবে মতিনের রাগ ভাঙাতে হয়। মরিয়ম তাই ঘরের ভেতর থেকে পান সেজে এনে একটা পান নিজে খায়, অন্য খিলিটা মতিনকে বাড়িয়ে ধরে। মতিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাতে। পান খাওয়া একেবারে স্বাভাবিক ঘটনা বাংলার গ্রামীণ জীবনের পরিসরে। কিন্তু দম্পতির টুকরো অভিমানের পরেই পানের প্রসঙ্গ তীব্র জীবন সংরাগের আবেশ প্রেক্ষিত তৈরি করেছে।

অতঃপর সাবিনা নুন, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে বোনাইকে কাঁচা আম খাওয়াবে বলে রান্নাঘরে ছুটে এসেছে। এসেই সে মাকে জিজ্ঞাসা করেছে –"ও মা চাচা এল?" প্রথমটায় ভালো করে কান না দিলেও যখন মরিয়ম জানতে পারল বোম্বের 'নিশার চাচা'-র কথা, তখন মরিয়মের খুশিতে ভরে যায়। তাদের পাশের বাড়ির মরিয়মের চাচাতো দেওর। বোম্বেতে দর্জি লাইনে কাজ করে। প্রায় আটমাস পরে ফিরল। বুকের ভেতরটা মরিয়মের কেমন ধক করে উঠেছে এই নিশার ফিরে আমার আশার সংবাদে।

এই নিশার-এর সঙ্গ-সাহচর্য ও প্রসঙ্গের ভিত্তিতে মরিয়নের অন্য একটি পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। মরিয়মের যে শূন্য জীবন অনেকখানি ফাঁকা থাকে, তার অনেকখানি জুড়ে থাকে নিশার। কথকের উচ্চারণে :

"এই দেওরটাকে কতদিন না দেখে তাকে থাকতে হয়। আর এই দেওরটার সঙ্গে মরিয়মের ভাব। বম্বে থেকে ফিরলে সারাক্ষণ এখানেই কাটায়। মাঝে মাঝে চা করে দেয় আর পান খাওয়ায়। মরিয়ম সংসার কী করল, এসব গল্প শোনাতে ভালোবাসে।"[৩]

----মরিয়ম একাই শুধু শোনায় না। নিশারও নানা গল্প শোনায় মরিয়মকে। বোম্বে থেকে ফিরে এলে নিশারের সঙ্গে গল্প করে বেশ কাটে মরিয়মের। লেখক এর বর্ণনায় :---

"মরিয়মের মনের ভেতরটা আনন্দে ছেয়ে যায়। বেশ ফুরফুরে হয়ে ওঠে। মনটা ভেতরে ভেতরে ছটফট করে। নিশারের সঙ্গে তার কোনো খারাপ সম্পর্ক নেই। কথা বলার সম্পর্ক। ...আসলে সঙ্গ পেতে ভালোবাসে মরিয়ম। অনেক সময় যেমন মতিনের সঙ্গ পেতে ভালবাসে মরিয়ম। ...মরিয়মের চাওয়াটা মরিয়মের উপর নির্ভর করে।"[৪]

-----উপরে উদ্ধৃতি দুটো একটু প্রভিনিবেশ সহ অনুধাবন করলে দেওর ভাবির মনোজগৎ বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে আমাদের কাছে। এই নিশারকে কত দিন না দেখে মরিয়মকে থাকতে হয়। অর্থাৎ শারীরিকভাবে দূরে – বম্বে থাকে বলে মরিয়ম দেখতে পায় না নিশারকে। যদি সম্ভব হত নিয়ত দেখার সুযোগ, তাহলে প্রতিদিন সর্বক্ষণ দেখতো তাকে। যেমন বোম্বে থেকে ফিরে এলে নিশার পড়ে থাকে মোরিয়াদের বাড়িতে। নিশার বিবাহিত। তার বউ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায় মরিয়মদের বাড়ি নিশার থাকাকালীন। মরিয়ামের মনের ভেতরটা নিশারের উপস্থিতিতে আনন্দে ছেয়ে যায়। ফুরফুরে হয়ে ওঠে। এই সম্পর্কটাকে তাহলে কোন বিশেষণে আখ্যাত করা যায়? সম্পর্কটাকে চিহ্নিত করার আগে লেখকের একটি কথার দিকে আমাদের মন আটকে যায়। আমরা কি জানতে চেয়েছি নিশারের সঙ্গে

মরিয়মের কোন খারাপ সম্পর্ক আছে কি না? আর খারাপ সম্পর্ক বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

সম্পর্ক আসলে খুব গভীর। কেননা আমরা জানি –"ভালোবাসা মানে শরীর বিস্মৃত ঘুম পাশাপাশি।" দাম্পত্য চার্যার ভালোবাসা। এবং সাধারণীকৃত শব্দ ভালোবাসা–দুয়ের মধ্যে ব্যবধান দ্বিমেরুর বিষম। মানুষ স্বভাবত সঙ্গ কাতর। তার মনের গভীরে রয়ে গেছে সঙ্গ-যাপনের চিরন্তন আকুতি। সঙ্গ মনের মধ্যে জন্ম দেয় বন্ধুতার অনুভবের। সেই অনুভব ধীরে ধীরে পারস্পরিক উপলব্ধিতে প্রেমে উত্তীর্ণ হয়। মরিয়মের সঙ্গে যদি তেমন সম্পর্ক নিশার না থাকত তাহলে লেখককে উপযাচক হয়ে বলে দিতে হত না দুজনের কোন খারাপ সম্পর্ক নেই। এ যেন ঠাকুর ঘরে কে, এবং আমি তো কলা খাইনি বাস্তবতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু মুসলমান সমাজ এ গল্পের প্রেক্ষিত, এবং মতিনের মতো স্বামী যে মরিয়মের, সেখানে যুক্তকণ্ঠে ভালোবাসার কথা বলা কিংবা একেবারে চুপ করে যাওয়াও তো মৌন থাকা। যা স্বীকৃতির নামান্তর। সে কারণে লেখককে একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সাহস দেখাতে পারেন নি। তা না হলে এ কথাটির কী মানে দাঁড়ায়?

"অনেক সময় এমন মতিনের সঙ্গ চায় মরিয়ম। একটু আগে যেমন চাইছিল, চাওয়ার মন সে পেতে রেখেছিল।"

আর তাছাড়া, – "সংসারে সকলের সাক্ষাতেই তাদের কথা চলে, ঘন্টার পর ঘন্টা" ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কি কথা থাকতে পারে? কত কথা থাকতে পারে? দুজন মানব-মানবী কীসের আকর্ষণে এমন অনবিচ্ছিন্ন ভাবে দুজনের সঙ্গ দিতে পারে?

খারাপ সম্পর্ক বলতে আফসার আমেদ কী বোঝাতে চেয়েছেন? প্রেম? যৌনতা? যদি ধরেও নিই তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে হয় প্রেম খারাপ সে কথা কে বলবে? পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত যে সম্পর্কের বন্ধনগুলো রয়ে গেছে তার মধ্যে

সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন প্রেমের বন্ধন। সে স্বকীয়া হোক কিংবা পরকীয়া। প্রেমই সেই আশ্চর্য সম্পদ, ক্ষয়হীন আশা, মৃত্যুহীন মর্যাদা, যা যুগ যুগ ধরে সভ্যতাকে সচল রেখেছে। আর যদি পরকীয়া হয় তবে আমরা এ উপলব্ধিকে মিলিয়ে নিতে পারি কবি জয় গোস্বামীর 'কলঙ্কের আমি কাজলের' কবিতার সঙ্গে –

"কলঙ্ক, আমি কাজলের ঘরে থাকি
কাজল আমাকে বলে সমস্ত কথা
কলঙ্ক আমি চোট লেগে যাওয়া পাখি
বুঝিনা অবৈধতা।"

আর যদি খারাপ সম্পর্ক বলতে যৌনতাকে বুঝি, তাহলে এখানেও জিজ্ঞাসা আছে আমাদের। যৌনতায় বিষয়টা সব সময় পবিত্র ও শুদ্ধ; তা যদি দুটি মনের পূর্ণ সমর্থনে ঘটে থাকে। কেননা জীবের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে যৌনতা অপরিহার্য। সেই যৌনতা পবিত্রতায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় যদি দুজন তা সে যে কোন বয়সের পূর্ণ নর–নারী যদি হয়। প্রসঙ্গত মনে পড়বে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে বোল্যয়র–এর কথা। ----"শুধু তা-ই পবিত্র যা ব্যক্তিগত।"

নিশারকে আলাদাভাবে বসতে দেবার মতো ঘর নেই মরিয়মদের সংসারের নানা কথা মরিয়মের পেটের ভেতর ফুটছে। নিশারেরও সব কথা জমা আছে। মেয়ে জামাই থাকলে অবসরে তাদের তো কথা বলার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। আর তাছাড়া যখন তারা কথা বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে। তাদের সে কথা মেয়েরা শুনে জায়। বউরা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে যায়। পাড়ার লোকের নানা কাণ্ডকারখানার খবর মরিয়ম দেবে। তাতে মরিয়মের চমৎকার মন ভালো থাকবে। কিন্তু নিশার জন্য মরিয়মের ভেতর অস্থির হয়ে ওঠে। সারাক্ষণ তোলপাড় হয়ে চলেছে মন। নিশার প্রতিবারই বোম্বে থেকে চেহারায় অন্যরকম হয়ে ফিরে। হয় চুলের ধরন বদলায়। স্বাস্থ্য ভাল হয় না হয় রোগা হয়। এই মুহূর্তে নিশারকে দেখার

জন্য তাই মরিয়মের মন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। তারপরেই কথাকার জানান মরিয়মের সম্পর্কে –

"হাঁড়িতে চামচ অস্থির ভাবে নাড়ে। হাতের অস্থিরতায় থালাবাসন ঝনঝন করে পড়ে যায়। বুকের ভেতর ভারি নিঃশ্বাস ধাক্কায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য-এর এই কথাগুলো আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে পড়ে না কি? – আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। / বাঁশির শবদে মোর আউলাইন রান্ধন।" তিরিশ বছর মতিনের সংসার ঘর করার পরও মরিয়মের নিশার সম্পর্কে অনুভূতি এমন, তাতে প্রেম ছাড়া কীই বা বলা যেতে পারে? "

একটু যে উঠে জানালার ঘুলঘুলি দিয়ে নিশারদের আঙিনায় চোখ রাখবে তার অবকাশ নেই মরিয়মের। কেননা, সে তরকারি কষছে। একটু সরে গেলে পুড়ে যাবে তরকারি। শব্দটার লক্ষ করার মতো। পুড়ে 'যাবে পুড়ে যেতে পারে' বলেন নি কথক। অর্থাৎ একবার জানলার ঘুলঘুলিতে চোখ রাখলেই এমনই আবিষ্ট হয়ে পড়বে মরিয়ম তরকারি দিকে তার খেয়াল থাকবে না। তার সমস্ত চিন্তা চেতনার জগৎজুড়ে অধিকার করে আছে নিশার। কিন্তু মরিয়ম তা করেনা। সে জানে সংসার কী কঠিন জায়গা।

কচি কচি ছেলেপুলে নিয়ে, নিজের গতরের জোরে সে সংসার চালিয়ে এসেছে এতদিন। মতিন সংসারের কাজে কোনদিনই লাগেনি----

"ঝোড়া চুবড়ি বুনে, তলায় পাটি বুনে, জ্বালুন কুটো কুড়িয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছে নিজেই মরিয়ম। নিশার জানে, তখন থেকেই নিশারের সঙ্গে কথা বলে মনে সুখ পেয়েছে মরিয়ম। এখন সংসার ভরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে। ছেলেরা বড় হয়ে রোজগার করছে।"

নিশার-এর সঙ্গে মরিয়মের এই সঙ্গ-সম্পর্ক অনেক দিনের। এই নিশারই তার অনিঃশেষ দুঃখময় নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গের পরশ দিয়ে সুখী করে রেখেছে। আজ

মরিয়মের মনে প্রশ্ন জেগেছে – "সে ভাল শাড়ি পড়ে নেই; গায়ের বাস সাবান মাখেনি কতদিন? এখন তার মনে হয় তার মন ভালো থাকার জন্য নিয়মিত গায়ে বাস সাবান মাখার দরকার। নিশার এসেছে বলে নয়। ভালো শাড়ি পরলেও মন ভাল থাকে। মনকে যত্নে রাখার কত কথা উদয় হয় মরিয়মের মনে। মন একটু গুছনো না থাকলে চলে!"

মরিয়ম একা খেটে, বুদ্ধি দিয়ে সংসারকে আজ দাঁড় করিয়েছে। এতদিন নিজের সখ-আহলাদের দিকে তাকাবার সুযোগ ছিল না। ছেলেরা বড় হয়ে রোজগার করছে। এই সময়ে প্রায় আট মাস পরে ফেলল দেওর নিশার। এখন তার ইচ্ছে হয়েছে একটু বিলাসিতা করার। সারা জীবন তো যেমন তেমনভাবে কাটিয়েছে। এবার মরিয়ম নিজের দিকে তাকাবার কথা ভাবতে শুরু করেছে। গায়ে বাস সাবান, নিজে একটু গুছনো থাকা ইত্যাদি। সংগত কারণে প্রশ্ন জাগে আজ এতদিন পর এ বাসনার উদয় কেন হল মরিয়মের মনে? এমতো পরিস্থিতিতে পিছন ফিরে আঁতকে উঠতে গিয়ে থেমে যায় মরিয়ম। গায়ের কাছে চুপিসাড়ে এসে মতিন বসেছিল। মরিয়ম জানতে চায় –

> "'তুমি আমার গায়ের কাছে এসে বসলে কেন?'
>
> 'খেতে দিবি যে? গোসল করে এনু?'
>
> 'এখন? এখন তোমাকে খেতে দেবে? রান্না শেষ হয়নি, জামাইকে খেতে দিইনি, তোমাকে আগে খেতে দেব?' 'এখানে আর একবেলা থাকলে ত, তোর রান্না ভাত খান নি? খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়ব খানাকুল।'
>
> 'তাই যেও।' রাগত স্বরে দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে মরিয়ম।"

নিপুণ, মর্যাদাময় শাশুড়ি হিসেবে জামাইকে খেতে না দিয়ে আগে স্বামী মতিনকে খেতে দিতে চাইনি মরিয়ম। তাতে তার স্বাভাবিক যুক্তিবোধ স্পষ্ট হয়েছে। আত্মীয়কে আগে তোয়াজ ভক্তি করা বাংলা সনাতন রীতি। সেদিক থেকে মরিয়ম অন্যথা করতে

চায়নি। কিন্তু মরিয়মের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করায় মরিয়মের রাগ হয়েছে বুঝে মতিন অভ্যাসমতো বসে বসে পা ঘসে। এতদিন মতিন রাগ দেখালে মরিয়ম তাকে আটকাতে চেয়েছে। কিন্তু আজ মরিয়ম রাগ প্রশমিত করলো না। ফলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মতিন।

এখন আর মতিনের অত অভিমান বোঝার ইচ্ছে মরিয়মের নেই। যেটুকু পারে তা হলে এক্ষুনি তাকে খেতে দিতে। তাই রান্না শেষ না করে মতিনের জন্য ভাত বাড়তে থাকে। এমন সময় সাবিনা এসে মরিয়ম এর পেছনে এসে দাঁড়ায়। বলে –

'মা, আব্বা খানাকুলের চলে যাবে বলে ব্যাগ গুছুচ্ছে।'

'ভাত বেড়ে দিয়েছি, খেতে দাও গে যাও।'

'মা আব্বা চলে যাবে?'

'জানি নি আমি কিছু।'

এরপর সাবিনা ভাত নিয়ে চলে যায়।

অবশেষে হাতের কাজ শেষ হয় মরিয়মের। একটু পরেই সে পুকুর ঘাটে যাবে। সঙ্গে নেবে এক ডেলা বাস সাবান আর একটা তোলা করা শাড়ি। কথাকার এরপর জানান, – ''পুকুরের জলের জন্য শরীরটা ছটফট করছে।''

– গল্পের শেষ বাক্যটা আশ্চর্য দ্যোতনামন্ডিত। মরিয়মের শরীরপুকুরের জলের জন্য ছটফট করছে। কেন না, আজকে সে নিশ্চিন্তে পুকুরের জলে নেমে ইচ্ছে মতো বাস সাবান মাখবে গায়ে। গা থেকে সুগন্ধি বেরোলে মনটাও তাজা হয়ে উঠবে। আর স্নান সেরে গায়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে নিয়ে সে পড়বে বগলদাবা করে নিয়ে যাওয়া তোলা করা শাড়ি।

এই অংশে এসে সংগত ভাবে আমাদের দায় থেকে কৈফয়ত দেবার। মরিয়মের এই রূপান্তরের নেপথ্য চালক কে? নিঃসংসায়িত ভাবে আমরা বলতে পারি নিশার। নিশারের ফিরে আসা থেকে আমরা লক্ষ করেছি তার সঙ্গ পাওয়ার জন্য মরিয়মের মনের মধ্যে কী অধীর আগ্রহ। শুধু তাই নয়, তার সামনে নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে, সুবাসিত অঙ্গ সৌরভ নিয়ে মরিয়ম উপস্থিত হতে চেয়েছে। কিশোরসুলভ এই উদ্বিগ্নতা ও চঞ্চলতা কাদের মধ্যে দেখা দেয় আমাদের বুঝতে বাকি থাকেনা। তিরিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে যে সঙ্গ কোনদিন পায়নি মরিয়ম, আজ সেই সঙ্গ পাওয়ার জন্য সে উন্মুখ। বয়স কোনো বাধা নয়।

সর্বোপরি একথা সত্য যে প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি থাকা, পরস্পরকে বোঝা এবং উভয়ের জন্য পথ চেয়ে থাকবে এবং সময় দেবে। সং-গল্পে নিশার আর মরিয়ম পরস্পরকে সময় দিয়েছে, প্রতীক্ষা করেছে। এমনকী বৈষ্ণব পদাবলীর বালিকা রাধার মতো মরিয়ম প্রেমিকের জন্য নিজেকে সুগন্ধি সাবান দিয়ে তাজা করেছে, মন ভালো করার জন্য তোলা শাড়ী পড়েছে। একে প্রমানুভব ছাড়া আর কোন অভিধায় চিহ্নিত করা যেতে পারে?

বস্তুত, প্রেমেই, পরকীয়া প্রেমই গল্পের শেষে কথাকার আফসার আমেদ অন্তঃপুরবাসিনী মরিয়মের মধ্য দিয়ে ফোটাতে চেয়েছেন। কিন্তু সময়টা যেহেতু আজ থেকে সাতাশ বছর আগেকার সময়, তাই এ গল্পের নাম 'সঙ্গ'-ই রাখতে হয় তাঁকে। আর তাতেই অন্য মাত্রায় ভাষা নারীর পায় অন্তঃপুরের উদ্ভাস।

গ্রন্থপঞ্জি

১। চক্রবর্তী, সৌমিতা, সৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে নজরুল, পুস্তক বিপণি, মে, ২০০৭। ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ৯, পৃ. ৫৮

২। আমেদ আফসার, শ্রেষ্ঠগল্প, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৮, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

৩। তদেব ৪। তদেব

চি ত্ত র ঞ্জ ন ন স্ক র

বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা : ধর্মমোহ জনশ্রুতি ও মুসলমান সমাজের অন্তরমহল

বিশ শতকের আট-নয়ের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে যাঁরা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক আফসার আমেদ (১৯৫৯ - ২০১৮) তাঁদের অন্যতম। মূলত মুসলমান জীবনের কথাকার তিনি। তাদের ধর্ম - ভাষা – সংস্কৃতি, তাদের নরনারীর প্রেম, তাদের ধর্মীয় জীবন – রীতি - নীতি - ধর্মের বিরোধ তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। তিনি নিজেই বলেছেন -

'মুসলমান সমাজ নিয়ে কাজ করেছি, যা অনালোচিত ও অনালোকিত - এই চেষ্টার পথশ্রমটুকু সাক্ষী হয়ে থাক'। (দ্র. 'গাধা'- সম্পাদক - মলয় সরকার)

হ্যাঁ। এই মুসলিম সমাজের বহুবর্ণ মানচিত্র আফসার আমেদের বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখি পাখির 'কিস্‌সা' (১৯৯৫)। 'কিস্‌সা' অর্থাৎ কাহিনি - কুৎসামূলক গল্প।গল্পের কথাবৃত্ত অনুসারে আমরা জানতে পারি- ভাসুরঝি নাহারকে নিয়ে তিনি পুকুরে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে গা থেকে শাড়ী খসে যায় জাহানের। খুঁজে না-পাওয়ায় শায়া-ব্লাউজ পরেই বাড়ি আসে জানান। কেউ না দেখলেও মুশুল্লি নাসিম এই ব্যাপারটি ঘোরতর অন্যায় হিসেবে দেখে এবং রাতে ঝগড়ার পর জাহানকে চড় মারে, - 'শুয়োরের বাচ্চি' বলে। ভোরবেলা জাহান নাসিমকে ছেড়ে ফজরের আগেই চকমধু থেকে পাঁচ কিমি দূরে সজনেতলায় বাবার বাড়িতে পৌঁছায়। ফাল্গুন মাসের চন্দ্রালোকিত ভোরে ঘর ছাড়ে জাহান।

এরপর উপন্যাস এগিয়েছে নাসিম-এর চিন্তাভাবনার সূত্রে - তার শারীরী আলিঙ্গন-কামনার প্রার্থনায়। মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে মৌলবী ইমাম আজমত আলির সঙ্গে দেখা হয়। কথা প্রসঙ্গে আজমত আলি তার স্ত্রীর চলে যাওয়ার কথা জানতে পারে। সরল বুদ্ধির, মোটা বুদ্ধির নাসিমাকে নিজের জালে জড়াতে শয়তানি চাল চালে আজমত। জাহান চলে যেতে নাসিম এক 'অজ্ঞেয় বিপন্নতার, শিকার হয়'। সরল গ্রামীণ মুসলমান ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে ভাবতে থাকে 'জিন পরীর খপ্পরে পড়েছে নিশ্চয়'। আজমত তার লোক বিশ্বাস থেকে নাসিমকে ভয়ার্ত করে তোলে - 'কুনু নারী তোমার দিকে তাক্কে হাসে নাকি ? ... পরে হাসবে তক্কে তক্কে। ভুলাবে।

মহব্বৎ কত্তে চাইবে। জেনা করতে চাইবে। তুমাকে তিনদিন পর জানাব, খোয়াবনামা দেখে। যাও ছোট মিঞা'।

অজানিত এক বিপদের আশঙ্কায় শিহরিত হয় নাসিম। তার পক্ষে বিবিকে ছেড়ে থাকা খুবই দুঃসাধ্য। অসহনীয়। বড়ো ভাবি রাবেয়াকে জানায় তার কষ্টের কথা। এমনকী দুঃস্বপ্নের কথাও – 'নিদে নিদে স্বপ্ন দেখি, বদ। আমি নিজে খারাপ হতে চাইবুনি, আমারে কেউ খারাপ করতে আসতেছে'। - এই কথাটা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়।

ঠিক এই সময় মসজিদতলার পথে একটা নূপুর কুড়িয়ে পায় নাসিম। শনাক্ত করে বুঝতে পারে তা তার যুবতী দাদি হুসনা আরার। কিন্তু তারপক্ষে অপবিত্র হওয়া সম্ভব নয়, - 'এই হাত ছুঁয়েছে জাহানের মুখ / এই হাতে কি কোনো পাপ কাজ মানায় ? তাই নূপুরটা সে দিতে যায় না। হুসনা আরা চলে আসে তার বাড়িতে। সে নিজেকে সংযত রাখে। মনের মাঝে শুধু জাহান'।

- সময় বয়ে চলে। নাসিম প্রতীক্ষায় থাকে জাহান একদিন না একদিন ফিরবে। সে তো জাহানকে তালাক দেয়নি। তাই তার দৃঢ় প্রত্যয় জাহানকে ফিরতেই হবে।

এদিকে রোমিও ভিডিও হলের গাজি প্রচার করে দেয় দুজন সাক্ষী রেখে নাসিম তার বউকে তালাক দিয়েছে। কথাটা চায়ের দোকান থেকে কানা বেগুনওয়ালা হয়ে চুড়িওয়ালার মারফৎ সারা বাজারসুদ্ধু লোক জেনে যায়। চুড়িওয়ালার কাছ থেকে জাহান শোনে – 'ছোটমিঞা তোমাকে তালাক দিয়াছে হলুদ পাখি শুনে প্রাণ ত্যাগ করেছে'।

নাসিম শুধু স্থির থাকে বিবিকে সে তালাক দেয়নি। তবু তালাক দেওয়াটাই সবাই বিশ্বাস করে নেয়।

আসলে উপন্যাস মানুষের বাস্তবজীবনের শিল্প নির্মাণ। সময়ের প্রবহমানতায় সমাজ বাস্তবতা বদলে যায় - সময়ের চরিত্র বদলে যায় বদলায় না 'কেতাবের ইসলাম'। ধর্মীয় পরিসরের কাঠামোটি। তাই মুসলিম সমাজে নারীত্বের অপমানের সবচেয়ে বড়ো বিষয় 'তালাক'ই হয়ে উঠল এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভারকেন্দ্র। সঙ্গে জুড়ে গেল - পেয়ারা গাছ। হলুদ পাখি। পেঁপে গাছ। পরাবাস্তবতার আবছা আবহ। আচার সর্বস্ব বাহ্যিক ধর্মের চাপে হৃদয়ধর্ম বারবার মাথা ঠুকে মরে - নতি স্বীকার করতে বাধ্য করায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী কখনও কখনও পুরুষ ও বা বাধ্য হন। প্রতিরোধ প্রয়াস সেখানে মৃত্যুরই নামান্তর। অতন্দ্র প্রহরী সেখানে মৌলবী।

যে কথাটা বলছিলাম। একুশ পর্বে বা পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যা স্পষ্ট করেছেন তা হল –
ক. জনশ্রুতি বনাম কিস্‌সা। খ. কিস্‌সা বনাম জনশ্রুতি। গ. সত্য বনাম জনশ্রুতি। ঘ. সত্য বনাম সত্য। ঙ. সত্য বনাম মিথ্যা। চ. মিথ্যা – সত্য - অস্তিত্বের সংকট। ছ. মুসলিম জনজীবনের অন্দরমহল।
আশপাশের চেনা মানুষ অচেনারূপে দেখা দিচ্ছে বারবার। জাহানের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই – সারাজীবন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে সে – বারবার তাঁর স্বামী বদল হয়। তাকে অমর্যাদা করতে সমান্তরাল গল্প তৈরি হয় হলুদ পাখির। বৃহত্তর নিরক্ষর মুসলিম মানসে গড়ে তোলা হয় গুনাহ-ধর্মের বেড়াজাল। ভিতরে ভিতরে সমাজ-ধর্ম শাসিত নৈতিকতা আর অবচেতনে আসছে নৈতিকতা অতিক্রমকারী শরীরী চাহিদার কথা। তা না হলে কেন সবাই ঘুর ঘুর করে জাহান-এর বাড়ির চারপাশে ?

আসলে ধর্মের দোহাই দিয়ে দাম্পত্যকে প্রতিনিয়ত আঘাত করা হয়েছে। তাই তালাক না দেওয়া সত্ত্বেও তালাক দেওয়া হয়েছে। ধর্মের চোখ রাঙানি শোনান – মৌলবি, অনেকেই পাগল প্রতিপন্ন করতে চান, নিজে ভুল ব্লাউজ নিয়ে এসে বুকের দুধ লাগিয়ে ফেরৎ দিয়ে আসে রশিদের বউ বলে আসে দু চার কথা। রটনার এমনই ক্ষমতা ! সবচেয়ে আশ্চর্যের যে আজমতের উচিত ছিল নাসিমকে সাহায্য করা সেই আজমত নিয়েছে অন্য ভূমিকা। উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয় আজমত বুঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬) উপন্যাসের হোসেন মিয়ার জাতভাই ! আসলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সব যুগে সব সমাজে এ ধরণের মানুষের দেখা মেলে। যারা মানুষের দুর্বলতাকে বুঝে নিয়ে সেইখানে আঘাত করে তাকে তার অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দী করে পুড়িয়ে মারে। নিজের শুদ্ধতা বজায় রাখতে – কুচিন্তায় যে ‘তওবা তওবা’ করে তাকে ভুল বুঝিয়ে তাবিজ দেয় ইমাম; গোপনবাসনা মনে রেখে নাসিমকে ধমকায়। নাসিম যতই বলে – ‘মওলানাসাহেব, আমি আমার বিবিরে তালাক দিইনি’, ইমাম ততই বলে – ‘ইমান নষ্ট কোরো না ছোট মিঞা, ছি : তুমি না আলিম। ... একটা মেইয়াছেলার জন্য ইমান নষ্ট করার কি আছে ছোটমিঞা। বউ গেলে বউ পাবে, ইমান গেলে পাবে না। ছোট মিঞা। .... তালাক দেওয়া বিবি হারাম ... দোজখে ঠাঁই হবে তোমার’। - সে যে তালাক দেয়নি ইমামকে বিশ্বাস করানো গেল না। যাবে কী করে ? ইমামের যে গোপন অভিসন্ধি আছে ! ইমাম তাই সুচতুরভাবে খেলে যায়।

আর নাসিম জনবিবিক্ত হতে হতে পুতুলনাচের ইতিকথার শশীর মতো ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়। একাকীত্বের জালে গুটিয়ে নেয়।

বাউড়িয়া-সাঁকরাইলের চকমধু থেকে সজনেতলা মাত্র পাঁচকিমি পথ। নাসিম ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে সত্য প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে মার খাওয়ার ভয়ে আর নিজের ধর্মভয়ে সে সজনেতলায় যায় না। কিস্‌সা-র কথা শোনে। মৌলবির কথা ভাবে আর উদাস হয়ে পেয়ারাগাছের দিকে তাকায়।- 'প্রাণ থাকতে সরাতে পারবে না বিবিকে'।

জনশ্রুতিতে জাহান-এর হলুদ পাখিটা জাহান-এর শোকে মারা যায়। কেউ কেউ দুটো বিবি থাকা সত্ত্বেও জাহানকে নিকা করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। আর লটারির মাধ্যমে চুড়িওয়ালা মৃত হলুদ পাখিটা পায়, তিনসের মধুর মধ্যে বয়েমে করে রেখে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফেরে চকমধুর বাজারে বিক্রি বেড়ে যায়। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর 'বিশাল ডানাওয়ালা থুত্থুরে বুড়ো'র মতো – পাখিটি বাজারে ভিড় বাড়ায়। দোকানদারদের বিক্রি বাড়তেই থাকে। পাখিটাই রহস্যের। জাহানকে তালাক দেওয়া হল না অথবা তালাকের প্রতিক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে – কিস্‌সা-র কী জোর রে বাবা ! কাসেম বলে 'তালাক দেওয়া বিবিকে নিয়ে ঘর করবি ? হারামজাদা শুয়োর ? তোর কবরে আগুন জ্বলবে'। জাহানের চিন্তায় বিভোর নাসিম। নদীর তীরে বোরখা পরা ইমাম বিবিকে দেখে জাহান বলে। রটে যায় সে কু প্রস্তাব দিয়েছে। একদিকে তালাক দেওয়া হয়নি অথচ তালাক দেওয়া হয়েছে বলে রটনায় অন্যদিকে তার ধর্ম নিয়ে মিথ্যা বদনাম –এ নাসিম হাঁপিয়ে ওঠে। তখন সে স্পষ্ট উপলব্ধি করে তার সমাজের অন্তরমহলের যাপনচিত্র। অনুমান করতে পারে তালাকের বিবি আর না – তালাকের বিবির মধ্যের তফাৎটা।

কানাঘুষো জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুরগির সুরুয়া আর পরোটা খাইয়ে চুড়িওয়ালার সঙ্গে জাহান-এর নিকা হয়। জাহান-এর নতুন জীবন শুরু হয়। হাঁসুলিবাঁকের উপকথার সুচাঁদ এর মতো আবির্ভাব হয় নানির। কিস্‌সা-কথক নানি। তফাৎ এই সুচাঁদ একটা এলাকার ধর্মীয় মিথকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল নানি পাখির কিস্‌সাকে জনমানসে সঞ্চার করে। এদিকে চুড়িওয়ালা প্রতিদিন সারারাত জাগার জন্য বাজারে বসে বসে ঘুমোয় – তার ব্যবসায় ক্ষতি হতে থাকে। চুড়িওয়ালা তালাক দেয় জাহানকে। বেগুনওয়ালাকে নিকা করে জাহান। যে মুহূর্তে চুড়িওয়ালা জাহানকে তালাক দেয় সেই মুহূর্তে জাহানের ভাবনায় আসে – 'সে যেন খেলনার

মতো। কারুর ভালো লাগলে খেলে, তারপর ফেলে দেয়। অন্য একজন আবার খেলে। সে খেলার প্রয়োজনের খেলনা'।

- জাহান যখন নিজের নারীত্বের অধিকার – পাওনা নিয়ে ভাবছে ঠিক তখন কানাবেগুনওয়ালা বয়েম ভেঙে ভিতরের পাখিটা নিয়ে চলে যায়, জাহান ভাবে – 'পাখিটা যার হাতে গেছে তারই হবে সে'। পাখি যায় – কিস্‌সা নতুন রূপ নেয় – জাহানের অবস্থান বদলে যায়। এভাবে কিস্‌সা আর জাহান একে অপরের বিপ্রতীপে থেকেও সমকোণে মিলে যায়।

তারাশঙ্করের 'বেদেনি' গল্পের শম্ভুই যেন কানাবেগুনওয়ালা। 'কুসুম' – এর নতুন সংস্করণ হুসনা আরা মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দিয়ে যায় নাসিমকে। শশীর মতো সেও বলতে পারত – 'তোমার মন নাই হুসনা আরা'।

তবু কাহিনির কিস্‌সা এগোয় – 'বিবির বয়স কত' – এর উত্তরে যখন শোনা যায় – 'এই উনিশ কুড়ি' –তখন আরও কামার্ত হয়ে ওঠে আজমত। যাকে নিকা করার জন্য অষ্টপ্রহর লোভার্ত হয়ে থাকে সেই জাহানের পেছন পেছন ঘুরঘুর করে ইমাম। মাঝে মাঝে জাহান অতীতে ফেরে। অনাদি অতীত কথা কয়ে ওঠে, বর্তমান জীবনকে ধিক্কার দেয়। - 'খুব অন্যায় করেছে তাকে ছোটমিঞা'। 'সত্য মৌলবির' জন্য তার ভাবনা হয়। কখনও সে স্বাধীনতা পায়নি, তার যে মন আছে, মতামত আছে - একথা কখনও মান্য করা হয়নি। তাই বেগুনওয়ালার সঙ্গে সে অদ্ভুত এক জীবন বেছে নেয়। ধর্ষিত হতে হতে ঘণ্টা দুই –এর স্বাধীনতার সময় চেয়ে নেয়। চকমধু থেকে সজনেতলার পরিসরে সে আটকে থাকে তবু 'ঘণ্টা দুই অবাস্তবতার মধ্যে জাহান চলে যায় নাসিমের কাছে'। ছাইগাদার মৃত পাখির পালকগুলি বাতাসের ছোঁয়ায়ও আকাশের উদারতায় একটা হলুদ পাখি হয়ে যায়। আবার পাখি গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়। আবার কিস্‌সা তৈরি হয়। পুরানো গল্পের সঙ্গে তাকে গুঁজে দেওয়া হয়।।

পোশাক বদলে কানাবেগুনওয়ালার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায় মৌলবি। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় মৌলবি অসফল হয়। জাহানাকে ভোগ করা হয় না। জাহান তার মুক্তি মেলে ধরতে প্রতি সন্ধ্যায় পরীর মতো দাঁড়ায় চালের ওপর। তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে পূর্বস্বামী ছোটোমিঞার সামনে দাঁড়ানোর কথা ভাবে। তা কি অবাস্তব হবে ? "কেমন তার অবাস্তবতা এটা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে জাহানা। ... নিজের থেকেই উঠে এসেছিল, পুনর্বার তার শোয়া হয়নি"। - পূর্ব – স্বামীর উদ্দেশে চলতে শুরু করে জাহান।

নাসিমের প্রথম স্ত্রী হিসেবে সে ফিরছে – 'যেহেতু ঘণ্টা দুই পুরো অবাস্তবতার মধ্যে চলে যায়'। তাই অবাস্তব সাক্ষাতে সে 'নবীন' 'ধার্মিক' 'মুশুল্লি'-র কাছে যায়। 'অবাস্তবতার ছোটমিঞা'কে প্রশ্ন করে জাহান – 'জাহান এলে তাকে নিয়ে শুতে' ?

- হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে না।

- জাহান পরস্ত্রী নয় কেন ?

- কেননা আমি তালাক দিইনি।...

- তোমার কাছে জাহান ও পরস্ত্রী এক ?

- না। জাহান আমার বিবি। তুমি পরস্ত্রী।

-অর্থাৎ শুরু থেকে চরিত্রগত শুদ্ধতা বজায় রেখেছে নাসিম – তার বিশ্বাস জাহান যদি তার বিবি হয় তো সে ফিরবে। তাই সে অধর্ম করতে পারেনি – 'তার পক্ষে অধর্ম করা কঠিন'।

চলমান কিস্‌সা কথক নানি রোজ রাতে এক এক বাড়িতে সেই হলুদ পাখির কিস্‌সা রসিয়ে রসিয়ে পরিবেশন করে। গল্প বলার সময় নানির সামনে একটা কাঠের হলুদ পাখি রাখা হয়। উপকথার কথক সুচাঁদের মতো কিস্‌সা কথক নানি ধমকে-ঠমকে শ্রোতাদের শান্ত রাখে। ইমামকে সামনে বসিয়ে ইমামের ভবিষ্যত কিস্‌সা কী ঘটতে পারে তা স্পষ্ট করে দেয়। ইমামিত্বের জোর খাটিয়ে আর ভয় দেখিয়ে কানা বেগুনওয়ালার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে আজমত। নানি ধরতে পারে 'জাহানের নসিব নিয়ে খেলছে' – ইমাম। তাই তাকে গাল দেয় 'ঢ্যামনা' বলে। বহুদর্শী নানি জানে সব। তাই কিস্‌সার আড়ালে সব বলে দেওয়ার কথা বলে। মুখোশ খুলে দেওয়ার কথা। মৌলবি জাহানকে কুমন্ত্রণা দেয় কীভাবে কানা বেগুনওয়ালার কাছ থেকে তালাক পাওয়া যেতে পারে। জাহান স্পষ্ট জানায় – 'আমি আপনার কোনোদিন বিবি হব না, প্রতিজ্ঞা করছি'। বাড়ি বাড়ি কিস্‌সার আসর দেখে জাহানের প্রতীতি হয় – 'সে কিস্‌সার বিবি হয়ে যেতে পারবে শুধু। যে কিস্‌সার বিবি পুরুষগুলোর কামনার হাতে চলে যায়'।

বেগুনওয়ালা ছদ্মবেশী ইমামের মাথা থেকে টুপিটা নিয়ে যায় জাহান। টুপি মাথায় থাকলে কোনও বদনাম তাকে ছুঁতে পারবে না, তাই টুপিটার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে মৌলবি। - 'মানুষ কৌতুহলী হয়ে ওঠে ইমাম কীভাবে জাহানবিবিকে পাবে, সে কিস্‌সা শোনার জন্য'।

কিস্‌সার ছোটো ছোটো বৃত্ত বেড়ে গিয়ে বড়ো বৃত্তে পরিণত হয়। তাই সন্ধ্যার শুরুতেই সাত-তাড়াতাড়ি ছোটোমিঞাদের বাড়িতে কিস্‌সা বসায় নানি। লক্ষীর কিস্‌সার শুরু ছোটমিঞার বাড়িতে, আর শেষ কিস্‌সা অনেক ঘটনাঋদ্ধ হয়ে উপস্থিত হল সেই একই জায়গায়। ধর্মের মধ্যে অধর্ম বেশি ঢুকলে, মিথ্যা বেশি ঢুকলে – কিস্‌সার কলেবর এমন করেই বেড়ে যায়। অথচ কিস্‌সা না বসালেও নাসিম জানতেই পারত আজমত নিকা না করে প্রথম থেকেই কীভাবে ছিঁড়ে খেতে চেয়েছিল জাহানকে। জনশ্রুতি – ধর্মমোহ 'তারই ধর্ম দিয়ে তাকে মারে'। আর সুস্থ মানুষ 'পাগল অভিধা পেলে সেই অধর্ম ঠেকানো মুসকিল হয়'। - ঠেকানো যায়নি নাসিমের ক্ষেত্রেও। কাদম্বিনীকে মরে প্রমাণ দিতে হয়েছিল 'সে মরে নাই', অধর্মকে ঠেকাতে ধর্মমোহকে রুখতে নাসিমকে পাগল-বনে থাকতেই হল। 'কিন্তু ধর্মের বিশ্বাস সে কিছুতেই ত্যাগ করে না, তাতেই তার পরিতৃপ্তি'।

কথামানবীর কথাকার মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখেছিলেন – 'পুরুষে পুরুষে যুদ্ধ প্রতিশোধ রমনীর শ্লীলতাহানিতে'। এই উপন্যাসের 'কিস্‌সা' শেষ হচ্ছে জাহানের অত্যাচারিত হওয়ায় কথনে। - নানি জাহানের বুকে ও উরুতে নখের আঁচড় দেখাচ্ছে। বাতাসে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই নখরাঘাতের মুদ্রা তৈরি করে নানি। কীভাবে যেন জাহানকে পেয়ে যায় ইমাম। দীর্ঘদিনের লোভ চরিতার্থ হয় মৌলবির। যে মৌলবির কাছে জাহান শুধুমাত্র 'একটা মেয়ে মানুষ'।

পুরো উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে আছে মুসলমান সমাজের একটি বিশেষ রীতিকে অবলম্বন করে। উপন্যাসে তাই মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ, তাদের ধর্মসম্পৃক্ত শব্দ – আচার – আচরণীয় শব্দবন্ধ ঘুরে ফিরে এসেছে। সত্য কাহিনির মধ্যে মিথ্যা কিস্‌সা জুড়ে তা আরও মুখরোচক হয়ে জনশ্রুতির রূপ নিয়েছে। কথাকার চিনিয়ে দিয়েছেন সেই বিশেষ সমাজের অন্তরমহলের ছবিও। এখানেই উপন্যাসটির কাহিনির আখ্যান কথনের অভিনবত্ব। যা একমাত্র আফসার আমেদ – এরই পক্ষে সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আফসার আমেদ, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাব্‌, ১৯৯৫

২. দেবেশ রায়, 'উপন্যাসে নতুন ধরনের খোঁজে', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাব্‌, ২০০৫

৩. সত্যবতী গিরি, সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', তৃতীয় সং, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৩

@ কবিতা - ২

র বী ন ব সু
দারুণ নিষাদ

শান্ত পৃথিবী থেকে জ্বলে উঠল অশান্ত আগুন
তবুও সময় ঘিরে একা আসে বসন্ত ফাগুন।
চলে যায় আনমনে সাথে নিয়ে আনন্দের ঢেউ
যেন বা কেড়েছে আজ দখিনা বাতাস আর কেউ।

উত্তাল উৎসব নেই ঝিমধরা ঢিমেতালে বোল
কে যেন এসেছে দেখি চুপিসারে পালটিয়ে ভোল।
অজানা অদ্ভুত পথ দুঃখভরা বাগানের দিকে
মানুষ চলেছে শুধু ঝুলে আছে ভয়ের শিকে।

ত্রাস নিয়ে ভয় নিয়ে কেটে গেছে মায়ার ভ্রমণ
একে তো দ্যাখেনি কেউ পড়ে আছে ক্ষুধার্ত শ্রমণ।
ক্ষুধা তাই ভয় তাই চেপে ধরে সুমসৃণ গলা
অন্ধকার ভারতবর্ষ দ্যাখে শুধু ধিকিধিকি জ্বলা।

পরিত্রাণ নেই কোন ভাঙা ঘরে সমূহ বিষাদ
তির যেন লক্ষ্য স্থির টানটান দারণ নিষাদ

উ দ য় ন ভ ট্টা চা র্য

দিনলিপি

আলস্যে কাটিয়ে দিচ্ছি রাত্রি দিন
আর নিঝুম দুপুর
শুধু শুধু পাখিদের আনন্দ গান,
ভৈরবী ধ্রুবপদ।
বিরহী মিলনের প্রত্যাশা করে না।
নদীর অন্তহীন চলায় কেউ বাধা দিচ্ছে না
নির্মল আকাশে তারা গোনা যায়।
সপ্তর্ষি কোমরবন্ধে হাত রেখেছে।
এক বিপন্ন গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর হাত
স্পর্শ করতে ভয় পায়।
মুখোশে ঢাকা মুখ আবার মুখোশ পরে।
শত বছরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়।
প্রিয়জনের দিকে উড়ে যায় দীর্ঘশ্বাস।

ত রু ণ মু খো পা ধ্যা য়

ইশারা

মৃত্যুর ইশারা নিয়ে যে বাতাস ডাকে
আমি বলি তাকে
একটু দাঁড়াও

মৃত্যুর ইশারা নিয়ে যে আকাশ ডাকে
আমি বলি তাকে
তুমি কী চাও

মৃত্যুর ইশারা নিয়ে যে নক্ষত্র জ্বলে
শুধু সেই বলে
নিজেকে জাগাও।

সু শী ল ম ণ্ড ল

করোনা

এখন এখানে সারাদিন কান্না
সারাদিন দহন সারাদিন জ্বালা
সারাদিন ভয় শোক সারাদিন
সারাদিন বুঝি এই বুঝি পালা।

সারাদিন মাটিতে শকুনের ছায়া
সারাদিন উনুন ছড়ায় না আগুন
সারাদিন ফুটপাথে অন্ধকার হাঁটে
দোর এঁটে বোঝাও নেই কোন গুণ।

সারাদিন প্রহর একটাই শুধু
সারাদিন কুকুর আর্তনাদ তোলে
সারাদিন রাস্তায় রাক্ষুসে থাবা
গেরস্ত সারাদিন আছে ঝালে ঝোলে।

সারাদিন শুকোয় মানুষের মুখ
সারাদিন চীন আমেরিকা ইতালী
সারাদিন মৃত্যু লম্বা মিছিল
সারাদিন পৃথিবী হতে থাকে খালি।

সু স্মে লী দ ত্ত

লক ডাউন

এক দুই তিন পায়ে পায়ে তারা কোটি পঞ্চাশ
চলেছে কোথায় থামবে কি আর চোখ ধূধূময়
এদিকে বিপদ ওদিকে বিপদ দাউদাউ পেট
উজাড় পৃথিবী যাহোক তাহোক মরণের ভয়

আমার ঘরের দুধারে রয়েছে বটের ছাউনি
ইনডোর প্লান্ট ছিপছিপে চারা বাড়ছে শান্ত
বহু দূর দূর যাচ্ছে কোথায়, জানব কিভাবে–
আপাতত মন বিছিয়ে দিয়েছে, চাদর ক্লান্ত

হাই তোলে চোখ স্বপ্ন ছুঁয়েছে নিদ্রা বাকল
দুহাতে জড়াই রসিক ভাবনা ক্যানভাস আঁকা
ওরা হেঁটে চলে হাঁটুক হাঁটুক আমরাও বুঝি
শান্তি সরণি মরীচিকা পথ বড় আঁকা-বাঁকা...

পৃথিবীর আমি পৃথিবীর তুমি যাপন ভিন্ন
আমরা মানুষ তোমরা মানুষ ছোট বড় মিল
ফিরব কী বেঁচে জানিনা বুঝিনা মিথ্যে সত্যি
আকাশ কালোয় ঝাপটায় ডানা শকুন বা চিল

কাল কেটে যায় জটলা শ্রমিক হাঁটাই স্বভাব
ভাবনা আদরে খিল তুলি আজ যে যার ঘরে
কলম কালিতে অভ্যেস মতো শব্দবন্ধ
বুনে যাই একা অসহায়তার স্বার্থ-সমরে।

সু ম ন গু ণ

অন্তরীণ

শহরে কোনো পদক্ষেপ নেই।পাশের বাড়ি
নেই, দূরের তরুণী নেই। দৌড়ে ট্রেন ধরা
নেই, চায়ের দোকান নেই, বাসস্টপ নেই।
সন্ধেবেলা নেই, কফিশপ নেই।

খাঁ খাঁ রাস্তা আছে। চব্বিশঘন্টা টিভি
আছে, সবচেয়ে বড় খবর আছে, মৃত্যুর
তালিকা আছে, হাতধোয়া আছে, এঘর ওঘর
আছে, সন্দেহ আছে, বাড়িতে সবাই আছে
সারাক্ষণ আছে দুর্বিষহ আছে।

তা প স রা য়

কুড়ি লাইন কবিতা লেখার পর মনে হয় রাজকার্য সম্পন্ন হল

চাঁদ কিভাবে বিস্কুটের মতো ভাঙা যায়! অনেককে দেখেছি
পাঁচ বছর, সাত বছর বা তারও বেশি হতে পারে
আমাদের দিঘিটির কাছে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিশি পাওয়া রাতে
শব্দ হয় না, চাঁদ অল্প অল্প ভাঙে
হাতের মুঠোয় সেইসব গুঁড়ো গুঁড়ো চাঁদ নিয়ে ভোর পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়

গড়িয়া থেকে সোনারপুর একটা সরলরেখা টানতে পারবে না অনেকে-
হ্যাঁ নাও, মানচিত্র দিচ্ছি, টানো। হাওয়ায় আঁচল সামলাতে হবে
হাতে মাত্র কয়েকটা বছর, লুকনো ব্যাগের ভেতর টাকা কম
শুধুই খোঁচা দিচ্ছে বেয়াদব, চোখ টানছে বেশি এদিক-ওদিক
অটোওয়ালা পাশের সিটটি বরাদ্দ রেখে দেয়, গল্প করে

আমরা যেভাবে মেঘকে তুলে ধরি, মানে জুলাই-আগস্ট
যেভাবে থানার সামনে ভন ভন করে মাছি
যেন বাংলার সব চোলাই এখানেই পাওয়া যায়, শীত হতে দেবার আগেই
গা-গরম করা ভোট ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে অনেকে ভেবেছে
দুঃখ হলো বিলাসিতা, যা মাঝে মাঝে করা যায়, যেভাবে
সঞ্চয় নিঃশেষ করে গণতান্ত্রিক প্রজারা বেড়াতে বেরিয়েছে ছুটির দিনে

আমাদের বাড়ির সামনে মাঠ, মাঠের সামনে দিঘি, তারও সামনে চাঁদ
পরিযায়ী পাখিটির মতো সেই যুবক ছেলেটিকে দেখি
বছর বছর আসে, মাঝ রাতে চাঁদ ভাঙে, আর ভোরের হাওয়ায়
সে ডানা মেলা উড়ে যায় কী জানি কোথায়

বি না য় ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

হয়তো এই দিনও কেটে যাবে

অন্ধকার পার করে, সূর্যও তাকাবে...

তখনও অনেকে হয়তো
যে যার নরকটাকে
স্বর্গ বলে নগদে চালাবে...

তবু
নিশ্বাসে যা হারিয়েছ
সবটুকু
নাগালেই পাবে...

গলা কি শুকিয়ে আসছে?
এনে দেব,
একটু জল খাবে?

সৌ মি ত ব সু

ভয়টুকু যেন যায় না তোর

ঘরের মধ্যে থাকার জন্য সাহস নয়
ঘরের মধ্যে থাকার জন্য সামান্য ভয়
হাত পাতা | একমুখীন ভাবনা চাই
বাঁচবো মরবো ঘরের ভেতর এইটুকুই |
রাজ্যজুড়ে চেঁচাচ্ছে লোক "সাহস দাও"
সাহস লাগে বাজারহাট, রাস্তা, ভীড় |
মানুষজন, দোকানপাট বন্ধ থাক
বুকভরা ভয় নিয়ে খোঁজ টেবিল
লিখতে চাস লেখ তবে, গান শুনিস,
বুকের ভাঁজ ভয়টুকু সযত্নে
রাখ তুলে, চাস যদি বাঁচতে ভাই |
নিঃস্বদিন ফুটবে ফের উল্লাসে
আকাশ মাটি মুক্ত হবে ভাইরাসে,
ঘরের মধ্যে থাকার জন্য সাহস নয়
বেঁচে থাকার জন্য লাগে সামান্য ভয়

দে বা র তি ভ ট্টা চা র্য

লড়াই

অসহায় ফুসফুসে হাওয়া ভরে দিলো ভারাক্রান্ত- রোদ্দুর
দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে
এক ফালি জীবন উঁকি দিয়ে যায়
নিস্তেজ জীবনের স্লোগানে মুখর গত শীতের- পাতাঝরা গাছেরা
শুকিয়ে যাওয়া নদীর মতো শরীরে জেগে ওঠে
শুকনো শিরা- উপশিরা
পশ্চিম-আকাশের সূর্যেও মড়ক লেগেছে
গলি থেকে রাজপথ, সর্বত্র লড়াই

প্রতিঘাতের লড়াই
লড়াই টিকিয়ে রাখার লড়াই
হাওয়া আর রোদ্দুরের লড়াই।

ত নু জা চ ক্র ব র্তী
ছিবড়ে

ডেঙ্গুতে পেঁপে পাতা, করোনায় গোচনা
প্রাণ চলে যায় যাক নেই অনুশোচনা !

মরলেই মার খাবে সরকারি ডাক্তার
লাঠি হাতে বসে আছে কেলো ভুলো আক্তার।

নেই কোনো হাতমোজা, মুখোশের জোগান
আজে শুধু দেশজুড়ে মিথ্যের শ্লোগান ।

আজ যারা চোখ বুঝে কাল ফের ভগবান
ঈশ্বর আল্লাহ্ হারাবেনা জানি মান !

ভোটে জেতা ভাইরাস মাথাগুলো বিগড়ে
ঘিলুগুলো শুষে নিয়ে বানিয়েছে ছিবড়ে।

বাঙালির পৃথিবীটা আজ বড়ো মজাদার
গাভীমাতা মানুষের বুদ্ধির নেই ধার ।

কেটে গেছে দিনরাত উৎসবে পরবে
মৃত্যুর বীমা হেঁকে বুক ফোলে গরবে।

শ্রমিকেরা হেঁটে মরে রাজনীতি করে ত্রাণ
লড়ে মরে নেতা পাতা কত বড়ো কার দান!

ম জি দ মা হ মু দ (বাংলাদেশ)

মহামড়কের পরে

এই মহামড়ক শেষে আমি যদি আবার জেগে উঠি
জেগে উঠি হারিয়ে যাওয়া মহাদেশের অন্তরীপ থেকে
তখন তোমায় পুরোটা পাওয়ার জন্যই করব লড়াই
তোমার পূর্ণ অধিকার ছেড়ে ধরব না খণ্ডাংশ
বলব না তোমার পিঠের বদলে বুক
চুলের বদলে নাভি না হলেও চলে
তখন পৃথিবীতে প্রবর্তন হবে সমন্বিত আইন
তোমার জন্য এক, কিঙ্করীদের আরেক হবে না কখনো
মানব সভ্যতা অহেতুক করবে না বড়াই
বলবে না মানুষ ভোগের জন্য সৃষ্টি এই মাকলুকাত
আমরা যদিও ছিলাম এই পৃথিবীরই সন্তান
কেউ বা হাতের মতো, কেউ ছিল পায়ের আঙ্গুল
যে-সব অংগ আমাদের দৃশ্যের বাইরে ছিল
তারাও আমাদের জীবন করেছিল দান
এমনকি পেটের মধ্যে পরজীবী ব্যাকটেরিয়াগুলো
আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল
অথচ দ্বিপদ প্রাণ ছিল অকৃতজ্ঞ
মাছি তাড়ানোর লেজ না থাকলেও ছিল হাতের দম্ভ
অন্যের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব ছিল না তার বাঁচা
তার সকল কাজে অহংকারের প্রচার
এমনকি নিজেদের মধ্যেও ছিল বড়ত্বের লড়াই
শাদা সর্বদা কালোর উপর
পুরুষ সর্বদা নারীর উপর

ধনী সর্বদা গরীবের উপর দেখাতো কেদ্দারি
ঈশ্বরকে নিয়েও তাদের মধ্যে ছিল ভাগাভাগি
অনেক রক্তপাত ঘটেছে তার মালিকানার দাবি নিয়ে
উপাসনালয়গুলো ছিল ক্ষমতা প্রকাশের উপায়
তারা প্রভুকে বানিয়েছিল খণ্ডিত পৃথিবীর মালিক
তারা এতটাই অহংকারী হয়ে উঠেছিল এই ভেবে-
তাদের জাহাজগুলো জল ও বায়ুতে সমান ভাসমান
ক্রুদ্ধ ঈশ্বর একদিন পাঠালেন তার অদৃশ্য বাহিনি
জল ও বায়ুযানগুলো বন্দরে পারল না ভিড়তে
ভাগাভাগির মন্দির থেকে পুরোহিত গেল পালিয়ে
গির্জা ও সিনাগগগুলো থাকলো শূন্য পড়ে
একাই দাঁড়িয়ে রইল নিঃসঙ্গ কাবা
সহস্র বছর ধরে পোড়া মাটির ইমারত-
মানুষ যকে সভ্যতা ভেবেছিল
তা আজ কেবলই প্রত্ন তত্ত্বের বিষয়
আমরা তখন পেটের মধ্যে মারা গিয়েছিলাম
আমরা শিশ্নোদরের মধ্যে আটকে ছিলাম
এই মড়ক আমাদের দিয়েছিল মুক্তি
মানুষ বুঝেছিল তারা ছিল নিরপেক্ষ ঈশ্বরের সন্তান
সকল গোলাকার গর্ত ও লম্বমান বস্তু মিলেই তিনি
তিনিও তার সৃষ্টির অংশ
এই মহা-প্রলয় শেষে আবার যদি জেগে উঠি প্রিয়তমা
তোমায় পারবে না কেউ বিচ্ছিন্ন করতে
কেননা তখন সবাই জেনে যাবে-
তুমি আর আমি মিলেই এই সম্পূর্ণ গোলক
পিঠ ও পেটের দিকে সমান দৃশ্যমান।

@ ছোটগল্প

দে ব যা নী ব সু কু মা র
অনুভবে তোমাকে যে চাই

মহারানী বিড়লা কলেজে ফেস্ট। ছাত্রীরা সব সেজেগুজে মহা ব্যস্ত। জয়ন্তী তখন ওই কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। এস্থেটিক সেন্সটা ওর বেশ আছে বলে দায়িত্ব পড়েছে স্টেজ সাজাবার। ফেস্ট তাই অন্যান্য কলেজে থেকেও অনেক ছাত্র ছাত্রীরা এসেছে। আর পাঁচটা দিনের মত খুব কড়াকড়ি নেই আজ। কলেজের আইডি দেখাতে পারলেই সবার জন্য অবারিত দ্বার।

এত ভিড়ের মধ্যেও জয়ন্তী অনুভব করে কেউ যেন আলাদা করে বারে বারে ওর ফটো তুলছে। খেয়ালও করেছে একটা ছেলেকে। বেশ ঝকঝকে চেহারা। খবর নিয়ে জানতে পারে কলেজের তরফে অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার হয়ে এসেছে। অনুষ্ঠান শেষে যখন অডিটোরিয়াম থেকে বেরোতে যাবে হটাৎ ছেলেটি সামনে এসে বলে, আমি চঞ্চল অনেক ছবি তুলেছি আপনার। পাঠিয়ে দিতাম যদি আপনার ফোন নম্বর দিতে আপত্তি না থাকে। এতো ভালো সাবজেক্ট পেয়ে লোভ সামলাতে পারিনি। অনুমতি না নিয়েই অনেক ছবি তুলেছি।

জয়ন্তী বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে। চেহারাতে আদুরে আদুরে ভাব তবে সত্যি ফটোজেনিক। পড়াশুনোতে তেমন মন নেই। করতে হবে বলে করা। আর্থিক সচ্ছলতাতে মানুষ। বাবা মার সাথে থাকে কাঁকুলিয়ায় নিজেদের বাড়িতে। আর চঞ্চল অতি সাধারণ ছেলে। উচ্চ্য মাধ্যমিক পাশ করে ফোটোগ্রাফি শিখেছে। হাত বেশ ভালোই তাই মন্দ রোজগার হয়না। কালীঘাটে ভাড়া বাড়িতে থাকে বাবা মা ও পাঁচ ভাই বোন মিলে। পারতপক্ষে চেষ্টা করে সারাদিন বাড়িতে না ফিরতে কারণ সত্যি জায়গার ভারী অভাব।

কিন্তু তাতে প্রেমে পড়তে কোনো অসুবিধে হয়না। ছবি দেবার নাম করে প্রথম দেখা সাক্ষাৎ আর তারপর প্রেম গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। প্রথম যেদিন জয়ন্তীর বাড়িতে জানাজানি হয় সে এক দারুন অশান্তির পরিস্থিতি। বাবা মেয়েকে যতই বোঝায় প্রেমে অন্ধ মেয়ে তখন ততই অবুজ। শেষে একমাত্র আদুরে মেয়ের জেদের কাছে হার মানতে হয়। যদিও মনের সাথে অনেক লড়াই করে

ওনারা বিয়েতে মত দেন কিন্তু মনে মনে বোঝেন এই বিয়েটা না হলেই ভালো হতো। ততদিনে জয়ন্তীর গ্র্যাজুয়েশন শেষ। এত তাড়াতাড়ি বিয়েতে অমত থাকলেও মাত্র বাইশ বছর বয়সে মেয়ের আবদারে বিয়ে দিতে বাধ্য হন ওনারা।

অগত্যা সানাই বাজে, চার হাত এক হয়। এই ছেলের রোজগারেই সংসারের অনেকটা চলে বলে ছেলের বাড়ির খুব একটা আগ্রহ থাকেনা। তাই ধুম ধাম নাহোলেও বিয়ের উৎসব শেষ হয়।

শশুর বাড়িতে জায়গা অকুলান। কিন্তু জয়ন্তীর খুব অমত ঘর জামাই থাকার। তাই বাবামায়ের হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া করে মনোহর পুকুরে। বছর না ঘুরতেই সংসার বাড়ে দুজন থেকে তিনজনে । ঋক আসে ওদের জীবনে। প্রাচুর্য্য না থাকলেও স্বচ্ছলতা আছে। তাই হেসে খেলেই দিনগুলো কাটে বেশ।

ইতিমধ্যে জয়ন্তীর মা মারা গেছেন। ছেলে ভর্তি হয়েছে দামি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। চঞ্চলের কাজবেড়েছে সাথে বেড়েছে অর্থ সমাগম কমেছে সংসারে দেওয়া সময়। এই কাজের জন্যই গেছে একটা জন্মদিনের অনুষ্ঠানের ছবি তুলতে। আর সেখানেই আলাপ অর্পিতার সাথে। অর্পিতা ডিভোর্সি, সুন্দরী, শিক্ষিতা ,। এছাড়া আছে নিজের একটা এড এজেন্সির ব্যবসা । অর্পিতার সম্মোহনী-স্বভাব চঞ্চলকে আকৃষ্ট করে। চঞ্চলের সংসারের সব কথা জেনেও অর্পিতা সরে দাঁড়ায় না। উল্টে শুরু হয় গোপন প্রেম। চঞ্চল পাকে পাকে জড়িয়ে পরে। ছিন্ন করতে পারেনা অর্পিতার আকর্ষণ।

জয়ন্তী কিছুই জানতে পারে না এসবের। বরাবরই উচ্ছল প্রকৃতির। ছেলে বর সংসার বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ চৈ করে দিন কাটায়। চঞ্চলের ফোনে অর্পিতা চঞ্চল এর একটা ঘনিষ্ট ছবি দেখে পৃথিবীটা যেন দুলে ওঠে ।চঞ্চল বোধহয় ভুলে গিয়েছিলো ডিলিট করতে। শুরু হয় অশান্তি। চরম আকার ধারণ করে যত দিন যায়। কারো কথা না ভেবেই জয়ন্তী আত্মহত্যা করে গলায় দড়ি দিয়ে।

তিন মাসের মাথায় জয়ন্তীর বাবা শোক সহ্য করতে না পেরে মারা যান। ঋকও কেমন কুঁকড়ে গেছে। কারো সাথে কথা বলে না। বন্ধুদের সাথে মিশতে পারেনা। স্কুল থেকে প্রায়ই অভিযোগ আসে পড়াশোনোতে অমনোযোগ ব’লে। বরাবর মার কাছে পড়ার অভ্যাস। বাড়িতে টিউটর রেখেও কোনো সুরাহা হয়না। ঋককে নিয়ে চঞ্চল কাঁকুলিয়ায় জয়ন্তীদের বাড়ি উঠে আসে।

সময় থেমে নেই। খালি যেদিন অর্পিতা আসে দিনগুলোতে কেমন একটা অস্বস্তি হয় চঞ্চলের? কেমন গা ছম ছম করে। বেশি বেশি করে মনে পড়ে জয়ন্তীকে। চঞ্চল মনে মনে ভাবে আগে তো কখনো এমন হতো না। নিজেরই কেমন রহস্য লাগে। কে কীভাবে নেবে এই কথা ভেবে কারো কাছে মন খুলে হালকা হতে পারে না।

আর ভালো লাগেনা অপেক্ষা করতে। অর্পিতার তাগাদায় আর আবদারের কাছে হার মানতে হয় চঞ্চলকে। জয়ন্তীর মৃত্যুর এগারো মাসের মাথায় কাগজে সই করে বিয়ে হয়ে যায়। ওদের নির্লজ্জতায় সবাই ছিছিক্কার দেয়। আর বন্ধুরা যবে থেকে শুনেছে অর্পিতার সঙ্গে সম্পর্কের কথা তবে থেকে বয়কট করেছে চঞ্চলকে।

বিয়ে করে অর্পিতা এসে ওঠে জয়ন্তীর বাড়িতে। বিয়ের প্রথম রাতে একটা অজানা ভয় গ্রাস করে চঞ্চলকে। কিন্তু অর্পিতার মন রাখার জন্য যতবার ছুতে যায় ওকে হাতটা কিছুতেই পৌছোয়না অর্পিতা অবধি। অনুভব করে ওদের মাঝখানে তৃতীয় কারো উপস্থিতি। ঘুমের অজুহাতে চঞ্চল শুয়ে পড়ে। কিন্তু এটা হয়ে ওঠে নিত্যদিনের সমস্যা। চঞ্চল অর্পিতা যেই কাছাকাছি আস্তে চায় কিছু না কিছু ঘটে ওই চরম মুহূর্তে। কোনোদিন চঞ্চল অসুস্থ হয়ে পড়ে, কখনো ছেলে দরজা ধাক্কা দিয়ে বলে ভয় করছে। আবার কখনো গভীর রাতে ফোনে ব্ল্যাঙ্ক কল আসে। একদিন মন শক্ত করে সবে অর্পিতা কে জড়িয়ে ধরেছে দেখে সামনের মানুষটা অর্পিতা নয় জয়ন্তী। ভয় পেয়ে বিকট চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায় চঞ্চল ।

এদিকে অর্পিতা এসবের কিছুই বুঝতে পারে না। অবুজ হয়ে ওঠে দিন দিন। বিশ্রীভাবে অপমান করে চঞ্চলকে। একটা একটা করে দিন চলে যায় কিন্তু ওরা একদিনো এক হতে পারে না। কয়েকমাস পরে তিতিবিরক্ত হয়ে একদিন অর্পিতা চঞ্চলকে মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার বলে, ভয়ের কিছু নেই। একদম জয়ন্তীর কথা ভাববেন না। কিছু ওষুধ লিখে দেন। বলেন, আপনি মনে মনে অপরাধ বোধে ভুগছেন। সব ঘটনা মনের ভুল। যে চলে গেছে সে কি করে আসবে। বরং ক'দিন বাইরে থেকে ঘুরে আসুন। পরিবেশ বদলালে সম্পর্কটা সহজ হবে। নিজেরা কাছাকাছি আসতে পারবেন ।

মুশকিল হয় ছেলে কোথায় থাকবে? শেষে চঞ্চল অনেক বুঝিয়ে নিজের বোনের কাছে কালীঘাটে ছেলেকে রেখে দুজনে মিলে বেড়াতে যায় পাঁচদিনের জন্য আরাকু ভ্যালি। হোটেলে ওঠার পরপরই চঞ্চলের ধুম জ্বর। জ্বর লাফিয়ে ১০৩। চোখ মেলতে পারে না। লোকাল ডাক্তার আসে। ওষুধ খেয়েও একই

অবস্থা। রেজারভেশন করা আছে তাই পাঁচদিনের দিন ওই অবস্থায় ট্রেনে উঠতে হয়। ওঠার একঘন্টার মধ্যেই একদম সুস্থ বোধ করে চঞ্চল।

অর্পিতার কাছে মরমে মরে যায়। কোনো যুক্তি দিতে পারে না। আর অর্পিতা ভাবে চঞ্চলের এই আচরণ ইচ্ছাকৃত। প্রথমে মনে মনে তারপর প্রকাশ্যেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অর্পিতা। শুরু হয় চরম অশান্তি। চঞ্চল অসহায় হয়ে অর্পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সব বিফলে যায়। নিজের অক্ষমতার জন্য লজ্জিত হয় নিজের কাছে। তাও চেষ্টা করে অর্পিতাকে একা পাবার, কিন্তু তখনি দুজনের মাঝে অশরীরী জয়ন্তীর ছায়া হাজির হয় । জয়ন্তীর এই উপস্থিতি কাউকে বোঝাতে পারে না চঞ্চল – না ডাক্তারকে, না অর্পিতাকে, না নিজের মনকে।

আড়াই বছরের মাথায় অর্পিতা ডিভোর্সের জন্য দরখাস্ত করে। কারণ দেখায় চঞ্চল পুরুষত্বহীন।

ইচ্ছে করলে চঞ্চল এই অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণ করতে পারতো কিন্তু নিজের প্রতি ঘৃণায় সব অভিযোগ মাথা পেতে নেয়। অর্পিতা চঞ্চলকে ছেড়ে চলে যায়।

চঞ্চল একা হয়ে পড়ে। অর্পিতার জন্য ছেলের সঙ্গে ততদিনে এক বিরাট দূরত্ব তৈরী হয়েছে। সে নিজের মতো থাকে। বড় হয়েছে। মায়ের মৃত্যুর জটটা ততদিনে খুলতে শিখেছে। তাই বাবার কাছে সহজ হতে পারে না। চঞ্চল এখন মনে মনে চায় জয়ন্তী আসুক। বার বার আসুক। অশরীরী জয়ন্তী কে ও কাছে পেতে চায়। জয়ন্তীর অভাবটা পাগল করে ওকে। কিন্তু যেদিন অর্পিতা চলে গেছে তারপর থেকে আর একদিনও জয়ন্তী আসেনি। কিন্তু জয়ন্তীর ছবির সামনে প্রতিদিন চন্চল আকুতি জানায়- অনুভবে তোমাকে যে চাই।

চু ম কি চ ট্টো পা ধ্যা য়

মিষ্টিমাসির বৌমা

- হ্যালো
- টুলু, তথার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল রে!
- আরে তাই নাকি? দারুণ খবর তো মিষ্টিমাসি! তোমার হাড় জুড়োলো একটু? হাহাহাহা...
- শুধু হাড়? সারা অঙ্গ জুড়িয়েছে রে বেটি! বিনুটার বিয়ে হয়ে যাবার আগে থেকেই গরু-খোঁজা খুঁজছি জানিস তো! কিছুতেই চালে ডালে খিচুড়ি পাকছিল না। অথচ দেখ, ভগবানের এমন মহিমা যে ঘরের কাছেই ভালো মেয়ে পেয়ে গেলাম।
- খুবই আনন্দের কথা মিষ্টিমাসি। কবে আসবে তুমি আমাদের বাড়ি? রবিবার দেখে এসো প্লিজ যাতে আমি থাকতে পারি।
- আসব তো বটেই। কত্ত গল্প করতে হবে। মাকে বলিস টুলু, আমি আসব। এই সময়টা তোর মা বিশ্রাম নেয় ধরে নিয়ে তোকে ফোন করলাম। আচ্ছা রে, এখন রাখছি।
- আচ্ছা মাসি।

মিষ্টিমাসি -- আমার মায়ের মাসতুতো দিদি। আমার সবথেকে প্রিয় মাসি। বলতে গেলে, চারদিকে যত আত্মীয় আছে, মিষ্টিমাসিই সেরা। এত খোলামেলা বড় মনের মানুষ আমি এখনও অবধি দেখিনি। সংস্কারহীন, উদার এক মানুষ। আমার মা ও যথেষ্ট প্রোগ্রেসিভ কিন্তু মিষ্টিমাসি আলাদা রকম।
এক রবিবার হইহই করতে করতে এল মিষ্টিমাসি। হাতে ঝুলছে গরম কড়াইশুঁটির কচুরি আর আলুর তরকারির পলিব্যাগ। মিষ্টিমাসি আমার প্রিয় কি, তা জানে। খাবারের প্যাকেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সটান চলে গেল মায়ের ঘরে। যেতে যেতে আওয়াজ দিয়ে গেল, ' টুলু, কচুরি নিয়ে চলে আয়; খা আর গল্প শোন।' প্লেটে কচুরি আর বাটিতে তরকারি নিয়ে মিষ্টিমাসির পাশে গিয়ে বসলাম।
- খুব ভালো একটা মেয়ের সন্ধান পেয়েছি রে ডলি। আমি তো দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। বিনু নিজের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে, এদিকে বড় ভাইয়ের জন্য একটাও উপযুক্ত মেয়ে পাচ্ছিনা।

আসলে তথাটার মাথার চুল পড়ে গিয়েই হয়েছে সমস্যা। আজকালকার মেয়েদের তো ওপর দেখনাই খুব বেশি। ছেলের স্বভাব-চরিত্রটাই যে আসল, তা ভাবেনা। যাক বাবা, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই। এই মেয়েটি, সম্পুর্ণা, ডাক নাম রিয়া, যেমন মিষ্টি দেখতে তেমনি গুণের। ডক্টরেট করা। কলেজে পড়ায়। চমৎকার গান করে। শান্ত...

মিষ্টিমাসির কথার মাঝখানেই মা বলে উঠল, 'তা একে পেলে কোথায় রাঙাদি? এমন গুণের মেয়ে এতদিন অবিবাহিত রয়েছে ? '

মায়ের কথায় আমার একটু অস্বস্তি লাগলেও মিষ্টিমাসির কোনো হেলদোল নেই। বরং চনমন করে বলে উঠল, 'তথার এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে দেখা ওদের দুজনের। সেই বন্ধু হল কমন ফ্রেন্ড। এতদিন অবিবাহিত কেন জিগ্যেস করছিলি না? ওর একটা হিস্ট্রি আছে। খুবই বেদনাদায়ক।

'বছর পাঁচেক আগে রিয়ার বিয়ে হয়েছিল। তখন ও সবে থিসিস জমা দিয়েছে। ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার ছিল। একমাত্র ছেলে। অবস্থাপন্ন ঘর। বাইরে থেকে দেখলে একেবারে সোনার টুকরো ছেলে। কিন্তু...

'বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যেই মুখোশ খুলে যায় ওদের। শুধু ছেলে নয়, তার মা বাবা সবার। শুরু হয় অত্যাচার। রান্নার লোক ছাড়িয়ে দেয়, কাজের লোক ছাড়িয়ে দেয়, সব রিয়াকে দিয়ে করাতে শুরু করে।'

- সেকি? আঁতকে উঠি আমি। মাও ইস্ বলে সোজা হয়ে বসে।

- হ্যাঁ গো রাঙাদি। অনেক সহ্য করে মাস তিনেক বাদে যখন অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়েছে, তখন এক কাপড়ে কোনরকমে পালিয়ে আসে রিয়া। বলো, কি সাংঘাতিক লোকজন! আমার তো শুনে থেকেই মেয়েটার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। আহা রে, কত কষ্টই না করেছে বেচারি!

মিষ্টিমাসির এই কথাগুলো শুনে আমি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। মিষ্টিমাসি এত ভালো! মিষ্টিমাসির বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। এই বয়সের কজন মহিলা এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মেয়েকে নির্দ্বিধায় ছেলের বউ করে ঘরে আনবে? যেখানে ছেলের এটা প্রথম বিয়ে।

আমার মায়েরই তো মুখটা সামান্য হলেও গম্ভীর হয়ে গেল। আমার দিকে একবার তাকিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, ' ভালো করে খোঁজখবর নিয়েছ তো রাঙাদি ? বিয়ে তো ছেলেখেলা নয়।'

- যাদের কাছেই খবর নিয়েছি তারাই রিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। আমার আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই মনে।
মিষ্টিমাসির মনের উদারতা দেখে মুগ্ধতা ছেয়ে গেল আমাকে। বললাম, 'যাক, এবারে তোমাদের ঘরে আসছে, আনন্দে আহ্লাদে থাকবে। তথাগতদা তো খুবই ভালো কিন্তু তোমার মতো শাশুড়ি পেতে অনেক জন্মের পুণ্যি লাগে। তোমার মধ্যে ঈশ্বরের বাস করেন গো মিষ্টিমাসি। তাই তুমি এত নিঁখুত।'
উদাত্ত গলায় হেসে মিষ্টিমাসি আমার গাল টিপে বলে, 'দুর পাগলি।'

তথাগতদার বিয়েতে খুব হইহই করলাম আমরা সবাই। মেসোমশাইয়ের চামড়ার তৈরি গ্লাভস, ব্যাগ ইত্যাদি অনেক জিনিসের এক্সপোর্টের ব্যবসা। টাকা প্রচুর। আয়োজনও তাই এলাহি। ধূলাগড়ে বিরাট ফ্যাকটরি। তথাদা আর বিনুদাও বাবার সঙ্গেই ব্যবসা দেখে। বেশ একটা হ্যাপি ফ্যামিলি ওদের। বিনুদার বউ পিংকিও বেশ ভালো হয়েছে। রিয়া ভালো থাকবে ওদের পরিবারে।
প্রথমে নাকি বিয়েতে রাজি হয়নি রিয়া। হবে কি করে? যা ট্রমাটিক অভিজ্ঞতা হয়েছে বেচারির! তথাদা এদিকে রিয়াকে দেখে মুগ্ধ। প্রেমে মশগুল। রীতিমতো কাউন্সেলিং করে তবে রাজি করিয়েছে। এসবই আমার মিষ্টিমাসির কাছে শোনা। মিষ্টিমাসি খুব সুইট। ছেলের প্রেমের গল্প বলছে বোনঝিকে। হাহা!

বাবার ফোন বাজছে। বাবা তো বাথরুমে। আমি গিয়ে ধরলাম। মিষ্টিমাসির বর, মেসো ফোন করেছে।
- মেসো বলো, আমি টুলু, বাবা স্নানে গেছে।
- শেখরদা বাথরুম থেকে বেরলেই ফোন করতে বলিস টুলু, আর্জেন্ট দরকার। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল! ফ্যাকটরিতে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই... ফোন কেটে দিল মেসো।
আমি ছুটে গিয়ে মাকে বললাম। মা অস্থির হয়ে বলল, শিগগির মিষ্টিকে ফোনে ধর... কি সব্বোনাশের কথা...
পাঁচ বারের চেষ্টায় ফোনে পেলাম মিষ্টিমাসিকে।
- মিষ্টিমাসি... মা কথা বলবে...

- আর কী বলার আছে বল টুলু। আমাদের তো সব পুড়ে গেল। এই মেয়েটা সত্যিই অপয়া রে... বউ হয়ে এসেই খেয়ে ফেলল সব... আঁ.. আঁ...আঁ.. কান্না ভেসে আসছে ফোনের মধ্যে।
হতভম্ব হয়ে গেলাম। কীসব বলছে মিষ্টিমাসি! মিষ্টিমাসি?
মাকে বললাম, 'পরে কথা বোলো। ওরা ব্যস্ত এখন।' মনটা কেমন এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেল আমার। পরদিন ফোন এল আমার মোবাইলে।
- বলো মাসি। ধরো, মাকে দিচ্ছি।
'মিষ্টি' কথাটা বলতে ঘেন্না করল আমার।

অ য় ন ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

ধারা–বিবরণ

'আমার কেউ নেই... এই নশ্বর পৃথিবীতে আমার কেউ নেই...' অগোছালো অন্যমনস্কতার ভিতর এই কথাগুলো বিড়বিড় করতে করতে হাঁটছিল সৃজন। রাস্তা দিয়ে।

শেষ শ্রাবণের কালবর্ষণে পথ–ঘাট প্রায় বেহাল। নর্দমা... পুকুর... রেনওয়াটার পাইপ দিয়ে তোড়ে নেমে আসা ধারাপাত ধীরে ধীরে শহরটার পেট পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছে। হয়তো সময়ের বোধ হারিয়ে গিয়ে গলা... তারপর মুণ্ডু... শেষে চলে যাবে গোটা কলকাতাই। হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিসের মত ফ্যাদম–ফ্যাদম গভীরতার নিচে ঘুমিয়ে পড়বে। পরিতক্ত, বিলুপ্ত নগরীরা যেমন...।

শরীরে কাঁটা দিল কি। কে জানে...। ঝাপসা পৃষ্ঠার মতন আকাশ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে সূক্ষ্ম–মোটা–কৃশ নানান প্রকৃতির জলবিন্দু। স্নান করছে সৃজন। যন্ত্রণাময় অবগাহনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বৃষ্টি, না কাচ! ফোঁটাগুলো এত তীক্ষ্ণ কেন? এত তীব্র! যেন অগুনতি কাচের টুকরো মাথায়–ঘাড়ে খোলা ত্বকের অংশে বিঁধে যাচ্ছে। আর রক্ত নামছে। বৃষ্টিফোঁটার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে রক্তের রং। মেটে রঙের ঘোলাজলে থই থই করছে মহানগর।

আঃ কী আরাম। যন্ত্রণায়–ব্যথায় বুঝি লুকিয়ে থাকে এত উপশম। সুখশান্তি। সুখশান্তি। পাতলা চামড়ার চটিটা জল খেয়ে খেয়ে ঢ্যাবঢ্যাপ করছে। পাঞ্জাবী লেপ্টে গিয়েছে দেহকাঠামোয়! চুলের রন্ধ্রপথ দিয়ে মগজে প্রবেশ করছে জলপোকা! কাচপোকা।

হাঁটো সুজন... হাঁটো...। হাট শালা... পথের কোনও শেষ হয় নাকি। যতদূর যাবি দেখবি সেখান থেকে আবার শুরু হয়ে গেছে পথ। অনন্ত। মসৃণ। এবড়োখেবড়ো। পথ

কেবলই পথেই মিশে যায়। পৌঁছায় না কোথাও। মানুষ পৌঁছায় না। শুধু ঘুরতে থাকে। ভূতগ্রস্তের মত। নিশি পাওয়ার মত।

সুজন কি একটু থমকে গিয়েছিল! কে জানে! তবে যদি দাড়িয়েও থাকে তা সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য। ওই আবার হাঁটতে শুরু করেছে। এই গলি থেকে ওই গলি। এই সিগনাল পেরিয়ে অন্য সিগন্যাল। লাল পাড় হেয় হলুদ ক্রস করে সবুজ...।

ছাতা আবিষ্কারক যেন কে ছিলেন! কিছুতেই মনে পড়ছে না! মনে মনে সেই আবিষ্কারক ভদ্রলোকটিকে গাল পাড়ল সুজন। এই ছাতা... শালা... এই ছাতা... এই শুয়োরের বাচ্চা ছাতাই মানুষকে আড়াল করে রেখেছে কতকাল। অস্তিত্বকে ঢাকাচাপা দিয়ে রাখছে। সুজনের কোন আব্রু নেই। ছাতা নেই।

আচ্ছা... ছাতাও তো একপ্রকার মুখোশই না কি! শুধু মেলায় বিক্রি হয় না এই যা। কর্পোরেট অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকা কর্তাব্যক্তির মুখে ফুটে ওঠে না... এই যা। সুজন মুখোশ ছিঁড়তে ভালবাসে। মুখোশ কিনতেও।

ধুর ধুর... গোটা কলকাতাই তো মুখোশ এঁটে রয়েছে। ছাতার আবডালে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। এই যেমন, সুজন, কলকাতার খণ্ডাংশের প্রতিনিধি হয়ে, ছাতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধতার দলনেতা হয়ে, কেবল জল ভাঙছে। ছাতাও খুঁজছে কী! পথচলতি সারি সারি রং-বেরংয়ের ছাতা দেখতে দেখতে তার ভেতরে প্রতিরোধ জন্মাচ্ছে। বিচিত্র রকম আক্রোশ জেগে উঠেছে। এক্ষুনি সবলে কারোর ছাতা কেড়ে নেবে সে। হয়ে উঠবে ছাতা-সভ্যতার অনুগামী। ঝমঝম... ঝিরঝির... ঝপাসঝপ্...

দৃশ্য এক

উত্তর কলকাতার প্রাচীন এক রেস্তোরাঁর পর্দাঘেরা ছায়াময় টেবিল। ঠিক মাঝখানে একটু আগে-পরে রাখা ধোঁয়াওঠা চাউমিন দু-প্লেট। দুটো জলভর্তি-জলশূন্য কাঁচে

গেলাস। মুরগি না পাঁঠা। সুজনের উলটো দিকে সবুজ সালোয়ার, কী যেন নামটা! অন্বিতা বোধ হয়।

- তুমি এত এত ভেঙে পড়ছ কেন সু...? হলই বা ক্যানসার... গলায় হলেও... আজকাল তো সেরে যাচ্ছে। অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠছে। তুমিও হবে। শোনো, ডাক্তার ভগবান নয়। তুমি না করলেও আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরে। কিচ্ছু হবে না, ডাক্তার তোমায় দু–মাস সময় দিয়েছেন তো, তার মধ্যে তোমার কেমোথেরাপি হবে। তোমার কিচ্ছু হবে না, দেখো...

– আমি বাঁচবো না অনু... তুমি জান না আজকাল সবসময় আমি মৃত্যুকে বরণ করে বেড়াই। আমি মৃত্যু দেখতে পাই। আমার মুখে... এই দেখো মরনের ছায়া... তুমি শুধু বলো, তুমি আমার, তুমি আমারই আর কারো নয়...

– শান্ত হও, শান্ত হয় সোনা... আমি তো তোমারই, আর কারো নয়...

– না, অনু, না, আমি ভয়ানক ফোবিয়ার মধ্যে ঢুকে গেছি। জানো কাল রাতে আমার ঘরের ভেন্টিলেটারে একটা চামচিকে ঢুকেছিল, কী বীভৎস কালো আর বিছানায় শোয়া আমাকে জুলজুল করে দেখছিল। উফ্ কী ভয়ানক ওর পুঁতির মতো কালো চোখ দুটো। ও–না আমাকে...ও আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল... অনু, তুমি আমাকে বাঁ–বাঁচাও, আমি আর বাঁচবো না অনু...

– চুপ করো আমার কথা শোনো

– না, না, অনু...

– চুপ, না হলে আমি কিন্তু এবারে বকবো তোমায়...

– ওহ্, আচ্ছা ব–বলো

– শোনো, আমি বলছি, তোমার কিছু হবে না – ওসব তোমার মনের ভুল। তুমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলো তো...

– না অনু, আর পারছিনা আমি... আমার পাশে তুমি আছো তো? আছো তো? বলো আছো?

- আমি তো তোমার পাশে সবসময় আছি সু।
- না না এই দু'মাস আর মাত্র দু'মাস।
- কিচ্ছু দু'মাস–টু'মাস নয়! ওসব উদ্ভট কথা একদম বলবে না–
- মাত্র দু'মাস, অনু মাত্র দু...
- চুপ! এই তোমার ঠোঁটে আঙুল রেখেছি এবার বলো দেখি দু'মাস... বল দেখি...? যতো জোরে বলবে, ততো জোর দিয়ে আমি তোমার ঠোঁট চেপে ধরবো এইরকম করে ঠোঁট কামড়ে দেবো – উ ম্ ম্... এবার বলো...? বলো দেখি?

দৃশ্য দুই

কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে একটি স্বল্পখ্যাত নির্জন পার্ক। একটা জারুল গাছের নীচে বড় একফালি প্লাস্টিকের ওপর একজোড়া মানুষ। বৃষ্টি থেমে গেছে কখন যেন। শেষ বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে হাওয়ায় হাওয়ায়।

সুজন শুয়ে আছে নীলশাড়ী–পরা কারো কোলে। সম্ভবত একটু আগে সে কেঁদেছিল। চোখের কোনে বেয়ে গালে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুরেখা জিভ দিয়ে চেটে দিচ্ছিল তৃণা...।

একটু তফাতে আশেপাশে, বিচ্ছিন্নভাবে একাত্ম হয়ে শুয়ে আছে আরও কয়েকটি জুটি।

- তুমি আমার কথা কেন বুঝছো না তিন্নি, আমার দুটো কিডনিই যে শেষ! ভয়ঙ্কর নেফ্রাইটিস গ্রাস করেছে আমার শরীর, আমার... আমার... হঠাৎ হঠাৎ জ্বর হয়... তিন্নি আমি, স্বাভাবিকভাবেই ইউরিন করতে পারি না আজ কতকাল হয়ে গেছে...

- অ্যাই আমি–আমি না... তুমি তো আমার ধেড়ে বাচ্চা... না... না... কাঁদবে না... আমি তো রয়েছি... কিচ্ছু হবে না... আমি তোমায় আদর দিয়ে সুস্থ করে দেব।
- না, তিনু... দুটো কিডনি বিকল হলে, মানুষ স্বাভাবিক থাকে না। আমিও নেই। মানুষ... মানুষ... বাঁচে না... তিন্নি... আমিও আর... আর... বাঁচবো না!
- আবার এসব অলক্ষুনে কথা... বারণ করছি তো...
- না, তিন্নি... ডাক্তার... ডাক্তার বলেছেন...
- গুলি মারো ডাক্তারকে। আমি বলছি কিছু হবে না। এই তো তোমায় জাপটে ধরে আছি।
- তিনু... আমার তিন্নি... আমি...
- হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি... তুমি চলো তো... আমার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ... কলেজের এক্সকারশনে সবাই যাচ্ছে। আমিও বাড়িতে তাই বলেছি। তোমাকে নিয়ে চলে যাব বহরমপুর... দুটো দিন আমার সঙ্গে কাটাও তো... তোমার সব অসুখ আমি নিয়ে নেব...
- তুমি, তুমি, আমাকে এত ভালোবাস তৃণা?
- হ্যাঁ সুজন, আমি নিজেও তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমি কিছুতেই হারাবো না। হারতেও দেব না...।
- কিন্তু... কিন্তু...
- কোনও কিন্তু নয়... এই দ্যাখো, আমার কোল জুড়ে... আমার বুকের ভেতর তুমি... শুধু তুমি...

দৃশ্য তৃতীয়

রাত বোধহয় ন'টা সাড়ে নটা ও হতে পারে থমথম করছে একদম বন্ধ করার সংকীর্ণ বলি সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকার মাখা গলির মুখে মিটমিট করছে একটাই রাতারাতি ক্রমশ অন্ধকার আরও অন্ধ হয়ে যাচ্ছে

এই বাইলেনের কোনো নিরাপত্তা নেই কানা গলি স্বজনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে তার নাম সোহিনী হলেও হতে পারে আর দুজনের মধ্যে কার ফাক টুকু ইঞ্চির বেশি নয় সেখানে নিস্পন্দ আকার নিয়ে জমে আছে

– বাবুই, তুমি কেন বুঝতে পারছ না... এই রোগটার নাম ডিমনেশিয়া... আমার মাথা আস্তে আস্তে কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে...। স্মৃতিশক্তি প্রতিদিন কমছে। আমার ব্রেন ধুঁকছে বাবুই... ব্রেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে...। আমিও...
– শোনো সু, আমি থাকতে তোমার কোনো অসুখ হতেই পারে না।
– না, ডিমনেশিয়া...
– ইন্দোনেশিয়া
– তুমি ইয়ার্কি মারছ?
– হ্যাঁ, মারছিই তো। যতসব আজেবাজে চিন্তা!
– না, এটা আজেবাজে নয়... আমার স্মৃতি দ্রুত চলে যাচ্ছে! এই অবস্থায় তুমি আমার সঙ্গে জীবন কাটাতে চাইছো কেন? পারবে?
– একশোবার পারবো। হাজারবার পারবো।
– আমি... আমি... যদি একদিন তোমাকে ভুলে যাই, যদি চিনতে না পারি? লং টার্ম লস–অফ–মেমোরি কী জিনিস তা তুমি জান না!
– নিকুচি করেছে মেমরির। ওকে মেমারিতে পাঠিয়ে দাও।
– আমি সত্যি বলছি–
– হ্যাঁ, আমি জানি তো... তুমি সত্যিই বলছো। আমার সু মিথ্যে বলতেই পারে না... কোনদিন শেখেনি তো...
– হ্যাঁ বাবুই ফর গড সেক –
– শোনো... আমি তোমার মনের ভেতর ঢুকে চুপট করে বসে থাকবো, সারাজীবন। আর আমি তোমার ভেতর থাকলে তুমি ভুলবে কী করে?

– না, বাবুই আজকাল তোমার ভালো নামটাও আমার আর মনে পড়ে না, এমন কী মাঝে মাঝে নিজের নামটাও ভুলে যাচ্ছি। এই মনে আসে... আবার হারিয়ে যায়... দ্যাখো... আমার বুকে হাত রেখে দ্যাখো কেমন ধক্‌ধক্‌ করছে...

– উঁহু, তুমি আমার বুকে হাত রেখে দ্যাখো... কেমন ধকধক করছে...

– বাবুই!

– কোনও কথা নয়। এই আমি তোমার হাত আমার বুকে রাখলাম... ধকধক করছে টের পাচ্ছো তো?

– না, বাবুই শোনো...

– এই আমার বুকে কান পাতো। স্পষ্ট শুনতে পাবে...

– বা...

– শোনো, শুনতে পাচ্ছ না? কোথায় গেলো তোমার ডিমনেশিয়া?

– আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না বাবুই!

– কে বাঁচতে বলেছে, আমাকে ছাড়া?

– কিন্তু আমার যে...

– হ্যাঁ, তোমার যে সোহিনী আছে, বাবুই আছে না... তাকে ছাড়া তুমি আর কেউ নও...

– হ্যাঁ বাবুই, হ্যাঁ, আমার তুমি আছো। তুমি... তুমি... সোহিনী...

বৃষ্টি আবার শুরু হলো বুঝি ওই! রাত কত হল কে জানে! চটির প্রতিটি ধাক্কায় কাচগুঁড়োর মতো জল ভাঙতে ভাঙতে এগোচ্ছিল সুজন। একা। এই বৃষ্টির শরীরে পরতে পরতে নিজেকে মুড়ে নিচ্ছিল সে। সে জানে না, সে কোথায় এসেছিল! যাবেই বা কোথায়! তবু কোথাও একটা পৌঁছানো দরকার। হয়তো কোনও এক ছাতার তলায়। গাঢ় মিশমিশে ছাতা। তার অন্তরে একটা অজানা উদ্বেগ জন্ম নিচ্ছিল... আবার মরে যাচ্ছিল। জন্মাচ্ছিল আবারও।

যদি কাল সকালে আর বৃষ্টি না হয়! সমুদ্র না হয়ে ওঠে এই শহর, তখন কী হবে!

ছাতা আবিষ্কারকের নামটা যেন কী... বাড়িটাই বা কোথায়... কোথায় পাওয়া যাবে, অসংখ্য সহস্রা নানা মাপের বেমানান– মানানসই ছাতা!

আরো অনেকগুলো নাম বাকি আছে যে; আরো কত শত অসুখ...। ওই যে আবার শুরু বিড়বিড় করল, 'কেউ নেই... এ জগতে আমার কেউ নেই...'

@ কবিতা - ৩

সু দী প্ত মা জি

প্রলয়গীতিকা / ২

এইসব ভাঙাচোরা বিকেলগুলোর কথা মনে রেখো তোমরা,
এইসব কষাটে স্বাদের ফল হয়ে ঝুলতে থাকা সকালবেলার কথা!

ভাঙা হারমোনিয়ামের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে গোখরো সাপ ।
পরিকীর্ণ হয়ে উঠছে ব্যোম
লোকজনের উপছে পড়া দীর্ঘশ্বাসে!

মায়াবী সন্ধের নদী, কতদিন তোমাকে দেখিনি!

কারাগার হয়ে ওঠা বাড়িঘর, কবে আবার জানলা খুলতে শিখবে?

মায়ামৃদঙ্গের বোলে জেগে উঠবে শিখীপাখা, রঙের উৎসব?

জিজ্ঞাসাচিহ্নের পাশে বড় এক কুয়াশা জমেছে!

অ র বি ন্দ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

কোয়ারেন্টিন

আজ নৈসর্গিক দুর্যোগ
কম্পিত করে মহাবিশ্ব
কোয়ারেন্টিন বাস দুর্ভোগ
মানুষে মানুষে নয় স্পৃশ্য ।

এক্ষণে করোনা'র স্টেজ থ্রি
বর্ধিত মানসিক উদ্বেগ
কোন্ উপায়ে রাখি পোড়া মন ফ্রি
ভাইরাস ধায় ঝঞ্ঝার বেগ ।

অনাহারে থেকে মন আনচান
কোন্ বর্গীকে বলো রুখবো ?
প্রশাসন ফতোয়াতে টানটান
কুকুরের মতো ধুলো শুকবো?

ফুলেফেঁপে উঠে ব্ল্যাক মার্কেট
প্রশাসন দেখে শুনে অন্ধ
অভুক্ত গরীবের খালি পেট
শোঁকে শুধু সরকারি গন্ধ ।

ঘরে ঘরে নিশ্চিত অনাহার
পুঁজি শুধু রেশনের ভিক্ষা।
লুটেপুটে করে কেউ ফলাহার
ধনীদের জাগেনা তিতিক্ষা ।

রাত্রি কি চিরকাল থাকবে ?
আগামী দিনেই দেখো সূর্য
ভীমরবে তার হ্রেষা হাঁকবে
পূর্বে বাজিয়ে রণতূর্য ।

সু লে খা স র কা র
কোভিড-নাইনটিন

'দ্য আইজ অব ডার্কনেস' লিখতে গিয়ে
ডিন কুৎসজের ঠিক কি ভেবেছিলেন ?
মাইক্রোঅর্গ্যানিজমের ৪০০তম ভাইরাসটিকে তিনি
কতটা ধ্বংসকারী হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন গল্পে ?

ঠিক ৩৯ বছর পর বিশ্ব-মড়ক
মৃত্যু আর গণকবরের পাশে পঙ্গু সড়ক
লকডাউন। আজ রোজগারহীন কোটি হাত
কয়েকশ কিমি রাস্তা পার করে অনাহারী জাত
চলছে চলছে জীবনের দিকে...

সাট ডাউন। অধিকাংশ অনুপস্থিত
টিমটিম চলছে ফিভার ক্লিনিক
বিপজ্জনক ভাইরাসে বাড়ছে ভীতি
করোনা-কোষ খাচ্ছে বিশ্ব-অর্থনীতি
ভেঙে পড়ছি আমরা ও ঈশ্বর।

দেশ এখনো চিহ্নিত করেনি কোনো শত্রু
বিতর্ক, ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পিত মৃত্যুর গসিপ গিলছে উনুন
ভাইরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের দরজায়
চুপ বসে আছি শরীরহীন আর পড়ছি বারবার
'স্ট্রং প্রিভেনশন এন্ড কনট্রোল। ডোন্ট প্যানিক।
ফলো দা অফিশিয়াল ইনস্ট্রাকশান।
বিলিভ ইন সায়েন্স। ডোন্ট স্প্রেড রিওমার।

সু ব্র ত দা স

লকডাউন মেমরিলেন

একাশি হাজার নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে আমি ক্রমশ বুঝেছি মৃত্যুরহস্য
দেখেছি কালপুরুষের পায়ের নীচে কি বাধ্য এক শিকারী কুকুর ওৎ পেতে আছে
আমি তার নীল চোখের দিকে তাকিয়ে আমার শৈশবের পুকুরে তিনটি অবাধ্য ছোট মাছ খুঁজেছি
অথচ গ্যালাক্সির ব্যস্ত ট্যাক্সিতে চেপে আমি প্রতিদিন খুবলে খেয়েছি হৃদয়ের বিশুদ্ধ হরিণ
আর পুতুল পুতুল খেলার সংসারে তিন মুখ তিনদিকে ফেরানো ....
যেন এক প্রচণ্ড বৈদ্যুতিন সাপ আমাদের স্বর্গচ্যুত করছে বিষাক্ত নিঃশ্বাসে

আমি আপেলের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইছি নিউটন
আবেগ ও উষ্ণতার হৃদয়চিহ্নে সমস্ত পিছুটান ফিরে পেতে
সেই মৃত্যুগহ্বরের মুখে লকডাউনের নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছি

আমি ছুঁয়ে দেখবো কচিকলাপাতা ...... আমার বৃদ্ধ বাবার তুলোট আঙুল
আমি মায়ের পায়ের কাছে বসে চাল থেকে যত্ন করে বেছে দেবো আলতো কাঁকড়
আমি আজ সবকিছু ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে বলতে চাই

মৃত্যু যতই চোখ রাঙাক, আজ আমি জীবনের কাছে নতজানু।

অ রি ন্দ ম চ ট্টো পা ধ্যা য়

মরু বাতাস ও গৃহবন্দী

ঘরের বাইরে মরু বাতাস
গৃহবন্দী মন, তন্দ্রাচ্ছন্ন
রাত্রি গভীর থেকে গভীরে
চাঁদমারি মাঠ অপরাজিতায় রঙিন
টিলা বেয়ে নেমে যায় অলৌকিক আভা
সামনে অপার্থিব দুটি চোখ
রুদ্ধ বাক, দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে...
কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগত
কিছুটা সময়, উড়ে যাচ্ছে অজানা পথে
নদীর ঢেউয়ের মতন লাল সড়ান
যেদিকে দিগুলি, নদীজল এসে ছুঁয়ে যেত
কত কথা এসে যায়, অভিমানী করিড়োর
অমলতাস গাছ, দেবদারু, আকাশ ছুঁই ছুঁই
ইউক্যালিপটাস,ভাঙা প্রাচীর, শিশির ভেজা সকাল
শীত যাই যাই বিকেল, ঘুঘু ডাকা দুপুর, শ্রাবণ-সন্ধ্যা
সব এসে যায় ঘুমঘোরে, আবার চলে যায়.......

ঘরের বাইরে মরু বাতাস ও গৃহবন্দি.......

অ রু ণি মা

অপেক্ষা

বেশ কিছু রাত তারা খসা দেখি না
বদলে একটা একটা মৃত্যুর সংখ্যা গুনি
শুকনো পাতা ঝরার গন্ধে চাপা থাকা
আমের বোলের গন্ধ খুঁজে চলি
ফুলদানির শুকনো ফুল ফেলে দিয়ে
কুঁড়ি শুদ্ধ সবুজ পাতা গুঁজে রাখি
তারপর উঠে এসে সোফার এক কোণে

মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ গুজরাট দিল্লি তেলেঙ্গানা
তেলেঙ্গানা দিল্লি গুজরাট মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র

ফুলদানির জলটা বদলে দিতে হবে ...

সৌ র ভ চ ট্টো পা ধ্যা য়

গাছকথা

পাখিদের ডানা থেকে উড়বার ইচ্ছেগুলি
ভাইরাল ছুঁয়ে যাচ্ছে শিকড়ের পা
ঠা ঠা রোদে ঘুড়ি দেখতে দেখতে
যতখানি স্বপ্ন বেড়ে উঠেছিল গাছেদের বুকের ভিতর
কুঠার শাণিত হলে তারা আজ মিছিলে সেজেছে
পায়ে পায়ে মোমবাতি হাতে এঁকে গেছে আলপনা ব্যথা
শেষমেষ তবু সত্যি সত্যি উড়ে যেতে হবে
নিজস্বভুমি ছেড়ে নোম্যান্স ল্যান্ডের আকাশে

অ ঞ্জ না দে ব রা য়
যদি দুঃসময় আসে, আরো সতর্ক হতে হয়

রাজডাঙ্গার খেলার মাঠটার দিকে ছেলেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে
মাথার ওপরে খোলা আকাশ, আকাশে কোন প্লেন নেই
বিকেল সাড়ে চারটে হলো, পায়ে কোন বল নেই, দৌড়ানো নেই
করোনার লকডাউন এর জন্য সমস্ত জীবনযাত্রা জবুথবু
বাধা নিয়মের বাইরে তাকানো বারণ।
সমস্ত বিক্রেতারা মাথায় হাত রেখেছে
চারিদিকে বিছানা ত্রাস আর সতর্কতা
যেন আতঙ্ক এসে বসেছে ঘরে ঘরে
মুখোশে ঢাকা মানুষ দূরত্ব বজায় রেখেছে
পুলিশ-গাড়ির বাঁশি বেজেছে, পালাও পালাও রব।
দুঃসময় এখন আরো করুণ হতে চায়
অজস্র চৈতন্যের আলো চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যায় আতঙ্কে,
তবু চোখের আলোয় পুরনো স্মৃতিটুকুকে যত্ন করে ধরে রাখা,
দুশ্চিন্তার ঝড় নিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি,
ঘুম ভাঙিয়ে ছি সোনালী সকালে সুদিনের খবর আসবে বলে,
শুনবো শুধু পুরো পৃথিবীটা সুস্থ আছে, মহামারী ঝড় থেমে গেছে।

স ম রে শ ভৌ মি ক

মড়কের শেষে

অনু পরমাণু আর জীবাণুর রূপে
দেবতার খেলা হয়তো বা নয়। কিম্বা বিজ্ঞানের
বিস্ময়ে অজানাতে দিয়েছি পাড়ি বহুবার।
আকাশের তারা ভরা অন্ধকার নীলিমার ডাকে-
মনের গহন কোণে কাটিয়েছি কত রাত।
জটিল প্রশ্নমালার মতো এক এক করে
এসেছে প্রেমের বার্তা। ধ্বংসেরও হাতছানি
উপেক্ষা ভরে জীবনে দিয়েছি পাড়ি সেখানে।
বহুবার বেঁচে গেছি । মৃত্যুর ডাকে তবুও-
দিই নি তো ধরা। পালিয়েছি বহুবার।
মৃত্যুর ফাঁদ এভাবে পাতা হবে জেনে
কেউ কি কখনো হাঁটে? জেনেছি তাও।
বিস্ময়ের অবশেষ এসেছে এবার
জীবাণুর অদৃশ্য বাসনায়। তাও
অতিমারী রূপে। 'করোণার'বেশে।
সন্তানের অসহায় মুখ, বাবা-মার চোখে
কিংবা মৃত পরিজন উচ্ছিষ্ট অন্তেষ্টি যোগে
স্বর্গে বা নরকে অভেদময়।
শহরের রাজপথ পাশে উঁচু কক্ষ তলে
মাসেক অধিককাল আগে, যে আলোটি

জ্বলেছিল মানুষের কত কথা ভেবে।
এখন সেখানে দখিনা বাতাসে ভাসে
মারী আর মড়কের ফেলে যাওয়া
পুতি গন্ধে ভরা ধ্বংসের নিশ্বাস।
অতিদূর পাড়াগাঁর গরীবের ঘরে
যে শিশুটির হাসি; মায়ের মলিন মুখে
এনেছিল খুশি। মারী আর মড়কের
হাতে মারা গেছে সেও মার সাথে।
কোন দেবতার দেখা নেই আজ, তবু
বিজ্ঞানবলে অসাধ্য সাধনে অনেকে
টিকে যাব, হয়তো বা যাবে কোনো ভাবে।
মড়কের আঁচড়ের দাগ বুকে নিয়ে
অনেক শতক পর মানুষের রূপে নয়
কোন এক অজানা উন্নত জৈবিক দানে
মুখরিত হবে পৃথিবী আবার মড়কের পরে।

সা হা না রা খা তু ন

না গাওয়া গান

জীবনের গান গাইবে ব'লে
মৃত্যুর সাথে লুকোচুরি খেলেছে কদিন....

প্রথমে বাড়ির শোফা থেকে মায়ের বুকে!
তারপর মোবাইল ফোনে এমার্জেন্সি নাম্বার, অ্যাম্বুলেন্স, হসপিটাল, আই সি ইউ,
ডক্টর, নার্স, সূঁচ পর্যন্ত !
অবশেষে কাকভোরে অগণিত কাকের কর্কশ ডাক!
প্রতি মূহুর্তে জীবনকে বাজি রেখে জীবনের গান গাইতে চেয়েছিল সে!

মায়ের পছন্দ বরাবরই সাদা...
বাবার নীল...
মেয়েটির লাল...
আদর ক'রে দিদুন ডাকত পরী, ও পরী-

সাদা ধোঁয়ার কুন্ডলী পাকিয়ে দূরের নীল আকাশে
মিশে গেল একটা স্বপ্ন!
লাল লাল তারাদের ভীড়ে কোনো একটা তারা আজ যেন
বড় বেশি উজ্জ্বল!

১লা বৈশাখের লাল জামাটা এখনো ভাঁজ করা!
আজ ২রা বৈশাখ!

ম হ: কু তু বু দ্দি ন মো ল্লা

বাঁচার লড়াই

পৃথিবী এখন বড় অসুস্থ স্তব্ধ জীবন,
চারদিকে শুধু মৃত্যু-মিছিল হৃদয়-কাঁপানো শিহরণ!
শঙ্কিত রাত অবিরাম কাটে ভয়াবহ এক আতঙ্কে,
নীরব-দিবস পার হয়ে যায় মৃত্যুর মৌন ডাকে!
আত্মীয়-স্বজন যত আর পরিচিত যারা,
খবরাখবর নিতে থাকা শুধু ফোনে ফোনে দিশাহারা!
কেউবা তাকায় বিজ্ঞানে আর কেউবা স্মরে ঈশ্বরে,
কেউবা দূষছে চীনকে কেউবা ধর্ম ধর্ম করে!

মহামারী না এ অতিমারী সব যে- যা বলুক-না কেন,
মরণ-রোগ এ মারণ-রোগ এ অতি ভয়াবহ জেনো!
বিশ্ববাসীর একটাই সুর বাঁচে কিসে প্রাণ,
সবার এখন একটাই ধ্যান বিশ্বজনের ত্রাণ!
একটি দিনের ধর্মঘটে ক্ষতি কত সারা দেশে,
মাসকে মাসের লকডাউনের প্রতিফল ভাবো বসে!

তবুও মানুষ হয় কি চেতন ভিড়ের মধ্যে আড্ডা মারে,
বেপরোয়া ভাবে চলছেই তারা কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে!
এমন রোগ এ মানুষকে দূরে রেখেছে সরিয়ে,
তফাৎ মিটার অন্যথা হলে বিপদ আসবে ঘনিয়ে!
হাঁচি-কাশি সব সামলাতে হবে চলতেই হবে সামলে,
মানুষকে দেখে আতঙ্কে থাকা দেখেছে কে কোন কালে!

শঙ্কার মেঘ কেটে যাবে ত্বরা আসবে সুদিন,
ধরাতে ফিরবে স্বস্তি-শান্তি রবে না কুদিন!
মানুষে মানুষে প্রীতির বাঁধন হোক চির অক্ষয়,
সব ভেদাভেদ সরিয়ে মানুষ জাগুক মানবতায়!

@ প্রবন্ধ -৩

দী প ঙ্ক র আ র শ

স্থির পৃথিবীর খোঁজ : বদলি বসত

একটি মানুষ সময়ের বুকে হামাগুড়ি দিয়েই বড় হয়, জীবনের ইতি টানে। সেই মানুষটি যদি হয় শিল্পী তাহলে 'সেই সময়' তাঁর ইজেলে ছবি হয়ে ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। অন্তত সৎ শিল্পীর কাছে সেটা প্রত্যাশিত। সেই হিসাবে কথাশিল্পী সোহারাব হোসেন (১৯৬৬-২০১৮) প্রত্যাশা অনেকটাই পূরণ করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে সময়ের এক উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়েছে। তিনি যে সময়-সচেতন একজন শিল্পী এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস পাঠে খুব স্পষ্টভাবে এই সত্য অনুধাবন করা যায়। দেখা যায়, নিজস্ব সমাজে তথা সময়ের থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজে 'নষ্ট শশা' ও 'পচা চাল কুমড়ো'র মতো রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব, সমসাময়িক সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, মাওবাদী সমস্যা, তৃতীয় বিশ্বের উপর পণ্যায়নের থাবা, ভোগবাদ, বিকৃত যৌন-লালসা-- এরকম বহু বিষয় তাঁর রচনায় ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশ শতকের নয়ের দশক থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সেইসব বিষয়গুলিকে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং শিল্পরূপ দিয়েছেন।

সময়ের উপর এই নজরদারির অনেকগুলি সৃষ্টির মধ্যে একটি 'বদলি বসত' (২০০৯)। যৌনতা-পোকার সন্ধানে এই উপন্যাসে লেখক রূপ দিয়েছেন একগামিতা ও বহুগামিতার দ্বন্দ্বকে। সেখানে স্পষ্ট হয়েছে লেখকের নিজস্ব জীবনদর্শন। কেবল যৌনতাকেন্দ্রিক মানবমনের জটিল চিত্ররূপ বড় কথা নয়, সেখানে একটা স্থির পৃথিবীর খোঁজ তিনি করেছেন। উপন্যাসটি যদি কেবল ছবিমাত্র হত তাহলে হয়তো পাঠকের কাছে ততটা সমাদরের দাবি করতে পারতো না। বাহ্যকে ছাড়িয়ে বক্তব্য গভীরে পৌঁছাতে পারার কারণেই উপন্যাসটি পাঠকের কাছে সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। এর সঙ্গে

যুক্ত হয়েছে লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে বক্তব্যের উপস্থাপন। যাতে এর গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে সোহারাবের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ কথাসাহিত্যিক রক্তিম ইসলাম, যিনি বহু স্থানেই সোহারাবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং যাঁর কথামতোই সোহারাব 'বর্তমান' পত্রিকার সাংবাদিকতার চাকরি ছেড়ে পড়া ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তিনি এই উপন্যাসের প্রশংসার পাশাপাশি অপূর্ণতা সম্বন্ধে বলেছেন—"ডালপালার বিস্তার নেই বলে বৃক্ষটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারল না।"[১]

কিন্তু 'বদলি বসত' উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য খুব বেশি গ্রহণীয় নয়। কারণ, 'বদলি বসত' উপন্যাস হিসেবে পরিচিত হলেও এটি আসলে একটি নভলেট। বড়ো গল্প ও উপন্যাসের মাঝামাঝি এর অবস্থান। ফলত কাহিনির ডালপালা এখানে আশা করা যায় না। নভলেট আসলে কী, লেখক তা এই গ্রন্থের ভূমিকাংশেই স্পষ্ট করেছেন। সেখানে মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে তিনি কথাসাহিত্যের বিভিন্ন ফর্মকে তুলনা করেছেন—"অনুগল্প = অপূর্ণাঙ্গ বীজাকারে থাকা ভ্রূণ, ছোটগল্প = পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ, বড়ো গল্প = ভূমিষ্ঠ শিশু থেকে বালক-কিশোর, নভলেট = অবিবাহিত তরুণ যুবা এবং উপন্যাস = প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পূর্ণ মানুষের আচার-প্রকৃতি-ধর্মকেই বুঝে থাকি।"[২] তিনি আরও জানিয়েছেন—"নভলেটে প্রাপ্ত ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো বহুপল্লবিত বৃক্ষ-বিস্তার থাকে না ঠিকই তবে খনন ও দায় থাকে।"[৩]

নভলেটের ধর্ম মেনেই লেখক 'বদলি বসতে' হাজির করেছেন গল্পের ভিতরে গল্প এবং তারও গভীরে গল্প। উপন্যাসে মূল কাহিনি অর্ণব ও স্রোতস্বিনীর। তাদের গল্পের সমান্তরালে রয়েছে আলোক ও অপর্ণার কাহিনি এবং রূপক-প্রতীকের আড়ালে হাজির হয়েছে বাঘ-শেয়াল হরিণের রূপকথার গল্প। মূল গল্পের পাশাপাশি উপকাহিনি বা এপিসোড নয় অন্য গল্প দুটি। মানবজীবনের চিরকালীন এক সত্য ধর্মকে, তার সঙ্কটকে এবং নিজস্ব জীবনদর্শনকে রূপায়িত করতে অর্ণব ও স্রোতস্বিনীর গল্পেরই অংশ অন্য দুটি। তিনটি কাহিনিবৃত্তকে একসাথে গেঁথে লেখক একগামিতা ও বহুগামিতার দ্বন্দ্বপ্রবাহটিকে এবং স্থির পৃথিবীর অন্বেষণকে শিল্পসম্মত রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

আদর্শগত দিক থেকে বহু মানুষই একগামিতার পক্ষে সওয়াল করেন। বস্তুত তার মধ্যেও যে কত মিথ্যা লুকিয়ে রয়েছে-- বহুগামিতার বীজ নিহিত, সোহারাব হোসেন সেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। মানবজীবনের গূঢ় রহস্যকে দাম্পত্য সম্পর্কের উপর ছুরি কাঁচি চালিয়ে বের করে এনে পাঠকের সামনে নগ্নভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক বিশ্বাসী একগামিতায়। বহুগামিতা ও একগামিতার দ্বন্দ্বে সে স্ত্রী স্রোতস্বিনীকে জানিয়েছে—“আমি অ্যাখনও প্রেমের অ্যাকমুখীনতায় বিশ্বাস করি। যতোই মানুষ ভোগের পথে ম্যারাথনে নামুক-না-ক্যানো প্রেমের স্থির প্লেটে তাকে বসবাস কোরতেই হবে।”[৪] অন্যদিকে স্রোতস্বিনী মনে করে একনিষ্ঠ প্রেমের যুগ আর নেই, “প্রেম অ্যাখন ছেলেমেয়েদের বুক পকেটের কার্ড। পছন্দ হলে পকেট থেকে তুলে অন্যের পকেটে জমা দ্যায়। না-হলে টুপ-কোরে তুলে নেয়, ফের আর অ্যাকজনের পকেটে জমা রাখে। কোথায় প্রেম?”[৫] আত্মপক্ষ সমর্থনে সে কখনো ত্রিশ শতাংশ স্বামী-স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের সমীক্ষার কথা তুলে ধরেছে, আবার পুরুষের অন্য নারীকে কল্পনা করে সহবাস বা হস্ত-মৈথুনের বিকৃতির কথা জানিয়েছে। তার মতে, বস্তুত মানুষ আর পশুর মধ্যে খুব বেশি তফাৎ নেই। জন্মের পর থেকে মানুষ এই পশু-স্বভাবকে জয় করতে থাকে। যে যতটুকু জয় করে সে ততটুকু মানুষ। আর বহুগামিতার পাঁক গায়ে মেখেই সত্যিকার প্রেমপদ্ম ফুটে ওঠে।

প্রাথমিক পর্যায়ে সনাতনী আদর্শে বিশ্বাসী অর্ণব স্ত্রীর কথা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি, মেনে নেয়নি। বারবার আঁকড়ে ধরেছে একগামিতার শিকড়কে। তার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছে। সুলেখার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবে স্ত্রীকে চড় মেরেছে। তার মনে হয়েছে বসত বদলের সুখ পেতেই হয়তবা স্রোতস্বিনী তাকে বহুগামিতার রাস্তায় ঠেলে দিতে চাইছে।

একগামিতায় কট্টর বিশ্বাসী এই অর্ণবের বিশ্বাসের ভাঙন ও বহুগামিতায় আত্মবিসর্জনকে শৈল্পিক নিপুণতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সোহারাব হোসেন। প্রেম-পীড়িত সুলেখার সঙ্গে মিলনের বারংবার হাতছানিতে শেষ পর্যন্ত সে সনাতনী একগামিতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ‘বউ চেনা’ নামক মজার খেলায় জয়লাভ করে যে গৌরব

সে অর্জন করেছিল তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। এখন সে স্রোতস্বিনীর মতোই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে—"মানুষ বস্তুত বহু বসতের কারবারি। আশ্চর্যের হলেও এই বিশ্বাস, অ্যাখন, তাকে সুখী করে। আনন্দ দেয়।"[৬]

বহুগামিতার সাথে একগামিতার দ্বন্দ্বে একগামিতার পরাজয়ের ছবির মধ্যেই যদি বিষয়টা সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে লেখকের শিল্পদক্ষতা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন চিহ্ন উঠত। কারণ এই যৌনতা এবং যৌন-মনস্তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যে নতুন কোনো বিষয় নয়। চর্যাপদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই যৌনতা, যৌনতাকেন্দ্রিক নারী-পুরুষের মনোভূমি ও ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিকভাবেই চলে আসছে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব-পদাবলি, মঙ্গলকাব্য-- প্রাচীন-মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যধারায় আনাচে-কানাচে এর অস্তিত্ব সহজলক্ষ্য। আধুনিককালের সৃষ্টি কথাসাহিত্যেও জন্মলগ্ন থেকে স্থান পেয়েছে যৌনমনস্তত্ত্বের কথা। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চোখের বালি, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি ইত্যাদি বহু উপন্যাসের নাম করা যায় যেখানে মানব-মনের ও দেহের বহুগামী ধর্ম অনেকসময়ই চরিত্রগুলির নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছে। সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ', অচিন্ত্যকুমারের 'কলঙ্ক', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কান্ডারী', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' ও 'কন্যা', গৌরকিশোর ঘোষের 'জবানবন্দি' অতি পরিচিত এসব গল্পের কেন্দ্রে কোন সংকট স্থান পেয়েছে আমরা জানি। অর্থাৎ, শুধু একগামিতা বহুগামিতার দ্বন্দ্ব ও একগামিতার পরাজয়ের ছবির মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি আলোচ্য হয়ে ওঠার কোনো দাবিই রাখতে পারে না। দাবিটা কোথায় পূর্বেই সে উল্লেখ আছে। এখন কাজ হল নভলেটির পাতার ভাঁজে সেই সত্যতার প্রমাণ খোঁজা।

লেখক অস্থির পৃথিবীর পথ-পরিক্রমায় স্থির পৃথিবীর খোঁজ করেছেন অর্ণবের ডায়েরীর পাতায় 'আলোক-অপর্ণার' কাহিনির মধ্যে। যেখানে অপর্ণা মৃত্যু পথযাত্রী স্বামী আলোকের চোখে দেখতে পেয়েছে জলের উপর ভাসমান তিন চারটি স্থির প্লেট। সেই প্লেটের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী। এই পৃথিবী সবুজ অরণ্য ও শস্যক্ষেত্রে ভরা। 'সংযমের পর্বত' ও 'উদার নদী-সাগর'। সর্বত্র শান্ত, মনোরম একটা পরিবেশ। সে দেখতে পেয়েছে গ্রামঘেরা একটা শস্যক্ষেত। তার একপাশে টলমলে এক জলের

বিল। সেই বিলের ধারে একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি—“আকাশের নীল আর সবুজের ঝিনুকপাল্লার মাঝখানে অ্যাকটা মুক্তোর মতন দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। পাটকিলে মেঘের পর্দায় য্যানো বক-সাদা রঙের বাড়িটাকে ছবির মতো এঁকে রেখেছে কোনও মহৎ জীবনশিল্পী।”[৭] এই বাড়িটাকেই অপর্ণার মনে হয়েছে নিজের নীড়। আলোক অপর্ণাকে বলেছে, “যাকেই জীবনসঙ্গী করো-না-ক্যানো তার চোখে এই পৃথিবীটাকে, স্থির এই পৃথিবীটাকে, দেখে নেবে...যে পৃথিবী অস্থির তার কোলে মানুষ বাস কোরতে পারে না অপর্ণা—এটা জেনে রেখো।”[৮] অর্ণব-স্রোতস্বিনীর কাহিনির সমান্তরালে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় এই কাহিনি। এখানে লেখক কিন্তু চার দেওয়াল বিশিষ্ট কোনো বাংলোর কথা বলেননি। চার দেওয়ালের মধ্যে বাস করলেই নীড় যে নিজের হয় না এবং স্থির হয় না বরং তা আরও বিড়ম্বনার, সে দৃষ্টান্তের অভাব কাহিনিতে নেই। আসলে একগামী একনিষ্ট প্রেমের অন্বেষণই এখানে প্রধান বক্তব্য। সেই একনিষ্ঠতার সুখের নীড়টিকেই লেখক কাব্যিক বাতাবরণে উপস্থাপন করেছেন।

ঠিক একই প্রয়োজনে লেখক অবতারণা করেছেন ‘শেয়াল মহারাজ, বাঘ-বাহাদুর আর হরিণ রানির গল্প’। এই উপকথায় হরিণের মাংস খাওয়ার লোভে নিজ সমাজের রীতিকে উপেক্ষা করে শেয়াল সাত-পাঁচ না ভেবেই চেপে বসেছিল বাঘের পিঠে। তক্কে তক্কে থেকে একদিন হরিণের মাংসও ভক্ষণ করলো সে। সুস্বাদু হরিণমাংস খাওয়ার গৌরব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি শেয়ালের। তার দেহে জড়িয়ে থাকা কস্তুরী গন্ধের কারণে শিকারহীন অভুক্ত বাঘের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হল। কাহিনির অর্ণবও শেষ পর্যন্ত পরাজিত সৈনিকের মতো শেয়ালের রূপ ধারণ করে চেপে বসেছিল কামনারূপ বাঘেরই পিঠে। উপকথার কাহিনিতে মৃত্যু ঘটেছিল বহুগামী স্বভাব-বৈশিষ্ট্য শেয়ালের। সেই মৃত্যুই ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে ধরা দিয়েছে অর্ণবের জীবনে। আবাল্যলালিত তার যে সংস্কার, একগামিতার পক্ষাবলম্বন ও যুক্তিবিস্তার—সবকিছুর মৃত্যু ঘটেছে সুলেখার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। স্থির বসতের কারবারি অর্ণব শেষ পর্যন্ত বসত বদল করে অস্থির পৃথিবীর বাসিন্দা হয়েছে। স্রোতস্বিনী অর্ণবের চোখে দেখতে পেয়েছে তিন-তিনটে অস্থির প্লেট, যেগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কায় ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে বসবাসের অযোগ্য

পৃথিবীর জন্ম দিয়েছে। এমন বদলি বসত মেনে নিতে পারে না স্রোতস্বিনী। যে স্রোতস্বিনী একসময় বহুগামিতার পক্ষে সওয়াল করেছে, এখন তার স্বামীর বসত বদলে কান্নায় ভেঙে পড়েছে—একগামিতার স্থির পৃথিবীকে ফিরে পেতে চেয়েছে।

লেখক ভূমিকাংশে জানিয়েছেন, “প্রেম নাকি অপ্রেম কার জয়গীত গাইতে হবে—এসব হিসেব না-কোরেই পুতুল নাট্যমঞ্চে অভিনিত হওয়া বহুগামিতা বনাম অ্যাকগামিতার লড়াইয়ে নামিয়ে দিয়েছি অ্যাকই মানুষের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকা অ্যাকাধিক সত্তাকে।”[৯] কিন্তু পাঠক বোধ হয় বুঝতে পারেন, প্রেমের জয়গানই লেখকের উদ্দেশ্য। অনুর্বর, ধূসর, রুক্ষ মৃত্তিকায় প্রেমের উর্বর ভূমির খোঁজই এই নভলেটের প্রাণধর্ম। অন্ততপক্ষে অর্ণবের রোগগ্রস্ত পিতা প্রিতমের মুখে উপকথার গল্প ও অর্ণবের ডায়েরীর আলোক-অপর্ণার কাহিনি সেই বিশ্বাসকেই সুদৃঢ় করে। সেই দিক থেকে সৎ সাহিত্যিকের দায়িত্ব লক্ষণীয় এই নভলেটে।

তবে এই নভলেটের বেশ কিছু অংশ আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষত সুলেখা যেভাবে স্রোতস্বিনীর কাছে অর্ণবের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে বা অনুরাগের পরিচয় দিয়েছে তা আধুনিক সময়কালেও ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুলেখাকে স্রোতস্বিনী বলেছে, “বহুগামিতার বিরুদ্ধে ও যে সব কথা আওড়ায় তা আদর্শের বোলে বোলে যায় না সত্যি-সত্যি বিশ্বাস থেকে বলে সেটা দ্যাখার আছে।”[১০] এটা দেখে নেওয়া, বুঝে নেওয়ার বাসনা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই থাকে। থাকা স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই চায় তার প্রিয় মানুষটি একগামী হোক। স্রোতস্বিনী যতই বলুক ‘বহুগামিতার পঙ্ক গায়ে না-মাখলে মানুষের জীবনের সত্যিকার প্রেমের পদ্ম ফোটে না’, আসলে এই দর্শনে কতখানি মিথ্যা ছিল তা আমরা কাহিনির অন্তিমে বুঝতে পারি। প্রকৃতপক্ষে সে একগামী স্বামীকেই চায়। সেই কারণেই অর্ণবের পরীক্ষায় সে উদ্যোগী হয়েছে বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে। কিন্তু তার ধরণটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেটুকু বাদ দিলে ক্ষুদ্রায়তনের এই উপন্যাস বা নভলেটটি তার ‘তীব্র খনন’ ও ‘দায়’কে বহন করেছে। স্থির পৃথিবীর অন্বেষণ সার্থকতা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। দে অমর(সম্পাদক), গল্পসরণি; কলকাতা; সোহারাব হোসেনের বিশেষ সংখ্যা, ত্রয়োবিংশতি বর্ষ: বার্ষিক সংকলন ১৪২৫/২০১৯; পৃ. ২২৯।

২। হোসেন সোহারাব, বদলি বসত; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২; ভূমিকাংশ।

৩। পূর্বোক্ত।

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ভূমিকাংশ। ১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।

উ জ্জ্ব ল প্রা মা ণি ক

জঙ্গলমহলের লোকজীবন ও সংস্কৃতি : প্রসঙ্গ নলিনী বেরার গল্প

‘জঙ্গলমহল’ নামটি বললেই আমাদের সামনে যে ছবি ভেসে আসে- বিস্তীর্ণ জঙ্গলঘেরা একটি অঞ্চল, যেখানে মানুষ আর প্রকৃতির কোন ব্যবধান নেই। একটি বিস্তৃত বনাঞ্চলই হয়ে উঠে মানুষের অনুকূল বাসস্থান আর জীবন-যাপনের আধার। জঙ্গলমহল হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদনীপুর ঝাড়গ্রাম ও ছোটনাগপুর মালভূমির বন ও পর্বতময় অংশটির নাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে(১৮০৫-১৮৩৩) ব্রিটিশ শাসনাধীন আসার পর এই নাম চালু হয়। ১৮০৫ সালে অষ্টাদশ রেগুলেশন পাশ হওয়ার পর জঙ্গল মহলের মানচিত্রের পরিবর্তন পরিবর্তন ঘটল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদনীপুর ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত অঞ্চলটি জঙ্গল মহল বলেই পরিচিত। সেখানে জীবন ধারণের জন্য মানুষকে লড়াই করতে হয় প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে, কখনো খাদ্য, আবার কখনো নিরাপত্তার জন্য। সমাজের মূলস্রোত থেকে তাদের অবস্থান বহুদূরে। এলিট সমাজের বিপ্রতীপে গড়ে ওঠা প্রান্তিকজনের যাপনমালা এক অন্য ভারতবর্ষকে চিনিয়ে দেয়। অনাহার, দারিদ্রতা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তারা লালন করে অন্ধকারময় ভারতবর্ষকে। তবু সভ্য পৃথিবী থেকে দূরত্ব রেখেই এই নিরক্ষর মানুষগুলি গড়ে তোলে তাদের লোকসমাজ ও সংস্কৃতিকে। সাঁওতাল-লোধা-শবর-মাহাত-হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর জঙ্গলমহলের এই প্রান্তিক মানুষগুলি পরিশীলিত সমাজের বাইরে থেকেও নিজেদের জীবন যন্ত্রণার মধ্যেও টিকিয়ে রাখে করম উৎসব, বাঁধনা পরব, ভাদু গান, টুসু গান আর ঝুমুরের আসরকে। তাদের জীবন যাপন এক ভিন্ন সুরে বাঁধা। পাঁচ-হাতি কাপড় পড়ে গ্রামের পুরুষ খালি পায়ে পথ হাঁটে, নারী তার লজ্জা নিবারণের ঠিক ঠাক বস্ত্র টুকু পায় না, অপুষ্টির কারণে তাদের সন্তানরা হয়ে উঠে

বিবর্ণ, বিধ্বস্ত। শহুরে মানুষের কাছে এসব নিতান্তই ঘৃণ্য, বিকৃত যৌন রুচির পরিচয় হলেও আসলে এটাই এদের ক্ষেত্রে চরম ও পরম সত্য বলে ঘোষিত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মন, মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় পেলাম নিম্নবিত্ত প্রান্তিক জনজীবনের কথা। একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিকথা দিয়ে তৈরি হল গল্পসাহিত্যের নতুন ভুবন।

সেই পথ ধরেই বাংলা গল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন প্রান্তজনের কথাকার নলিনী বেরা। নলিনী বেরা সম্পর্কে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য- তিনি 'গ্রামজীবনকে, গ্রামের মুনিষ-মাহিন্দরদেরকে, খেত-খামারকে, ঝিউড়ি বাউড়ীদেরকে বাগালদেরকে চিনেছিলেন।'[১] অন্ত্যজ মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি গ্রাম বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন গল্পের মধ্যে।

১.

“নদীর ওপারে গ্রাম বাছুরখোঁইয়ার নাম আটত্রিশ জে এল নম্বর

ঝাড়খন্ডী জঙ্গল মহাল-আঁটারি চুরচু কইম করম গাছে বিদিত ভুবন

... এখানে ললিন নামধেয় দুজন যুবক--বড় ললিন আর ছোট ললিন” (সে জানে শুশনি পাতা-নলিনী বেরা)

এ হল গল্পকারের দেওয়া আত্মপরিচয়। ১৯৫২ সালের ২০শে জুলাই অধুনা ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী বাছুরখোঁয়ার গ্রামে গল্পকার নলিনী বেরা জন্ম গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা সীমান্তের কাছাকাছি জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামটির এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বেরা। মায়ের নাম ঊর্মিলা দেবী। গ্রামের নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে রোহিণী গ্রামের চৌধুরানী রুক্মিনী দেবী হাইস্কুল থেকে বিজ্ঞানে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেন। এরপর গ্রামের কিশোরের শহরে যাত্রা। মেদিনীপুর কলেজে বাংলা স্নাতক বিষয় নিয়ে ভর্তি হলেও তিনি কিছুদিনের

মধ্যে নকশাল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তখন নিজেকে সমস্ত ঝামেলা থেকে বাঁচাতে বাড়ি পালিয়ে আসেন। এরপর ১৯৭১ সালে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন। তিনি প্রথম চেষ্টাতেই ডব্লিউ বি সি এস পরীক্ষায় 'এ' গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আধিকারিক হন।

কথাসাহিত্য নয় কবিতা দিয়েই তাঁরা পথচলা শুরু। স্কুল জীবনে থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। 'সে জানে শুশনি পাতা', 'কত দূরে আছো সুবর্ণরেখা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে ভূমিজ অন্ত্যজমানুষের কথা উঠে এসেছে। ১৯৭৯ সালে আগস্ট মাসে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'বাবার স্মৃতি' প্রকাশিত হয়। এরপর 'দেশ' পত্রিকায় ১৪ টি গল্প নিয়ে বের হয় 'এই এই লোকগুলো'। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম 'ভাসান'। অন্যান্য উপন্যাস গুলি হল 'দুই ভুবন', 'চোদ্দমাদল' প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল-'ভূতজ্যোৎস্না', 'শ্রীকান্তের পঞ্চমপর্ব', 'হোমগার্ডের জামা', 'বর্ষামঙ্গল', 'শতরঞ্জি' প্রভৃতি। ২০০৮ সালে 'শবরচরিত' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রদত্ত 'বঙ্কিম স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার' পান। আশির দশকের প্রথম ভাগে গল্পকার রূপে নলিনী বেরার আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তাঁর গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে সত্তরের উত্তাল সময় পর্বের কথাও। নলিনী বেরার সমসাময়িক গল্পকারদের কথা বলতে গেলে ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘোড়াই প্রমুখের কথায় বলতে হয়। এঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রামীণ জীবনকে প্রতিবিম্বিত করেছেন গল্পশিল্পে। কোথাও যেন একটা সামাজিক দায় রয়ে গেছে এঁদের রক্তে। যাদের মধ্যে কেউ কেউ কর্মসূত্রে গ্রামে এসে সেখানকার মানুষকে নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, আবার অনেকে গ্রামের ছেলে হয়ে গ্রামকে মজ্জায় মজ্জায় ধারণ করেছেন। নলিনী বেরা দ্বিতীয় বর্গের লেখক। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে সুবর্ণরেখা নদী-তীরবর্তী জঙ্গলমহলের সাঁওতাল-ভূঁইয়া-ভূঁমিজ-লোধা প্রভৃতি প্রান্তিক বর্গের মানুষের কথা।

শহুরে বর্ণময় জীবনের হাতছানি থাকা সত্ত্বেও যারা নিজেদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, লোকসংস্কারের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেনি।

অমর মিত্রের গল্পে বাঁকুড়া ,মেদনীপুর, বর্ধমানের ভৌগোলিক আবহে সাধারন মানুষের জীবনযন্ত্রণর কথা উঠে আসে। সৈকত রক্ষিতের গল্পেও পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের মুচি, হাড়ি, ডোম, বাউরি জনগোষ্ঠীর দারিদ্রপীড়িত জীবনযাত্রা বাস্তবরূপ পেয়েছে। এই দিক দিয়ে গল্পকার নলিনী বেরা তাঁদের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু নলিনী বেরা সম্পূর্ণ একটি নতুন ঘরানার,সরস-মনোজ্ঞ গল্প উপহার দিলেন বাংলা সাহিত্যকে।

২.

চাকরিসূত্রে গল্পকার নলিনী বেরা দেশ বিদেশের ভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তবু, তিনি গ্রামকে ভুলেননি, নিজের শিকড়কে অস্বীকার করেননি। শবর, লোধাদের খোঁজে তিনি বারবার ফিরে আসেন গ্রামে। 'শবরচরিত' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, ‘শবরচরিত লিখে যেন শবরহারা হলাম’।[২] এই নিম্নশ্রেণির মানুষগুলির জন্যই তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত সর্বদায়। তাই গল্পের কথাবয়ানে ভিড় করেছে সাঁওতাল, লোধা, ভুঞাঁ, ভুমিজ প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষের জীবন। সভ্যতার অগ্রগতির ধারায় শিল্পায়ন হলো, কলকারখানা গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন নগরের পত্তন ঘটল। কিন্তু গ্রামের মানুষগুলিকোন পরিবর্তন হলো না। ‘শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব’ গল্পে কৃষিজীবি শ্রীকান্তের জীবনের কঠিন লড়াইয়ে জমিটুকুই শেষ সম্বল। কিন্তু মেজোকাকার বেইমানি আর ভাইয়ের পড়াশুনার খরচ চালাতে সেই জমিটুকুও হারাতে হয় তাকে। সে তার চাষের বলদ খুইয়েছে। শহরের রোজগারে ভাই টালির চালওয়ালা কোঠাবাড়ি বানিয়ে দিয়েছে ঠিকি কিন্তু শ্রীকান্তের মতো মানুষের কাছে সেটাই জীবনের পরমপ্রাপ্তি নয়। শখের ঘরবাড়ির চেয়ে তার মতো প্রান্তিক চাষির কাছে দুটো বলদ অনেকবেশী মূল্যবান। মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত সে তার ভাই নলিনীর কাছে চেয়েছে- ‘আমাকে একহাল গরু কিনে দে, দেখবি ওই দিয়ে খেটে ঘরের

দরজা জানলা সব আমি করে ফেলব।'[৩] শ্রীকান্তের মতো নিম্নবিত্ত মানুষ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য কৃষি হয়ে উঠে একমাত্র ভিত্তি। 'দু কান কাটা' গল্পে লোধা জনজাতির হতদরিদ্র জীবনের কথা উঠে আসে। তাদের জীবনে সাময়িক সুরাহার জন্য একটি সরকারি প্রকল্পের ঘোষনা করা হয়। মাইকে ঘোষনা করে ছাগল কেনার পর সেগুলি গ্রামের মানুষদের মধ্যে বিতরন করা হবে। কিন্তু ছাগল বিতরন অপেক্ষা সরকারি অফিসারদের এলাহি আয়োজনকে বড় করে দেখানো হয়েছে। ছাগলের 'দুকান কাট'র মধ্যে হাসির খোরাক থকলেও গল্পে লোধাদের অভুক্ত থাকা, অপুষ্টিজনিত যন্ত্রনাকে তুলে ধরা হয়েছে। 'কুসুমতলা' গল্পটি লেখকের কবি আত্মার নস্ট্যালজিয়া হলেও শৈশবের দারিদ্রপীড়িত জীবনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। দরিদ্রমোচনের জন্য কুসুম গাছে কাগজের টুকরো গুজে নোটের স্বপ্ন দেখার মধ্যে যা স্পষ্ট। গল্পের শেষে দেখা যায় একজন--"এসেই মন্মথদের কুসুমগাছটাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। বিড় বিড় করে কী যেন বললও। বোধহয় দিন-ক্ষণ দেখে এসেছে। তারপর তার উড়নি তলা থেকে কী একটা বের করে গাছের কোটরায় সন্তর্পনে রেখে গেল সে।"[৪] 'আমরা সন্ত্রাসবাদীরা' গল্পে-জঙ্গলমহলের সাধারণ মেহনতি মানুষগুলোর কথা উঠে আসে।

ভদ্রসমাজের বিলাস-বৈভবে মত্ত কতিপয় মানুষের শোষনে শাসনে তার হয়ে হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসবাদী। তারা মাওবাদী তকমা গায়ে পড়েছে বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের নায্য অধিকার বুঝে নিতে। 'ভূতজ্যোৎস্না' যাদুবাস্তবতার মোড়কে গাঁথা হলে অন্তেবাসী মানুষগুলির জীবন সংগ্রাম কোন অংশে কম নয়। তাদের বর্ণনাতেও প্রান্তিক জীবনের ছোঁয়া- 'কারোরই পড়নে কাপড় নেই বললেই চলে, আড়াই হাতেরও কম খেটো গামছায় লেংটির মতো করে কোনমতে কোমরটায় জোড়ানো।[৬] তারা কাদাজলে থাকে। লেখাপড়া না শিখলেও হেমিংওয়ের, আলব্যের কামুর পাঠ মুখস্থ বলে। এর মধ্যে কেউ কেউ বুদ্ধিজীবিদের প্রতি বিদ্রুপ দেখলেও গল্পকার অসলে পড়াশুনা না জানা মানুষগুলির স্বপ্ন দেখাকে প্রশ্রয় দেয়। পাহাড়ের আদিবাসী

জনগোষ্ঠীদের নিয়ে লেখা 'পাহাড়ের নিচে মানুষ' গল্পটি। কুসুমগাঁইয়ের আদিবাসী যুবক মংলু বনে মোষ চড়ায় আবার তিরিয়ো আঁড়বাশি বাজায়। তারা জীবনের সমস্ত দুঃখ ভুলে যায় যখন দল বেঁধে শিকারে যায়। 'ঝাটার কাঁটি' একটি অসাধারণ প্রেমের গল্প। কিন্তু এখানেও আদিবাসী রমনীর প্রতি অবৈধ সংগমকে গল্পকার কোন ভাবেই মেনে নিতে পারেননি।

'টি.আই.প্যারেড' মাওবাদের প্রসঙ্গ আসে জঙ্গলমহলের। কিন্তু মাওবাদী জীবন সমস্যার রাজনৈতিক বির্তকে না গিয়ে সংবেদনশীল লেখক উৎসাহিত হন "যে কোন জঙ্গলের রহস্যময় গভীরতা, আখ-পাট-অড়হর খেতের ভিতরের নিস্তব্ধতা যে কোনো যুবকেই বিশেষত এখানকার যুবকদের, উৎসাহিত করে তোলে সে রহস্য সে গোলোক ধাঁধার ঘুলঘুলি ভেদ করে ভিতরে ডুকে পড়তে।"[৬] দীর্ঘদিনের অবহেলা আর বঞ্চনার কারণে নিরন্ন মানুষগুলি হাতে অস্ত্র তুলে নিলেও নলিনী বেরা কখনোই তাকে সন্ত্রাসের আবহে ব্যাখ্যা করেননি। এখানেই প্রান্তিক মানুষদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

৩.

জঙ্গলমহলে আজও নানা কুসংস্কার মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে। নলিনী বেরা এইসব অঞ্চলের ভূতপ্রত,ডাইনি ও নানা কুসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি গল্প

লিখেছেন, যথা-'খবা', 'তিহার গল্প', 'তড়কন ডাঙা', 'ব্যাং-কৌমুদি', 'কহবর লেখা', 'মোরগডাকের অপেক্ষায়', 'বড়াভাজা', 'কটাচোখ ও বঙ্কিম বুধকের গল্প', 'যৌতুক' প্রভৃতি। 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে ডাইনি প্রথার এক নিদারুণ প্রতিভাস। সুনি নামে সাঁওতাল বধূকে ডাইনি সন্দেহে' ঝাঁটার বাড়ী মেরে দুদ্দুর করে খেদিয়ে দিল গ্রাম থেকে।'[৭]

যে সমাজের লোকেরা বহিরাগত সংস্কৃতির দ্বারা তেমনভাবে আলোকিত হয়নি বা তেমনভাবে বিবর্তিত হয়নি, সেই পিছিয়ে পড়া লোকসমাজের কথা নলিনী

বেরা তাঁর গল্প বেশি করে তুলে ধরেছেন। গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ মানুষের কথা ,তাদের লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকগাঁথা, লোকভাষা, লোকগান গল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে।

'বর্ষামঙ্গল' গল্পে দেখা যায় বৃষ্টিতে ঘরবন্দি মানুষের যখন কিছুই করার থাকেনা তখন নানা লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, রূপকথাকে আশ্রয় করে তারা। যেমন-বৃষ্টির সময় তারা মনে করে হলহলিয়া সাপ আকাশ থেকে নেমে আসে, গভীর রাতে গ্রামে গুড়গুড়িয়াদের আগমন ঘটে, তারা উঠানে দাঁড়িয়ে কারুর নাম ধরে ডাকলে আর তাতে সাড়া দিলে নিশ্চিত মরণ। আবার লোকমতে বৃষ্টি থামানোর উপায় হল- গামছা পড়ে একটা লাঙল গোবর গাদায় পুঁতে দিতে হবে। পরমেশের ঠাকুমার কথায়-'লাঙল পুতলে ঝড়িয়া তো ঝড়িয়া, বছর বছর ধরে হওয়া বৃষ্টিও তোর থেমে যাবে।'[৯]

'ছেঁড়া কুড়চির মালা' তে লোধানারী আলোমণির বিবাহ অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। সাঁওতালদের বিবাহের এক বিশেষ লোকাচার হল বিবাহের শেষে বর গাছে উঠে থাকবে। বধূর ভরণ পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিলে তবেই সে গাছ থেকে নামবে এবং সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে। বিবাহ সভায় লোধা নারীরা বিশেষ এক প্রকার গান গায়-

"বাস করি ধুঁধে ঝাঁড়ে   ব্যাঙ -উন্দুর মারেঁ খাই
ইটাকে কি বাঁচা বলা যায়?
বলে দেন অ-ভাই   কেমন করে কাল কাটাই"[১০]

'পুষ্করা' গল্পে লোকসংস্কার প্রচলিত আছে অপমৃত্যুতে মরলে সে বাড়িতে পুষ্করা বা প্রেতাত্মা লাগে। এই পুষ্করা ছাড়ানোর জন্য গণককে ডাকা হয়। এটিও একটি লোকজীবিকা। এই গণৎকার গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই সব কাজ করে থাকে।

নলিনী বেরার গল্পে উঠে এসেছে পুরুলিয়া, মেদনীপুরের সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকউৎসব মকর বা টুসু উৎসব। সেই টুসু গান লোকসঙ্গীতের অন্যতম অঙ্গ-'ঘোল ঘড়ি ঘোল পূজা, খাওগো টুসু খই ভাঁজা'। ‘চোদ্দমাদল’ গল্প সংকলটির গল্পে আছে বাঁধনা উৎসবের কথা। গোবর লেপা উঠোনে

নানারকম আলপনা আঁকা হয় ঢ্যাঁড়শ গাছের হড়হড়ে রসের সঙ্গে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে। রাতে সাঁওতাল নরনারীরা মাদল বাজিয়ে গান করতে করতে আসে “গরু জাগরণে’-হামরা তো যাতেছিলি কুলহি ঙ কুলহি যে বাবু হো/তোরই গিরিহায় দাকিয়েঁ ঘুরল”[১১] ‘খোরপোশ’ গল্পে সুনা দাঁশাই উৎসবে মুখে কালিঝুলি মেখে সঙ সাজে। তাঁর গল্পে লোকপ্রবাদ, হেঁয়ালীর, ছড়ার ব্যবহারও অপূর্ব দক্ষতায় কাহিনির অনিবার্য সঙ্গী হয়েছে।

নিছক সাক্ষরতা বা প্রথাসিদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও এইসব প্রান্তিক মানুষেরা জীবন দিয়ে আগলে রাখে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে।

8.

গল্পের আখ্যানভাগ নির্মাণের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ছোটগল্পকারদের অনুসরণের বদলে মঙ্গলকাব্য, পাঁচালীর ঐতিহ্য অনুসরণে ভারতীয় স্বাদ নিয়ে আসেন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে যাদু বাস্তবতা মিশিয়ে মাটি ও মানুষের গল্প লিখলেন গল্পকার নলিনী বেরা। তাঁর গল্পের ভাষা নির্মাণের একটি নিজস্ব শৈলী আছে। সাহিত্য ও মুখের ভাষার তিনি অপূর্ব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। 'চিড়কিনডাঙা' গল্পে সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী মানুষের নিজস্ব ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছে। মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে এখানকার মানুষ ডাকপাড়ে-‘সাঁঙ্গাৎ হে-এ-এ-এ-এ’। তিনি যেহেতু আদিবাসী মুন্ডা শবরদের মুখের কথাকে গল্পে হুবহু তুলে ধরতে চেয়েছেন তাই গল্পে ধ্বন্যাত্মক ও অনুস্বারবহুল শব্দের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। পতনি, কষাফল এমন অনেক আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে গল্পের পরিবেশকে আরো বেশি জীবন্ত এবং আঞ্চলিকতার রঙে রঙীন

করে তুলেছেন। চরিত্রের মুখের ভাষা তুলে ধরতে গিয়ে অনেক অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে।

মাঝে মাঝে সুনার মতো আদিবাসী যুবক প্রতিবাদ করে বলে-"এত দিন তুমাদের পালাপোষ করে এসেছি, আজ তুমরা আমাকে খরপুষের লোভ দেখাচ্ছ...বলছ কী, তুমাদের কাছে খড়পুষের ল্যাওড়া দাবি তুলতে।"[১২] গল্পের বর্ণনাগুণে এবং শব্দের সাবলীল প্রয়োগে অশ্লীল শব্দও প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনায় শ্লীল হয়ে ওঠে।

গল্পের বিষয় নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি অতি তুচ্ছ, সাধারণ বিষয়কে তুলে আনলেন। বর্ণনার গুণে যা হয়ে উঠল অতুলনীয়। সংলাপ তাঁর গল্পের আকর্ষণীয় বিষয়। গ্রামের নিরক্ষর নিম্নজীবি মানুষদের দৈনন্দিন কথোপকথনকে বাস্তবসম্মত রূপে গল্পে বিনির্মাণ করাই তাঁর অন্বিষ্ট, এক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর সম্পর্কে সমালোচক অমলেন্দু চক্রবর্তীর যর্থাথ মন্তব্য : "নলিনী বেরার শিল্পী সত্তার সমগ্রতা জুড়েই গ্রাম বা পল্লীপ্রকৃতির সংবৃতি। নির্সগ কোনো স্তব্ধ স্থবিরতা নয়। কিংবা আকাশ মাঠ গাছপালা পশুপাখি নদীনালার দিগন্তপ্রসারে মানুষই তাঁর সৃজন ভাবনার অন্তর্বীজ। সে-মানুষ অশিক্ষায় দারিদ্র্যে স্থবির, অস্বাস্থে ভঙ্গুর।" [১৩]

নলিনী বেরা তাঁর গল্পের মধ্যে একটি সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যে সমাজ পিছিয়ে পড়া শবর, লোধা, সাঁওতালদের, সমাজ। একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের বর্ণনা, সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনগাথা তাঁর গল্পের প্রাণ। তাদেরকে নিয়ে তিনি বাংলা গল্পসাহিত্যে এক দেশজ ঘরানার শিল্পী হয়ে উঠেছেন।

সমাজকে পরিবর্তন করা কোন লেখক বা সাহিত্যিকের একার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যিক নিজের চোখে দেখা সমাজবাস্তবতা নির্মাণ করতে পারেন সাহিত্যে। গল্পকার নলিনী বেরা ঠিক সেই কাজটাই করেছেন অবলীলায়। এই জন্য তাঁকে কেউ কেউ আঞ্চলিক কথাকার বলেছেন।

কিন্তু কোন সাহিত্য বা শিল্প আঞ্চলিকতার সীমায় আবদ্ধ থাকে না। নলিনী বেরাও তেমনি গল্পে মেদিনীপুরের জঙ্গল মহলের প্রান্তীয় অঞ্চলের কথা বলার মধ্যে দিয়ে সমগ্র মেদিনীর অসহায় মানুষের কথা বলেছেন। বাংলা গল্পসাহিত্যে নিম্নবর্গের জনজাতির কথা অনেকেই বলেছেন, কিন্তু এত আন্তরিক, মমতায় সহৃদয়তার সঙ্গে কেউ বলেননি।

সূত্রনির্দেশ :

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালেরপুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর১৯৯৫, পৃষ্ঠা৫১১।

২. বেরা, নলিনী,'শবর চরিত'(অখন্ড), করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, ভূমিকা অংশ।

৩. বেরা, নলিনী, 'শ্রীকান্ত পঞ্চম পর্ব', শ্রেষ্ট গল্প, করুণা প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা৫২।

৪. বেরা, নলিনী,'কুসুমতলা', সেরা পঞ্চাশটি গল্প', দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা৩৬।

৫. বেরা, নলিনী,'ভূতজ্যোৎস্না', সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫ ,পৃষ্ঠ১১।

৬. বেরা ,নলিনী,'টি. আই. প্যারেড',সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫ পৃষ্ঠা ১৮২,১৮৩।

৭. বেরা, নলিনী,'ঝাঁটার কাঠি,'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫ পৃষ্ঠা৫২।

৮. বেরা, নলিনী,'বর্ষামঙ্গল', শ্রেষ্ট গল্প, করুণা প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃষ্ঠা১০৬।

৯. বেরা, নলিনী,'ছেড়া কুড়চির মালা',সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৩৭।

১০. বেরা নলিনী,' খোরপোষ ', সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং,জানুয়ারী ২০০৩,পৃষ্ঠা১০১।

১১.বেরা, নলিনী,'খোরপোষ,'সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০১৫, পৃষ্ঠা১০২।

১৩. বেরা,নলিনী,'শ্রেষ্ট গল্প',করুণা প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ ২০০৩ ,ভূমিকা অংশ।

কবিতাগুচ্ছ -২

অং শু মা ন ক র

প্রবাসী ছেলের চিঠি, মাকে

চোখ বন্ধ করে দেখো।
দেখতে পাচ্ছ না কাঞ্চনজঙ্ঘা আর বাতাসিয়া লুপ?
চোখ বন্ধ করে দেখো।
দেখতে পাচ্ছ না মানালির হিড়িম্বা মন্দির?
গরমে কুলকুল ঘামতে ঘামতে ভিড় বাসের মধ্যে
কতবার চোখ বন্ধ করে দেখতে পাওনি বিপাসার তিরতির স্রোত?
চোখ বন্ধ করে দেখো।
দেখতে পাচ্ছ না ঢেউয়ের মাথায় জ্বলছে ফসফরাসের আলো?
ভ্রমণ তো মাত্র বার কয়েক।
বাকি সময় তো ওই চোখ বন্ধ করে দেখা।
তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন?
ভিডিও কল করতে জানো না বলে মনখারাপ করছ কেন?
চোখ বন্ধ করে দেখতে পাবে
নীল শার্ট ছেঁড়া গেঞ্জি আর বাঁ গালের জড়ুল।

ভুল স্বপ্ন

কত রকমের ভয়, কত রকমের আতঙ্ক, কত রকমের সংশয়।

চমস্কি বলেছেন, এই বিপদ কেটে গেলে
একটা নিউক্লিয়র যুদ্ধের মুখোমুখি হবে পৃথিবী

অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, গোটা পৃথিবী জুড়ে
কাজ হারাবেন কোটি কোটি মানুষ

মহিলা কমিশন উদ্বিগ্ন, বেড়ে গেছে গার্হস্থ্য -হিংসা।

কত রকমের ভয়, কত রকমের আতঙ্ক, কত রকমের সংশয়।

আমি চেয়ে থাকি চাঁদের দিকে।
ধবধবে ফর্সা চাঁদ
ওপাশে অন্ধকার বোঝা যায়?

ও আগাম পৃথিবী, তুমি কেন হবে না
চাঁদের এপিঠের মতো উজ্জ্বল, মায়াময়?

মুক্তি

দূরদেশের বিপন্ন মানুষদের জন্য যখন
টিনের কৌটো ঝাঁকিয়ে ট্রেনের এক কম্পার্টমেন্ট থেকে
গিয়েছি অন্য কম্পার্টমেন্টে
বা চারজনে চাদরের চারটে কোণা ধরে ঘুরেছি রাস্তায়
তখন শুনেছি অনেক বিদ্রুপ।

শুনেছি কেউ কেউ বলেছেন :
দেশ নয়, বিদেশকেই ভালোবাসি আমরা ক’জন।
ওদের দোষ দিই না।
নিজেও তো কতবার বিপন্ন বন্ধুর জন্য
ঠিক ঠিক যা যা করা উচিত ছিল - - করিনি।
হয়তো হয়ে উঠতে পারতাম সোনালী ডানার চিল
কিন্তু হয়েছি রোগা শালিখ।
তবে আজ
ইতালির মুমূর্ষু মানুষের জন্য প্রাণ কাঁদছে
যে বন্ধু কোনওদিন যায়নি ফ্রান্স, সে লিখেছে :
ভালো থেকো ফ্রান্স, ভালো থেকো।
‘সাম্রাজ্যবাদী’ আমেরিকা বলছে, দেশে দেশে পাঠাব ভেন্টিলেটর।
লক্ষ লক্ষ অপরিচিত মানুষের জন্য
চোখের জল ফেলছে লক্ষ লক্ষ অপরিচিত মানুষ
আর মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই...

পা প ড়ি দা স স র কা র

পুনর্জন্ম

তোমার গান, কণ্ঠ ভেঙে যায়
বিষবাস্পে উচ্ছ্বসিত এই আবহাওয়া
এখানে কি থাকা যায়?
গাঢ় নীলের বিষহুল
তার চে বরং দূরে যেখানে পাহাড় পড়েছে
ঝর্ণার শাড়ি, শ্রবণ শ্রবণ.....
একটা মত্ততা, বৃষ্টিভেজা কাঁপন
দামাল বেহিসেবি । এই তো আর একটু বাকি আমাদের
আরোগ্য নিকেতন।
বাগানের রক্তকরবীরা মুখ লুকিয়েছে, তারা যেন
সব্ব শাদা শাদা........

মৃত্যু

অপেক্ষা, মৃত্যু এল অবশেষে
ঝরে পড়ে আর্ত কান্না
পাথর প্রহৃত করে চলে যায় জীবন
মৃত্যু কি তবে পথ ভুল করে এসেছে?
মৃত্যু কি তবে গুলিয়ে ফেলে হিসাব
আমি নেই, বিছানা খাচ্ছে যেন ওলটপালট আমাকেই
পকেটে হাত ঢুকিয়ে চলছি নির্জন রাস্তায়
যেমন চলে মুহ্যমান এক একটি রাত
পিতৃসম্ভাষণে কাকু, জেঠু মেসোমশাইরা গড়েছে ব্যাংকের লাইন
আর রেলিং-এর ধারে এক দাঁড়িয়ে থাকা আমার মা মেখেছে বিষবাষ্প।

স্ব প ন রা য়

মগজে আফিম

পৃথিবীতে নেমেছে দারুণ অন্ধকার,
তবু কেন দেখছি আমি এত পরিষ্কার?
স্বর্গের সিঁড়িটা ওই করিছে ইশারা,
“এত দ্বিধা কিসে তোর, চলে আয় তরা !”
দোর খুলে, ঘর ছেড়ে তাই যাই ছুটে,
এবার শোক সন্তাপ সব যাবে টুটে।
তুচ্ছ পৃথিবী, তারচেয়ে তুচ্ছ জীবন!
যাপনের চেয়ে শ্রেয় অকাল মরণ!!

যাবার আগে পুতে যাব ধ্বংসের বীজ,
নিজ হাতে সৃষ্টিকে করে যাব নির্বীজ!
দিকে দিকে ছড়াবো আঁধারের মহিমা,
দ্রোহীদের তরে আর নেই কোনো ক্ষমা!
চির উন্মাদ, আমার মগজে আফিম,
নিমেষে নেভাবো সব জ্বলন্ত পিদিম!

ঘুরে দাঁড়াবো

আমরা আবারও ঘুরে দাঁড়াবো,
ঠিক তিন শো ষাট ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়াবো!!

আমরা আবারও ঘুরে দাঁড়াবো,
উদীয়মান সূর্যের দিকে নয়, অস্তগামী
সূর্যের দিকে।

আমরা আবারও ঘুরে দাঁড়াবো,
গুলবাগের দিকে নয়, রক্তাক্ত প্রান্তরের
দিকে।

আমরা আবারও ঘুরে দাঁড়াবো,
কনকোজ্জ্বল শস্য-মঞ্জরীর দিকে নয়,
হয়ত বোমার আগুনে পোড়া মাটির দিকে।

আমারা আবারও ঘুরে দাঁড়াবো,
অন্নজলপুষ্ট নতুন পৃথিবীর দিকে নয়,
ক্ষুৎপীড়িত, বিরান, বিষণ্ন পৃথিবীর দিকে।

আমরা আবারও ঘুরে দাঁড়াবো,
শান্তিপুরের দিকে নয়, মৃত্যুপুরীর দিকে।

আমরা আবারও ঘুরে দাঁড়াবো,
চির আকাঙ্ক্ষিত বটবৃক্ষের দিকে নয়,
অনাকাঙ্ক্ষিত বিষবৃক্ষের উদ্যানের দিকে।

আমরা আবারও ঘুরে দাঁড়াবো,

ঘুরে দাঁড়াবো কাঁটাতারের বেড়ার দিকে,
খণ্ডিত আকাশ, জল আর মাটির দিকে,

আমরা আবারও ঘুরে দাঁড়াবো,
কৃতজ্ঞতায় নয়; বিনয়ে নয়; ঘুরে দাঁড়াবো
অকৃতজ্ঞের মতো, কৃতঘ্নের মতো।

আমরা আবারও ঘুরে দাঁড়াবো,
ঠিক তিন শো ষাট ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়াবো!!

ম ন্দা ক্রা ন্তা সে ন

এই বাস্তব এই স্বপ্ন

(লকডাউন মেনে প্রতিবাদী অবস্থান থেকে গ্রেফতার বামপন্থী নেতা ও কর্মীরা)

প্রতিবাদ করা যাবে না, - অনুপ্রেরণা!
নবান্ন তুমি এমন সুযোগ ছেড়ো না

দূরত্ব রেখে পরস্পরের প্রতি
বামপন্থীরা জানাচ্ছে সংহতি

কী এ সংহতি, রাষ্ট্র কি তাকে জানে?
দেহ দূরে দূরে, যোগাযোগ প্রাণে প্রাণে

রাষ্ট্রের কাজে মিথ্যার মহামারী
তার বিরুদ্ধে লড়াই তোমারই আমারই

এই পৃথিবীর নবজন্মের দিন ঠিক
মানুষ নতুন আকাশে বাতাসে শ্বাস নিক

খতিয়ান

কতজন মৃত? আহ্! সেই কথা ছাড়ো না
প্রতিরোধ থাক, আজকে শুধু প্রতারণা

বেঁচে ফেরো যদি তবে হবে বিজ্ঞাপিত

মরো যদি তবে অজানা রোগের শাপই তো!

বাঁচতে চাও কি? তোমার তেমন জোর কই?
একটু ভয়ই তো করবে তোমাকে সতর্কই

সত্যিটা জানো, আমরা বড় বিপন্ন
মিথ্যে যে বলে, অভিলাষ তার অন্য

মৃত্যুর খতিয়ান লিখে রাখি তারিখে
দেখি তো সাচ্চা লড়াই রাখছে জারি কে

কত মৃত? বলো সত্যি সে সংখ্যাটি
তোমার আমার বোধোদয় হোক খাঁটি

না, মৃত্যু নয়, জীবনমিছিলে হাঁটি...

আঁধার স্বদেশ

আমার এদেশ নেবে কি আঁধার মেনে
আলো কি জ্বলবে মোমবাতি হ্যারিকেনে!
নিয়তি কি দিলো শেষের শুরুর নিদান
মানুষ মরছে, টর্চের আলো বিধান!

আরোগ্য হোক, এটাই তো শুভকামনা
শাসক, তুমি তো জনগণমনে নামো না

দ্যাখো হে সেখানে কত ভয় কত ক্রোধ
কিছুই বোঝো না, তুমি এত নির্বোধ!

তুমি তো শুধুই অমানবতার পূজারি
কী সে প্রার্থনা? এ দেশ হোক গে উজাড়ই?
বানে ভেসে যাক, ভেসে যাক এ স্বদেশ তো
সে যে হতে চায় জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ!

কী হবে জ্বালিয়ে হ্যারিকেন মোমবাতি
ঘর তো আঁধার, আলো খুঁজে পথ হাঁটি

এস সাথী আজ, বাঁচাই মানবজাতি...

একটি না-কবিতা

লকডাউন কী যে মজার ব্যাপার
জ্যোৎস্না কেমন স্বচ্ছ
দ্যাখো এরকম ঝলমলে রোদ
পাইনি যে কত বচ্ছর!
এসবে যাদের আনন্দ হয়
তাদের পকেট ভর্তি
দিন এনে দিন খায় যারা, তার
কোথায় বাঁচার জোরটি

বাড়ি ফেরবার মৃত্যু মিছিল

সীমান্ত আজ বন্ধ
প্রধানমন্ত্রী শুধু ক্ষমা চান
রাষ্ট্র আজকে অন্ধ

আমরা, যতেক শিক্ষিত লোক
ভাবছি, ভাবাটা দরকার
লকডাউনের মেয়াদ বাড়ুক
সেটাই করুক সরকার

শিল্পপতির ব্যবসা তো লাটে
লকডাউনের লাথিতে
ওদের তো আছে হেলিকপ্টার
গরিব রয়েছে মাটিতে

ওরাই চাইছে এ লকডাউন
উঠে যাক এই দেশে রে
মোড়ের দোকান নাই বা খুলুক
জানি না কী আছে শেষে রে

লকডাউনের সময় বাড়ুক
তেমনটা খুব প্রয়োজন
সরকার আর শিল্পপতিরা
করুক ত্রাণের আয়োজন

মানুষ বাঁচুক, মৃত্যুমিছিল
থামুক রোগে বা ক্ষুধাতে
এ লেখা কবিতা হলো কি হলো না
এসো না এখন শুধাতে

বিপন্ন কবিতা

আজকে সমাজ উজাড় করছে যেই রোগ
এড়িয়ে চলছি প্রিয়জনদের সংযোগ
এভাবে কীভাবে বাঁচে বলো সভ্যতা
আমাদের যত অস্ত্র সকলই ভোঁতা

কঠিন যুদ্ধ, কী করে মানুষ জেতে হায়
আমরা কি তবে অসহায়! এত অসহায়!
ক্ষমতা নিয়ে কি করেছি বড্ড গর্ব
তারই পরিণামে আজ দলে দলে মরব!

বিজ্ঞান, সে কি মানবে এসব কথা রে
তবুও আমরা ডুবছি অকূল পাথারে
আকুল চিন্তা, কীভাবে পাব যে উদ্ধার
আমার অস্ত্রে শাণানো যাবে কি খুব ধার

মানুষ রে, তোর গর্বের শোধ কী দিবি
হাতে হাত রেখে আয় রে বাঁচাই পৃথিবী...

ই ন্দ্র নী ল ভ ট্টা চা র্য

ঢিল:

পৃথিবী ভুগছে গভীর অসুখে

পারমাণবিক অস্ত্র এবং প্রযুক্তির লোভ
সব হিসেব উল্টে দিয়েছে এখন...

এতদিন আমরা যারা খাঁচার বাইরে থেকে
ভেতরের দৃশ্য দেখতাম
তথাকথিত তারাই এখন খাঁচার ভেতর।

মাথার ওপর ঢিল ছুঁড়লে
তা মাথাতেই এসে পড়ে...

অস্পষ্টতা

বৃক্ষ তাকিয়ে থাকে তার ছায়ার দিকে
আর ছায়াও তাকিয়ে থাকে সেই বৃক্ষের দিকে
সম্পূর্ণ নিস্পৃহতায়, শূন্য চোখে।
দুঃখের ভেতর লুকিয়ে থাকে
হাজার স্তিমিত সূর্যের আলো

দহনের ভেতর লুকিয়ে থাকে
অম্লান মেঘ, ঝরায় অবিরত।

কালোর ভেতর খুঁজতে হয় আলো
আর আলোর ভেতর যে কালো
তারিইতো নাম দৃশ্যমানতা...

কুয়াশার ভেতর লুকিয়ে থাকে এক অতৃপ্ত খোঁজ
কুয়াশার ভেতর লুকিয়ে থাকে জীবনের রহস্য
কুয়াশার ভেতর লুকিয়ে থাকে অতল সন্ধান

তাই দৃশ্যমানতা থেকে অদৃশ্যই ভালো
বন্ধনহীন বাঁধনে দূরত্ব রাখাই ভালো।

নইলে রোজকার উদয়-অস্তের মতো
অপূর্ব দৃশ্যও –
কেমন সাধারণ হয়ে ওঠে...

এসো সবাই মিলে অস্পষ্টতার হাত ধরি
এসো নির্লোভ হই, পরিতক্ত আবর্জনার মত ছুঁড়ে ফেলে দিই প্রযুক্তির অসুখ।
শুধুই মানুষ নয়, এ পৃথিবীকে সকলের বাসযোগ্য করে তুলি।

পা প ড়ি ভ ট্টা চা র্য

সর্বভূক

ও খাচ্ছে সমস্তই খাচ্ছে গলা পর্যন্ত খাচ্ছে
পেট ফুলে যাচ্ছে তবু খাচ্ছে আর খাচ্ছে

ঘুম খাচ্ছে মন খাচ্ছে খিদে খাচ্ছে
সাবান খাচ্ছে ডেটল খাচ্ছে খেতে খেতে
আাবার তার খিদে পেয়ে যাচ্ছে,আর
চিবোচ্ছে পাকা মাথা ,ছিঁড়ে খাচ্ছে স্নায়ু
ঘিলুগুলোও ভাজা ভাজা করে খাচ্ছে
আর পাগলের মত খাচ্ছে আয়ু
মানুষ যখন খাচ্ছিল তার সুস্বাদু রস
গড়িয়ে গড়িয়ে নামছিল ঠোঁটের কাছে
কোষগুলো ঘিরে ষোলো আনা কিনে
সে নৌকো ভাসাচ্ছে নগরে ও গ্রামে ।

মহামারীর স্মৃতির সারনি বেয়ে সে আবার
আগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে উঠে এসেছে
আলো ছায়ার দেহ নিয়ে সে এখন সর্বভূক।

প্রার্থনা

ক্রমে নেমে আসছে অন্ধকার ,বিপর্যয়
জনজীবনে বোধোদয় হোক এই সময়
প্রার্থনায়,সামনে ভাসছে মৃত্যুগন্ধের কোলাজ
মিশে যাচ্ছে ভেদাভেদ টুপটুপ ।

যাকে চিনিনা জানিনা অথচ সতর্ক প্রহরায়
দিন রাত্রি একাকার,শরীরের ফুসফুস অসহায়
সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রাণ ঘাতি শেকড়
উপড়ানো যাচ্ছেনা।

মিঠে জল লোণা জল কোন জলই বইছেনা
শুধু স্বর্গ মর্ত পাতাল এক হয়ে করি প্রার্থনা
ঐ অদেখা অক্টোপাস হোক ম্যানগ্রোভ
মৃত্তিকার গর্ভ শুদ্ধ হোক
লক্ষ কোটি জীবানুরপলি সরিয়ে।

ম ঞ্জু শ্রী স র কা র

অভিবাসন

আজ মিছিল চলেছে উল্টো পথে
হাইওয়ে ধরে, রেললাইন ধরে
ভুখা মানুষের মিছিল।
নুন আনতে পান্তা ফুরানো পরিবারগুলির
কাঁধে পোঁটলা কোলে বাচ্চা
ফিরে যাচ্ছে
শিকড়ের টানে
তৃষিত মায়ের কোলে___
"কোলে তুলে নাও আর বার
ফিরে এসেছি আমরা।
ফেলে এসেছি শহরের যত আবর্জনা
পঙ্কিলতা গ্লানি অজানা মৃত্যু ভয়"

ওরা ভারতের বুভুক্ষু শ্রমজীবী
পঁচিশ দিনের লকডাউন
ঘরে
খাবার নেই, হাতে টাকা নেই
মাথার ওপর ছাউনী নেই
অন্ধকার ভবিষ্যত।

ওরা দেখেছে শহরের নগ্ন রূপ
ধনতন্ত্রের অন্তহীন ভয়াবহতা
৭৩ভাগ সম্পদ গচ্ছিত
এক শতাংশ মানুষের হাতে!
আর বাকি২৭ ভাগ!
সেখানেও যোচ্চুরি

তবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়
অতীতেও হয়েছে
ভবিষ্যতেও হবে
রামধনু রঙে রঙিন হবে পৃথিবী।

বন্দি দশা

বন্দিদশায় বদ্ধ সবাই
জীবন যেনো স্তব্ধ
ফুটপাথে শত নিরন্ন মানুষ
সরকার কেনো ক্ষুব্ধ?
চারিদিকে সব ভয়ে দিশাহারা
করোনা-ত্রাসে
উহান প্রদেশ করোনা মুক্ত
হাসে উল্লাসে।
লকডাউন বাড়ে আরো বেশিদিন
হতাশায় ভরে মন
সত্যি কি আমরা ফিরে পাবো সেই

আনন্দঘন ক্ষণ।
ক্ষিদের জ্বালায় কাঁদছে মানুষ
আয়ের পথ বন্ধ
লকডাউন-শেষে কলকারখানা
পাবে কি পুরনো ছন্দ?

বিপদের মাঝে প্রিয়জন কাঁদে
ফিরে যেতে চায় ক্রোড়ে
লকডাউন তুমি উঠে যাবে কবে
প্রিয়জনে পাবো নীড়ে
এসো হে বৈশাখ এসো তুমি নটরাজ
অশুভকে মুছে ফেলে
অতীতের যত তিক্ততা সব
ধুইয়ে চোখের জলে.......

অপেক্ষা

প্রিয়,
কিভাবে কটাচ্ছো প্রতিটা দিন?
প্রতিটা মুহূর্ত?
প্রতিটা সকাল?
প্রতিটা বিকেল?
একঘেঁয়ে লাগছে না!
লকডাউনের বাজারে সবাই গৃহবন্দী

মাঝিহীন তরী দিশাহারা......
ভাসতে ভাসতে ভেড়ে অজানা উপকূলে।
কোনখানে খুঁজে পাবে জীবনের ভাষা?

রঙিন স্বপ্নের ফানুস একদিন উড়িয়েছিলে আকাশে
গোধূলি বেলার রামধনু আঁকা।
একি অশুভ কোনো সংকেত?
আকাশ বাতাস পৃথ্বী আজ দূষণমুক্ত
তবে মানুষে মানুষে কেনো এই অজানা মৃত্যুভয়?
চোখ ফেটে গড়িয়ে পড়তে চায় নোনা জলের ধারা
বুকের ভেতরে শত শত অজানা ক্ষত,,,,...
সমবেদনার ভাষা নিয়ে পাশে আজ আর কেউ নেই

অনিমেষ তুমি ভালো আছো তো!
আজ চার দিন হলো তুমি কোয়ারেন্টিনে
কোনো খবর পাইনি আমি
ফিরবে তো সুস্থ হয়ে!!!
অপেক্ষায় থাকে মন।

নি র্ম ল ক র ণ

এলো রে বৈশাখ

এলো রে বৈশাখ
ভোরের বেলা তাইতো বাজে নতুন দিনের শাঁখ
নিম-হলুদে চান করে সব খুশির আলো মাখ ।

এলো রে বৈশাখ
নতুন করে নিজেকে আজ তৈরি করে রাখ
স্বপ্ন-সাগর উথলে ওঠে নায়ের মাঝি ডাক।

এলো রে বৈশাখ
দ্বেষ-হিংসা মনের থেকে যাক রে মুছে যাক
ছোট-বড় সবাই আমার বন্ধু হয়ে থাক।

এলো রে বৈশাখ
দুঃখ-ব্যথা মলিনতা রবির গানে ঢাক
ভয় 'করোনা' তাড়িয়ে দিয়ে নতুন জীবন আঁক

নর হাতে লেখা

একা চল একা থাক কথা বল দূরে
নাক মুখ ঢেকে রাখ মাস্কেই মুড়ে

কাশি জ্বরে আছে ভয়
যদি শ্বাসে ক্লেশ রয় ।
করোনা দিয়েছে হানা ইহলোক জুড়ে ।

অতি ছোট অনুসম যায় নাতো দেখা
তবু সেই এঁকে দেবে জীবনের রেখা !
বাজি রাখে মানবেরা
জগতের জীব সেরা,
করোনার আয়ু হবে নর হাতে লেখা।

জ য় গো পা ল ম ন্ড ল

অসম্পাদিত মহাকাল

আজ ঘুম আসছে না, অথচ তখন ঘুম স্টেশনে অপেক্ষায়
একেবারেই নীরব রাতের তারারা, মাঝে মাঝে শনশন হাওয়া ঘাই দেয়
দেখে নেয় রাজত্ব, কতটা বিস্তৃত
দ্বার বন্ধ করে পাড়া নয়, সারা শহর-বন্দর-পৃথিবী
চাঁদকে নিয়ে যখন সন্ধ্যা নামল
তখনো ঝড় ওঠেনি, ধীরে ধীরে চাঁদ ছোট হচ্ছে
জানালার সীসা ভেঙে জ্যোৎস্না ঢুকে পড়লেও
একটাও মোটা চোর ঢুঁ দেয়নি পাড়ায়

তাহলে কি দেশ থেকে বুভুক্ষা উধাও
চারিদিকে মাইকিং ঢেউ তুলো না
আতঙ্কে থাকবে না সতর্ক থেকো
প্রতিটি গলিতে বাঁশ বাঁধা গরাদও
তোমার ছায়াও যেন পথ না মাড়ায়, পিপিই পরা বামন ডাক্তার পথ একা
একা পার করে দেবে পগার, ঘরে থেকে দাও দক্ষিণা

ভোরের কোকিল যেন তাড়াতাড়ি ভৈরবী গায়
শান্ত নিরুপদ্রব, থানা নিঃসঙ্গ..... পানাপুকুরে দাম
দাম্পত্য সময় হলে নিশানের ডগায়
হাওয়া
নৌকা বাইবে আবার
নদী তো আজো বইছে রোদ্দুর মেখে গোষ্ঠ মেলায়

করোনা-পৃথিবী

ফাঁকা রাস্তা সই এক্কেবারে ফাঁকা
লোক দুটো যায় মাথায় ভর্তি ঝাঁকা
সবজি চাই সবজি, টাটকা সবজি
দুয়ার চেপে দাঁড়িয়ে পড়ে পাড়ার যত বৌঝি
কিছু পরে মাছওলা হাঁকে চিংড়ি সস্তা
কিনতে পারেন খোলা মনে, চলবে এক হপ্তা

কুকুরগুলো চেঁচায় না আর দেখে ভিনদেশী
দাদু বলে, খুলিস না খুকি হচ্ছে কেবল কাশি
নাতি ছোটে হাতে নিয়ে নব স্যানিটাইজার
ধুয়ে দাও ভালো করে, এটা দাও একবার
ভয়ে মরে মানুষজন ভয় পায় না ডাক্তার
প্রণাম জানাই তাঁদের কেবল উঠতে বসতে নমস্কার
সামনাসামনি যুদ্ধ করে পুলিশ নার্সও
বন্দি থেকে যুদ্ধে ঘরে থেকে তোমরাও

মাঝে মাঝে নটরাজকে পথে নামতে হয়

যেভাবে এগোচ্ছে চিত্রনাট্য, যেভাবে ঘুরে বেড়ায় মানুষ
নিজস্ব ঢঙে
সম্পর্কের গর্ভযোগ ছন্দহীন
সময়ের নদীগর্ভে গর্ভবতী নদী

ভাঙছিল
নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছি, একটা একটা করে সাদা চিঠি
প্রচ্ছদখানা ---------- প্রচণ্ড গ্রীষ্মে দাবানল
কালো কালো অক্ষরে শব্দগুলো সীমানার মধ্যে একটা হলো
একটা বৃত্ত বৃত্তাকার বন্দি
ভালোবাসা নদী, অবাধ সাঁতারে নিষেধাজ্ঞা তরল আবেগও
ফাঁকে ফাঁকে ফাইল ফাঁকা
উঠতে বসতে সাবানপ্রেম
অথবা এ্যালকোহল মাখো
মেয়েদের আঁচলের সুগন্ধি উধাও
মৃত্যুর উৎসবে যোগ, ছোট হচ্ছে ঘর আরো ছোট করো
দেবীমূর্তি নির্বিকার চোখেমুখে কাঁটা
একা একা ঘুম খেলা গান নাচ
পুরুতঠাকুর একা মাখে শান্তিজল
জাপটে ধরা খুঁটিতে ঘুন, ঘুনির মতো
কোথাও কবর একাকী কোথাও শ্মশানচিতা অগ্নিহীন
তবুও কোনো রং চোখের আরাম দেবে বলে ঠায় দাঁড়িয়ে
দীপ হাতে জন্মভূমি
মাছ ধরতে নামলে পাঁকের ছিটে তো লাগবেই
নিজেকে প্রবোধ দাও আলো-আঁধারি খেলা প্রাকৃতিক

ব ন শ্রী রা য় দা স

দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো

অনেকদিন এ পথে যায়নি পোস্টম্যান
কালোপুরু চশমা হাওয়ার ওপর রেখে
ধরিত্রী-সুন্দরী, কপালে মৃত্যু নদী টিপ,
আকাশের নীল খামে
খাগের কলমে চিঠি লিখে চলেছেন
সবুজ পৃষ্ঠার বুকের ঐশ্বর্যে,
বসন্ত রঙিন ঘোমটায় অর্বুদ জ্বর ।

যদিও বীজাণু মুক্ত জল বায়ু মাটি
ভালো নেই পৃথিবীর সন্তান সন্ততি ।

নীলকণ্ঠ

সর্বাঙ্গে জারিত বিষ
দুহাতের তালুতে মাখামাখি মৃত্যু বীজ,
শুষে নিচ্ছে বিপর্যয়ের ত্রাস চিকিৎসক, সেবিকা
পাঁজরের গোপনে নীল হচ্ছে শরীর
রাতদিন সঙ্গম করছে মৃত্যুর পোতাশ্রয়ে।

মোহিনী মায়াজাল টুকরো করে
তারাই এখন নিরাময় কেন্দ্র, নীলকণ্ঠ।

@ প্রবন্ধ - ৪

শিল্প ও বিজ্ঞান (লেখক : অ্যাইস্যাক অ্যাসিমভ)
অনুবাদ : সৌমিত্র চৌধুরী

জ্ঞান অখণ্ড। অনেক মানুষ কোন একটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে অন্য বিষয়কেও করায়ত্ত করতে পেরেছেন। কেউ যদি জ্ঞানকে খণ্ডিত ভাবেন, অন্য বিষয়কে উপেক্ষা করে শুধু মাত্র একটি বিষয়ে মনোসংযোগ করেন, তাহলে তাঁর পক্ষে প্রকৃত জ্ঞানী হয়ে ওঠা অসম্ভব। নিজের অধীত বিষয়টিতেও তিনি অজ্ঞ থেকে যাবেন।

মানুষ অনেক সময় বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে এমন কথা বলেন যেন ওই দুটো বিষয় সম্পূর্ণই আলাদা। পরস্পরের সাথে যেন কোনই সম্পর্ক নেই। তাদের ধারণা শিল্পীরা হন আবেগ প্রবণ। তাঁদের সৃষ্টির মূলে কাজ করে তাদের স্বজ্ঞা, অনুভূতি বা স্বতঃলব্ধ জ্ঞান (intuition)। কোনো সচেতন বিচার-বিবেচনা বা যুক্তি-তর্ক ছাড়াই যেন তাদের সৃষ্টি কর্মটি ঘটেছে। হঠাৎ করেই যেন তিনি সব দেখতে পেয়ে যান। যুক্তি ও ভাবনার ধার ধারেন না তিনি। অপর পক্ষে বিজ্ঞানী শান্ত। শুধু যুক্তির উপরই তাঁর নির্ভরতা। ধাপে ধাপে তিনি যুক্তি সাজান। এর মধ্যে কল্পনার কোন স্থান নেই। সম্পূর্ণই মিথ্যে এমন ধারণা। সত্যিকারের শিল্পী খুবই যুক্তি নির্ভর (Rational) এবং আবেগ প্রবণ। এবং জানেন তিনি কী করতে চলেছেন।

খাঁটি বিজ্ঞানী কিন্তু খুবই কল্পনা প্রবণ। এবং যুক্তিবাদীও। কখনও কখনও উপসংহারে দ্রুত পৌঁছে যান যেখানে যুক্তিনিষ্ঠ পদক্ষেপ এগোয় অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে।

মানব সভ্যতার অগ্রগতির দিকে তাকালে দেখা যায় বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা পরস্পরের হাত ধরে এগিয়েছে। একের উন্নতি নির্ভর করেছে অপর শাস্ত্রের অগ্রগতির উপর।

অতীত কালে, উদাহরন স্বরূপ, শিল্পীরা চেষ্টা করতেন তাদের অঙ্কিত বিষয়টি যেন বস্তুনিষ্ঠ হয়। সমতল ক্ষেত্রে ছবি আঁকতেন এবং বোঝাতে চাইতেন তাদের ছবির গভীরতা। ছবির ত্রিমাতৃক তাৎপর্য। এমন করতে হলে ছবির কোন বিষয়কে খুব ছোট আকারে আঁকতে হবে।

ইতালির শিল্পী লিও ব্যাতিস্তা আলবার্তি(১৪০৪-১৪৭২) একটা বই লিখেছিলেন(১৪৩৪) রেনেসাঁ সময়কালে। কেমন করে শিল্প বস্তুটির প্রেক্ষাপট (পারস্পেক্টিভ) সঠিক ভাবে তুলে ধরা যেতে আরে। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন অঙ্ক শাস্ত্রের হিসেব নিকেশে। ফলস্বরূপ শিল্পের একটা বিশেষ দিকের সমস্যার সমাধান হল। আর তাঁরা তৈরি করে ফেললেন এক নতুন জ্যামিতি বিজ্ঞান। যার নাম প্রজেক্টিভ জিওমেট্রি।

আবার মধ্যযুগে মানুষের শরীরতত্ত্ব বা অ্যানাটমির জ্ঞান ছিল খুব কম। মৃত দেহ কাঁটা ছেঁড়া না করলে তো অ্যানাটমির জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সময় মৃতদেহ কাঁটা ছেঁড়া বা শব ব্যবচ্ছেদ ছিল কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য শরীরতত্ত্ব বা অ্যানাটমির জ্ঞান খুবই জরুরী। তাই শব ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকার কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি আটকে ছিল দীর্ঘকাল।

কিন্তু অ্যানাটমির জ্ঞান তো শিল্পীদেরও দরকার। ইটালির শিল্পী লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি মানুষের যথার্থ ছবি আঁকতে চাইতেন। মানুষটির অবিকল চিত্রকর্ম। তেমন ছবি আঁকতে চাইলে তো অ্যানাটমি জানতে হবে। শরীরের পেশী ও হাড়ের গঠন আদতে কেমন, জানতে হবে।

সে সময় (১৫০০ সাল নাগাদ) তিনি গোপনে, শাস্তির ভয় সত্বেও ত্রিশ খানি মৃত শরীরের ব্যবচ্ছেদ করলেন। রাতের অন্ধকারে কবর থেকে মৃতদেহ তুলে নিয়ে তিনি ব্যবচ্ছেদ করতেন। শরীরের ভিতর হাড় ও মাংস পেশীর গঠন গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। আর সেই বিষয় গুলির ছবি দ্রুত হাতে এঁকে ফেলতেন।

অসাধারণ সেই সব ছবি। হার্টের গঠন স্টাডি করেছিলেন তিনি। আর বুঝতে পেরেছিলেন, কেমন করে হার্ট যন্ত্রটি পাম্প করে শরীরের সর্বত্র রক্ত সরবরাহ করে।

অন্য ভাবেও এই জ্ঞানটি কাজে লেগেছিল। অর্ধ শতাব্দী পরে বেলজিয়ামের এক চিকিৎসক ভ্যাসিলাস (Andreas Vesalius) শব ব্যবচ্ছেদ করলেন। এবং প্রকাশ করলেন বিখ্যাত এক বই 'on the structure of human body' (১৫৪৩)।

আধুনিক অ্যানাটমি এবং পরবর্তী কালের ওষুধ বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রস্তর এই বই। এই শাস্ত্রের এক মাত্র কারিগর ভ্যাসিলাস নন। অন্য অনেক চিকিৎসকরাও মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করতেন। তাঁরাও শরীর তত্ত্ব (Anatomy) বিষয়ে বই লিখেছিলেন। কিন্তু এদের সকলের মধ্যে ভ্যাসিলাসের কাজই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেল। কেন? তাঁর কাজের বিশেষত্ব কী ছিল?

ভ্যাসিলাসের বইয়ের বিশেষত্ব অসাধারণ সব ছবি। ভ্যাসিলাস তাঁর বইয়ে ছবি আঁকবার জন্য ডেকে আনলেন বিখ্যাত এক শিল্পীকে। তিনি ডাচ দেশের শিল্পী Jan Stevenszoon van Kalkar (ভেনিশের চিত্রশিল্পী টিটিয়ান-এর শিষ্য)। ভ্যাসিলাসের বইয়ের বিষয় ইলাস্ট্রেট করতে শুরু করলেন স্টিভেন্সুন। একটা ছবি যতটা ব্যাখ্যা করতে পারে, হাজার হাজার শব্দ তা করতে পারে না। বইটিতে অসাধারণ সব ছবি পরিবেশনের জন্যই অ্যান্ড্রে ভ্যাসিলাস (Andreas Vesalius) আধুনিক শরীর বিদ্যার (Anatomy) জনক হিসাবে সম্মানিত হয়ে রইলেন।

পরবর্তী কালেও বিজ্ঞান ও শিল্পের সম্মিলিত যাত্রা অব্যাহত ছিল। জার্মান বিজ্ঞানী জন উইলহেল্ম (John Wilhelm Ritter) দেখলেন (১৮০১) যে সূর্যালোক সাদা রঙের সিলভার ক্লোরাইডকে ভেঙে দেয় (Decompose)। তৈরি হয় সিলভার ধাতুর কালো ছোট্ট কণা।

সূর্যালোকের প্রভাবে কালো রঙ তৈরি হল। একে কাজে লাগিয়ে কি ছবি আকা যাবে? বিজ্ঞানিরা ব্যাপারটিকে কাজে লাগাতে পারেন নি। পারলেন এক শিল্পী। ফরাসী শিল্পী Louis Jacques Mande Daguerre। তিনি থিয়েটারের পটভূমি বা দৃশ্যপট

(ব্যাকড্রপ) আঁকলেন ব্যাপারটা কাজে লাগিয়ে। ভাবতে থাকলেন (ব্যাপারটা কাজে লাগিয়ে) যদি আর কোন ভালো কাজ করা সম্ভব হয়।

আধুনিক বিজ্ঞান বড় বড় আবিষ্কার ঘটিয়েছে। যখনই শিল্পীর দৃষ্টিতে বিজ্ঞানী মহাকাশের দিকে তাকিয়েছেন, অনুভব করেছেন এই বিশাল মহাবিশ্ব অত্যন্ত সুচারু ভাবে এবং যথার্থ সামঞ্জস্য (symmetry) বজায় রেখে সৃষ্টি হয়েছে। এর যন্ত্রপাতি, সৃষ্টি সবই অতি সরল (Simple) সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল। তারা বিশ্বাস করেন মহাবিশ্বের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাও হতে হবে অতীব সুন্দর। কোন অসুন্দর তত্ত্ব দিয়ে মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। মহান শিল্প সুষমার আর এক নাম, এলিগ্যান্ট (সুশ্রী)। আর বিজ্ঞানিদের অনুসন্ধানেও আছে সেই এলিগ্যান্টের খোঁজ।

স্কটল্যান্ডের বৈজ্ঞানিক জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৭৯ সাল নাগাদ) উদ্ভাবন করলেন চারটে সূত্র (ইকুএশন)। অত্যন্ত সুন্দর এবং নিখুত সেই সব সূত্র। সূত্র গুলো নিপুণ ভাবে সামঞ্জস্য (Symmetry) বজায় রেখে প্রকৃতির বহু বিষয় খুব সুন্দর ভবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হল। এই সূত্রগুলো আলোক(Light) চুম্বক (Magnetism) এবং বিদ্যুতের (electricity) পারস্পরিক সম্পর্ক জানান দিল। বিজ্ঞানিরা বুঝতে পারলেন সূত্রগুলো নিখুঁত নির্ভুল এবং এলিগ্যান্ট। অসাধারণ সুন্দর (এলিগ্যান্ট) সেই সূত্র গুলো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হল।

সেই থেকেই আমাদের বৈজ্ঞানিক মানসে প্রতিভাত হল যে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো অতি সহজ সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। যেমন কুয়ান্টাম থিয়োরির একটি প্রধান ধারণা প্রকাশিত হয় $E=hv$ সূত্র দিয়ে। স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির খুব বড় একটা ধারণা প্রকাশিত হল $E = mc^2$ সূত্রের মধ্য দিয়ে।

জেনারাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি (১৯১৬ সালে উদ্ভবিত) সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। অন্য বিজ্ঞনিরাও এই বিষয়ে একাধিক সূত্র তৈরি করেছিলেন। এগুলির কোনটা সঠিক, এখনও বিজ্ঞানিরা বুঝে উঠতে পারেন নি। তবে সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে

আইনস্টাইনের সূত্র সব চাইতে সংক্ষিপ্ত এবং নিখুঁত। সবচাইতে এলিগ্যান্ট। অনেক পদার্থবিদ বলেন, এই সূত্র অভ্রান্ত। কারণ এটি খুবই শিল্প সম্মত।

ডাচ রসায়নবিদ ভন্ট হফ একটি সূত্র আবিষ্কার করলেন (১৮৭৪ সালে)। জীবিত প্রাণীর শরীরে ক্রিয়াশীল জটিল অণু গুলির কাজ ব্যখ্যা করা সম্ভব হল এই সূত্র প্রয়োগে। কী এই সূত্র? এক কার্বন পরমাণু চারটে অন্য পরমাণুকে বন্ডের মাধ্যমে ধরে রাখতে পারে। ভ্যান্ট হফ বললেন, কার্বন পরমাণুর যোজ্যতা (valency) চার। আর কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরি অণুর গঠন হয় টেট্রাহেড্রাল। কার্বন পরমাণুর চারদিকে চারটে বন্ড একটা ত্রিমাতৃক টেট্রাহিড্রন তৈরি করে।

এখানেই শেষ নয়। এই আবিস্কারের ফলে অনুর ত্রিমাতৃক গঠন আঁকা সম্ভব হল। সেই সব চিত্র যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য তেমনই আবার দৃষ্টি নন্দন। সুদৃশ্য শিল্প। জেমস ওয়াটসন এবং ফ্র্যান্সিস ক্রিক নিউক্লিক অ্যাসিডের ডবল হেলিক্স গঠন প্রমাণ করলেন (১৯৫৩)। নিউক্লিক অ্যাসিড জীব দেহের কোষের প্রধানতম উপাদান।

বিজ্ঞানের বহু বিষয়ের ছবি নিয়ে বই প্রকাশ হয় (Mcgraw-Hill Yearbook of scienCe and Technology)। ছবি গুলোতে যেমন বিজ্ঞনের তত্ত্ব প্রকাশ হয় তেমনই আবার ছবি গুলোর শিল্প সুষমা প্রকাশ পায়।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে স্পঞ্জ বা ডায়াটমের ছবি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। বিষ্ময় জাগে মনে, এসব শিল্পকর্ম না বিজ্ঞান? যাই হোক না কেন, এগুলো আদতে একই বিষয়।

(অ্যাইস্যাক অ্যাসিমভের ‘দি রোভিং মাইন্ড’ বই-এ ‘আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স’ প্রবন্ধের অনুবাদ)।

অনুবাদকঃ ড. সৌমিত্র কুমার চৌধুরী, এমেরিটাস মেডিক্যাল স্যায়েন্টিস্ট, বিজ্ঞানী (প্রাক্তন), চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা সংস্থা, ৫ম তল; ৩৬ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড।

হা বি ব আ র র হ মা ন

বাঙালি মুসলমান সমাজ ইতিহাসের ঘুমভাঙ্গা

বাঙালি মুসলমান সমাজের, বিশেষত জাগরণ পর্ব সম্পর্কে কথা বলার আগে এই সমাজের উদ্ভব প্রক্রিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিলে ভালো হয়। কারা বাঙালি মুসলমান? কী তাদের জন্মগত উৎস? ১৮৭২ সালে সরকারিভাবে বাংলায় প্রথম লোক গণনা হলে দেখা যায় মুসলমানের সংখ্যা বিপুল, ছিল শতকরা ৪৮ ভাগ। এই পরিসংখ্যান এতদিনকার ধারণা উল্টে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে লেখালেখি শুরু হয় এবং সে-পরিপ্রেক্ষিতে বিতর্ক। সে-সবের বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই। আপাতত এটুকু বললে চলবে যে কেউ বলেন এরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত, কারো মতে এরা তলোয়ারের ভয়ে এরা মুসলমান হয়েছে, আবার এই দুই মতই অস্বীকার করে কেউ অভিমত প্রকাশ যে এরা বহিরাগত মুসলমানের বংশধর, অন্তত অধিকাংশ। এগুলোর মধ্যে তলোয়ারের মত একেবারেই ধোপে টেকে না। কেননা এ যদি সত্যি হতো তাহলে মুসলিম-শাসনের কেন্দ্রস্থলগুলোতে-আগ্রা, দিল্লি, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতেন। তা না হয়ে গরিষ্ঠ হলেন বাংলায়, তাও আবার পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলে। নদীর গতিপথ পরিবর্তনে নতুন নতুন ভূমি জেগে-ওঠা, খুলনা-বরিশাল জেলার নিম্নাঞ্চলে বন কেটে বসত ও আবাদ এর একটা বড় কারণ। সপ্তদশ শতকে লেখা কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে এর চমৎকৃত হওয়ার মতো বিবরণ আছে।

নানা দিক বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় যে বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত। ভারতে উচ্ছেদ হওয়ার পর এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্বাঞ্চলের বাংলা এলাকায় বিদ্যমান ছিলেন বলে অনেক ইতিহাসবিদ মত প্রকাশ করেছেন। বর্ণহিন্দু যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। মুসলমান সমাজের বাকি অংশ বহির্বাংলা ও বহির্ভারত থেকে আগত মুসলমানদের বংশধর। মুসলিম শাসনের অবসানের অভিঘাতে প্রশাসনিক, সামরিক ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী বহির্বাংলা থেকে আগত মুসলমানদের একটা অংশ বাংলা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। যারা এখানে বসতি গড়েছিলেন ও অন্য কোথাও যাওয়ার সাধ্য যাদের ছিল না, তারা এদেশেই রয়ে গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখনীয়। নিম্নবিত্ত যারা এসেছিলেন,

যেমন সাধারণ সৈন্য, এবং অন্যরাও অনেকে পরিবার-পরিজন বিশেষ করে স্ত্রী নিয়ে ভারতে বা বাংলায় আসেননি। এরা স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করে এদেশে বসতি গড়েছিলেন। প্রচলিত ধারায় এদের সন্ততিরা পিতার বংশগত বিদেশী পদবিতে পরিচিত হয়েছেন। এদেরও শরাফতির ভিত্তি পিতার বৈদেশিক সূত্র। মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর মুসলিম বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে লিখেছেন দুই-তিন পুরুষে বাঙালি ব'নে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন কি না তা যথাস্থানে বলা যাবে।

সমাজতাত্ত্বিক সাধারণ নিয়মে কি না বলতে পারব না, কিন্তু বাংলায় যা ঘটেছিল তা হচ্ছে বৃত্ত ও তজ্জনিত কারণে সামাজিক স্তরভেদ হেতু দেশীয় অনেক মুসলমান বিদেশী পদবি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ও ফারসিতে এ সম্পর্কিত কিছু প্রবাদ প্রবচন পাওয়া গেছে। দুটো বাংলা প্রবাদ আমরা উল্লেখ করছি – প্রথম পদ্য, দ্বিতীয়টি গদ্য।

১. আগে ছিল উল্লা–উল্লা
মাঝে হল উদ্দিন
তলার মামুদ উপরে যায়
কপাল ফিরে যদ্দিন।

২. গতবছর আমি জোলা ছিলাম, এ বছর শেখ হয়েছি,
ফসলের ভালো দাম পেলে আসছে বছর আমি সৈয়দ হবো।

শরাফতির বড়াই যারা করতেন, এরাও তাদেরই দলের। বাংলায় ব্রিটিশ–অধিকারের ফলে মুসলমানরা শোচনীয় দুর্দশায় পতিত হন বলে আমাদের শিক্ষিত সমাজে এখনো সাধারণভাবে ধারণা প্রচলিত আছে। ইতিহাসের অনেক বইতেও তা লেখা হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে পতিত হিন্দুরাও হয়েছিলেন। তফাত হচ্ছে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে হিন্দুরা নিজেদের পুনর্গঠিত করে নিচ্ছিলেন, যা মুসলমানরা করেননি। এছাড়া এ তথ্যও মনে রাখা দরকার যে নবাবি আমলে জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন, প্রশাসনিক বিভিন্ন পদাধিকারী সিংহভাগ ছিলেন হিন্দু। কেবল বিচার ও সৈনবিভাগে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। তাও বড় বড় পদের অধিকারী ছিলেন অবাঙালি মুসলমান। শিক্ষার ক্ষেত্রেও হিন্দুরা অগ্রগামী ছিলেন, এমনকি আরবি-ফারসি শিক্ষাতেও। মোটকথা নবাবি আমলে হিন্দু সমাজে ক্ষুদ্রাকারে হলেও কিন্তু দৃশ্যমানভাবে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ আসলে এরা দ্রুত নতুন শাসনব্যবস্থা ও ভাষা–সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারি কিনতে পেয়েছিলেন তারাই যাদের হাতে নগদ টাকা ছিল। ওই সৌভাগ্যের অধিকারী বেশিরভাগ যে হিন্দুই হবেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি তথ্য স্মরণ রাখতে বলি। বিশ শতকের গোড়ার দিককার সেন্সাস রিপোর্টেও দেখা যাচ্ছে মুসলিম জনসংখ্যা ৮৫% ভাগ গ্রামের বাসিন্দা এবং মুখ্যত শ্রমজীবী। এদের বেশির ভাগই কৃষক ও তাঁতি। শাসক পরিবর্তনে প্রথমদিকে এদের জীবনযাত্রায় ইতর-বিশেষ তেমন ঘটেনি, তবে তা ঘটতে থাকে ক্রমশ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (এর শিক্ষার হিন্দু কৃষকও), ১৮২৮ সালে লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি, বিদেশি বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় দেশীয় তাঁতশিল্পের প্রায় ধ্বংস হওয়া (তাঁতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান) ১৮৩৭ সাল থেকে অফিস আদালতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার বিধিবদ্ধ হওয়ার বিচার বিভাগ ও তৎসংশ্লিষ্ট পদ থেকে ইংরেজি না-জানা মুসলমানদের বেকার হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা উচ্চ-মধ্যবিত্ত মুসলমান যারা ছিলেন তাদের আর্থিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটায়।

একটি বহুল প্রচলিত মত এই যে ইংরেজ শিক্ষায় অনীহা মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ। এটি সত্য কেবল স্বল্পসংখ্যক সেই মুসলমানদের জন্য যারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সন্তানকে এই শিক্ষাদানের ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করেননি। সে আমলে ইংরেজি শিক্ষা খুবই ব্যয়বহুল ছিল। কিন্তু এ-ও তো সত্য যে দরিদ্র হিন্দু-সন্তান কাউকে কাউকে প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষা লাভ করতে দেখা গেছে। আপাতত এ প্রসঙ্গ রেখে মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। সত্য এই যে মুসলমান সমাজের সিংহভাগ অধঃপতিত আগে থেকেই ছিলেন। নতুন ব্যবস্থায় সেটা আরও পতনের দিকে গেছে।

তথ্য ও বিচার-বুদ্ধি সজাগ রেখে পুরো পরিস্থিতি অনুধাবন না করলে সত্যে পৌঁছানো যাবে না। মনে রাখতে হবে ১৮৩৭ পর্যন্ত ফরাসি-জানা যে-সকল মুসলমান বিচার বিভাগের নানা পেশায় যুক্ত ছিলেন তাদের অনেকেরই কি সন্তানকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার আর্থিক সামর্থ ছিল না! যুক্তি হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবের কথা বলা হতে পারে। কিন্তু এমন তথ্য আমাদের হাতে রয়েছে যে প্রতিষ্ঠানের বাইরে নিজের তাগিদে হিন্দু সমাজের কেউ কেউ ভালো ইংরেজি শিখেছিলেন। সমর্থকদের কথা বাদ দিয়েও দরিদ্র সন্তান কিংবা ব্যক্তি-প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিখেছেন এমন দৃষ্টান্ত মুসলমান সমাজে দেখা যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে হিন্দু যা পারেন, মুসলমান তা পারেন না কেন? সমস্যাটা ঠিক কোথায়?

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সামাজিক ইতিহাসের দিকে একটু নিবিড়ভাবে তাকালে প্রশ্নটির কিছু উত্তর মিলবে। এই সময়পর্বে হিন্দু সমাজ নানাভাবে নিজেদের নবচেতনা নির্মাণ করে নিচ্ছে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সামাজিক বিভিন্ন আন্দোলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। যদি খানিকটা সীমিত অর্থেও ধরি তবু এই নবচেতনার উদ্ভাসনকে রেনেসাঁ বলতে কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়। অন্যদিকে প্রতিবেশী মুসলমান সমাজে ঘটেছে ধর্মশুদ্ধি আন্দোলন – তারিকা–ই–মুহম্মদিয়া ও ফরায়েজি আন্দোলন। প্রথমটির উদ্ভব দিল্লিতে, দ্বিতীয়টির বাংলার ফরিদপুরে। দুটি আন্দোলনেরই লক্ষ্য এক – ইসলামের আদি বিশুদ্ধতায় ফিরে যাওয়া। বাংলা তথা ভারতে মুসলিম জীবন থেকে তথা অনৈস নামিক তথা হিন্দুয়ানি ধ্যান ধারণা, আচার-আচরণ দূর করে সেখানে ইসলামের খাঁটি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল আন্দোলন দুটি। বাংলায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল।

খুবই সঙ্গতভাবে বলা যায় এসব আন্দোলন অতীতে ফেরার প্রচেষ্টা, বর্তমান এদের ভাবনার মধ্যে ছিল না। রক্ষণশীলদের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ সৃষ্ট বর্তমানের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ইসলামের প্রতি শৈথিল্য দেখানো। বলা হতে লাগল মুসলমানের দুর্দশার কারণ 'প্রকৃত' ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া। সেজন্য উন্নতি করতে হলে খুব দৃঢ়ভাবে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে হবে। প্রথমদিকে আন্দোলনদুটির সঙ্গে ব্রিটিশ– বিরোধী চেতনা সংশ্লিষ্ট ছিল না, কিন্তু পরে ঘটনাচক্রে ব্রিটিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এর একটা সদর্থক ফল এই দাঁড়ায় যে ভারতীয় মুসলিম মনে ব্রিটিশ–বিরোধী চেতনা জন্মলাভ করে। কিন্তু একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর দুটি ধারণাও জন্ম হয়। একটি হচ্ছে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা, যা দেশ ও ভাষাগত জাতীয়তাবাদী ধারণা সৃষ্টিতে বাধা দেয়। এ ব্যাপারে হিন্দু সমাজের দায়িত্বের কথা স্মরণে রেখেও ইতিহাসের বস্তুবাদী পাঠে মন্তব্যটি না করে উপায় নেই। অন্য চেতনাটি হচ্ছে আধুনিক জীবন–চেতনা থেকে দূরে থাকা।

আনিসুজ্জামান, ওয়াকিল আহমেদ প্রমুখ গবেষকদের মতে বাঙালি মুসলমানের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করার মূল কারণ অনীহা বা বিরূপতা নয়, তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। মতটি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। বাংলার সকল মুসলমানই কি এতটা দরিদ্র ছিলেন যে তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার খরচ জোগানো সম্ভব ছিল না? সামর্থ্য যাদের ছিল তারাও কেন উদ্যোগী হননি? দুটি কারণ ধারণা করা যায়। একটা ইংরেজকে আর সবকিছু সহ ভালো চোখে না দেখা এবং অন্যটা, 'বেদীন' শিক্ষার পাপ-চেতনা সৃষ্টিতে বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে

আলেম-মৌলানা- মোল্লা শ্রেণীর ভূমিকা যতটা ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ সমকালীন পত্র-পত্রিকা পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং দারিদ্র্য যেমন ছিল, তেমনি অনীহাও ছিল, কিন্তু অনীহার চেয়ে বেশি ছিল বিরূপতা।

এই অবস্থায়, খুব ধীরে হলেও, পরিবর্তন ঘটতে থাকে সত্তরের দশকের পর থেকে। উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমেদের আলীগড় আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ-শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন ও পাশ্চাত্য বিদ্যার্জনের প্রার্থনা সৃষ্টি। বাংলাদেশের নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলি মূলত স্যার সৈয়দের পথ অনুসরণ করে তাঁদের নিজের প্রদেশের মুসলিম সমাজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন। এঁদের, বিশেষ করে আবদুল লতিফের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেও বলতে হবে সৈয়দ আহমেদের মতো রেডিক্যাল তিনি ছিলেন না। মুসলমান সমাজকে তিনি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন ওই শিক্ষার প্রাণ-চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার জন্য নয়, চাকরি-বাকরি পাওয়ার সুবিধা লাভের জন্য। পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা রহমান রাখার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। নিজে যেমন বাংলা জানতেন না, তেমনি বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ারও বিরোধী ছিলেন। তবে এই 'বিবেচনাটুকু তিনি করেছিলেন যে নিম্নশ্রেণীর মুসলিম-সন্তানকে বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, তবে সে বাংলা হবে 'মুসলমানি' বাংলা। সৈয়দ আমির আলি মাদ্রাসা শিক্ষা সমর্থন করেননি, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি।

উল্লিখিত দুজনের প্রচেষ্টা এবং এই সময়ে বিশ্ববাজারে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব বাংলার মুসলিম কৃষকদের একাংশের হাতে নগদ অর্থের আগমন পরিস্থিতি পাল্টে দিতে থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের তালিকা থেকে দেখা যায় ১৮৮৫ সাল থেকে প্রেসিডেন্সি, হুগলি ও ঢাকা কলেজ-এর গ্রাজুয়েটদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ঠিক এই সময়েই কয়েকজন সমাজহিতৈষী মুসলিম সাহিত্যিককে কলকাতায় সমবেত হতে দেখা যাচ্ছে। তাঁরা হলেন শেখ আবদুর রহিম, রেয়াজ-অল-দীন মাশহাদী রিয়াজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ। 'সুধাকর' নামের এক পত্রিকাকে জড়িত করে সাহিত্যের ইতিহাসকার এঁদের 'সুধাকর দল' নামে চিহ্নিত করেছেন। এঁরা পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত ছিলেন না বটে কিন্তু নিজেদের সমাজের দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই সচেতনতাই তাঁদের কলকাতায় সমাবেশ করেছিল।

সুধাকর দলের নামের পরিচয় পত্রিকার নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও দলটি একটি বিশেষ জীবন-দর্শনের ধারক-বাহকও বটে। তাঁরা মনে করতেন অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে পুনর্জীবিত করতে হলে মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের গৌরবান্বিত অতীত ইতিহাস নানাভাবে সাহিত্যের মাধ্যমে সামনে তুলে ধরতে হবে। বোঝা যায় প্রচলিতভাবে সৃজনশীল রসসৃষ্টি অর্থে এঁরা সাহিত্যকে বুঝেননি, বুঝেছেন একটি বিশেষ অর্থে। সেটি হলো ধর্মীয় বীর-পুরুষদের কাহিনী রচনা ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যান। একে বলা হতে থাকে ইসলামি বা মুসলিম সাহিত্য বা মুসলমানের জাতীয় সাহিত্য। কেবল সেদিন নয়, আজও তা বলা হচ্ছে। তাও শুধু বাংলাভাষী অঞ্চলে নয়, আন্তর্জাতিকভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজে। কিন্তু ইসলামি মুসলিম সাহিত্য বস্তুত কী, তা সেদিনও যেমন কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারেননি, আজও তেমনি পারছেন না।

এই মতানুসারীরা উপন্যাস নাটক ও গল্প রচনা সমর্থন করেননি। এমনকি দু-একজন কবিতা লেখার বিরোধিতা করেছেন। জনৈক নজির আহমেদের বিবেচনায় উপন্যাস পড়া মাদকদ্রব্যের নেশার মতো ক্ষতিকর। আর ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মতে উপন্যাস হচ্ছে গাঁজায় দম দিয়ে একটা গল্পের স্রোত বইয়ে দেওয়া, যা সমাজের জন্য অকল্যাণকর। অথচ হিন্দুরচিত 'মুসলিম-বিদ্বেষী' উপন্যাসের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে গিয়ে তিনি কিন্তু ওই কাজই করেছেন অর্থাৎ উপন্যাস লিখেছেন। অবশ্য তাদের বিরোধিতার আরেকটি কারণ এই যে মঞ্চে হিন্দুরচিত এমন নাটকের প্রদর্শন যাতে মুসলমানদের আহত হওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল। কবিতার বিরোধিতা করতে গিয়ে বলা হয়েছে কবিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'বাতিল' পথে আকর্ষণ করা; এর রচয়িতা একজন মিথ্যেবাদী, কামাসক্ত ও পাপাত্মা মানুষ মাত্র।

যাদের কথা বলা হলো, বোঝা যায়, তারা এক স্বতন্ত্র পথের অনুসারী। সে-পথের নিয়ন্ত্রক একান্তভাবে ধর্মীয় চেতনা। কেবল সাহিত্য-সংস্কৃতি নয়, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এদের ভাবনা ওই চেতনা দ্বারা প্রভাবিত ও চালিত। এরা স্বতন্ত্রবাদী বা স্বাতন্ত্র্যপন্থী হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত। চেতনে-অবচেতনে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এরা পুনরুত্থানবাদী (Revisalist)। কিন্তু সমাজেও সাহিত্যে এদের পাশাপাশি সমন্বয়বাদী একটি ধারাও ছিল। প্রথম মুসলিম গদ্যশিল্পী মীর মোশারফ হোসেনের প্রথম জীবনের সাহিত্যকর্মে – বিষাদ-সিন্ধু, গাজী মিঞার বস্তানী, উদাসীন পথিকের মনের কথা, জমিদার-দর্পণ-এ এই ধারার প্রকাশ সুচিহ্নিত। তাঁর 'গো-জীবন' প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

মুসলমানদের গরুর মাংস খাওয়া ত্যাগ করা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। রক্ষণশীলরা তাঁর বক্তব্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ উসকে দিয়েছিলেন। ফলে সারা বাংলা ও আসামে মুসলিম প্রধান অঞ্চলে এ নিয়ে তুলকালাম হয়েছিল। লেখককে কাফের ও স্ত্রী–তালাকের ফতোয়া দেওয়া হয়। মামলা-মোকদ্দমা পরিণামে এবং হয়ত আরও কিছু কারণে মোশারফ নিজের সমাজ–বৃত্তে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলন। এরপর যা তিনি রচনা করেছিলেন সেগুলোকে স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারাতেই অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

নারীমুক্তির অদম্য আকাঙ্খায় বিশ শতকের প্রথম দশকে কলকাতায় ও বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের। যৌক্তিকতা ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি উন্মোচিত করতে থাকেন নারী সম্পর্কে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টির অযথার্থতাকে। নারী যোগ্য, কি অযোগ্য, তা প্রমাণের কোনো সুযোগ কি তাকে কখনো দেওয়া হয়েছে? ফলে এতদিনকার যা নিয়ম, তা–ই দেখা গেল পুরুষের কলমে। বলা হলো সমাজের উন্নতি করা আর তাকে চালানো কি এক কথা? তবে স্বীকারও কিন্তু করা হলো সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশে নারীরাও এগিয়ে আসা দরকার। এদের সংখ্যা তখন নগণ্য, কিন্তু মনোভাবের পরিবর্তনটা সত্য। রোকেয়া উপলব্ধি করলেন, তাঁর মূল লক্ষ্য – মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা – বাস্তবায়িত করতে হলে সমাজের সঙ্গে আপোষ না করে উপায় নেই। লক্ষ্য সফল হলে তখন একজন রোকেয়ার স্থলে বহু রোকেয়ার জন্ম হবে। ফলে কলম নিয়ন্ত্রিত করতে হলো। রোকেয়া নিঃসন্দেহে তীক্ষ্ণ দূরদর্শী।

১৯১১ সালে কলকাতায় দুটো ঘটনা ঘটে। যা বাঙালি মুসলমানের জীবনে মাইলফলকের মতো – সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থাপন। সমিতি মুসলমানদের প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। তখনকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূলধারায় প্রবাহিত থেকেই স্বসমাজের জাগরণ ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনবোধ থেকে স্বতন্ত্রভাবে এই সংগঠনটি গড়েছিলেন। মধ্য বয়স থেকে তাজা যুবক – নানা বয়সী ব্যক্তি এর জন্ম ও পুষ্টিদানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর সঙ্গে ভবিষ্যতে যুক্ত হবেন এবং ইতিহাসের সবে খোঁয়ারি ভাঙতে শুরু করেছে তাকে কম–বেশি ধাক্কা মেরে জাগিয়ে তুলবেন, সেই সব কুশীলব তখন বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন এস ওয়াজেদ আলি (১৮৯০–১৯৫১), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬–১৯৫৪), আবুল হোসেন (১৮৯৬–১৯৩৮), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪–১৯৭০), কাজী

মোতাহার হোসেন (১৮৯৭–১৯৮১), আবুল কালাম শামসুদ্দিন (১৮৯৭–১৯৭৮), গোলাম মুস্তাফা (১৮৯৭–১৯৬৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬), আবুল ফজল (১৯০৩–১৯৮৩), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩–১৯৫৬), আবদুল কাদির (১৯০৬–১৯৮৪), আবুল মনসুর আহমেদ (১৮৯৮–১৯৭৯) প্রমুখ। এঁদের অনেকের চিন্তাচর্চা ও তা প্রকাশের সহযোগী হিসেবে যে নামটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, তিনি মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন (১৮৮৮–১৯৯৪)।

বাঙালি মুসলমানের সম্পাদনায় ১৯১৮ সালে দুটি উচ্চাঙ্গের বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একটি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র ত্রৈমাসিক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য–পত্রিকা ও অন্যটি নাসিরুদ্দীনের মাসিক সওগাত। এর আগে স্বল্পস্থায়ী নবনূর (১৯০৩) ছাড়া এতটা মানসম্পন্ন সাহিত্য পত্রিকা দেখা যায়নি। সাহিত্য সমিতিকে নানাবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে এগোতে হচ্ছিল। তার প্রমাণ রয়েছে সমিতির একটি মুখপাত্র প্রকাশ করতে প্রায় আট বছর (১৯১১–১৮) অপেক্ষা করার মধ্যে। পত্রিকাটিও তেমন বেশি সময় স্থায়ী হতে পারেনি। সওগাত–এর অবস্থাও ছিল প্রায় অনুরূপ। ১৯২৬ সালে নবপর্যায়ের সওগাত যে–পাঠকসমাদর পেয়েছিল প্রথম পর্যায়ে তা পাওয়া যায়নি। তার একটা কারণ অন্তত এই যে যাদের ধারালো নব্যচিন্তা ও সাহিত্যসৃষ্টি পাঠক্রমে আকৃষ্ট করেছিল তাদের বয়স সে সময় মোটামুটি ভাবেও পরিণত হয়নি এবং তাদের মধ্যে একাধিক জন তখনো কলকাতায় যাননি। তবুও সমিতি–পত্রিকা ও প্রথম পর্যায়ের সওগাত বাঙালি বিদ্বজনদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯২৬ সাল বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ইতিহাসে আরেকটি মাইল ফলক উজ্জ্বল ও কালান্তরের চিহ্নবাহী। কলকাতায় নবপর্যায়ে সওগাত ও 'সওগাত সাহিত্য মজলিস'–কে কেন্দ্র করে আর ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সংগঠনের মাধ্যমে কল্যাণ– পিপাসু মুসলিম তরুণদের প্রাণ–চঞ্চল অভিযাত্রা। এই অভিযাত্রার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেছে আগেই – কলকাতা ও ঢাকা দু'জায়গাতেই। তবে ঢাকা অপেক্ষাকৃত বেশি নজর কাড়ে, অন্তত দুটি কারণে। কলকাতা ততদিনে রাজধানীর গৌরব হারালেও সারা ব্রিটিশ–ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয়; নব্যচিন্তার ধারক-বাহক ও সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান। অন্যদিকে ঢাকা একটি প্রান্তীয় শহর – একরকম অবহেলিত ও জৌলুসহীন। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি সবে তাকে জাতে তুলতে শুরু করেছে। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাকে কেন্দ্র করে যেসব স্বপ্ন

দেখতে লেগেছে। সেই স্বপ্ন অধ্যাপকদের চোখেও। সকলেই স্বসমাজের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতের মধ্যে বছর তিরিশেক বয়সী আবুল হুসেনের চরিত্র উদ্যম ও সংগঠনী শক্তির একটা সম্মেলন ঘটেছিল। সাহিত্য-সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু হওয়ার আগের বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সংগঠন 'আল-মামুন ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার অদ্যাবধি সর্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক তথা খলিফা আল-মামুনের নামে ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য খুব সহজে অনুধাবন করা যায়। একই বছরের জুনে তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত তরুণ পল নামাঙ্কিত পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে ক্লাব ও পত্রিকা দুয়েরই চারিত্র্য উপলব্ধি করা যায়। সম্পাদকীয়তে বলা হয় : 'মানুষের যথার্থ কল্যাণ হয় জ্ঞানে। কেহ কেহ বলিবেন ধর্ম। কিন্তু জ্ঞানহীন ধর্ম অর্থবিহীন। সুতরাং বলিব, মানুষের মুক্তি হয় জ্ঞানে।' এ কেবল তরুণ পত্র বা আবুল হুসেনের কথা নয়, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনেরও মর্মবাণী। সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক মুখপত্র শিখা-র প্রতিটি সংখ্যায় মুখবাণী হিসেবে মুদ্রিত হতো এই কথাগুলো : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। উক্তিটির পরম্পরা লক্ষণীয় : জ্ঞান→বুদ্ধি→মুক্তি। অর্থাৎ সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে জ্ঞানচর্চায়। জ্ঞানই শক্তি।

সম্পাদক হিসেবে অন্যের নাম থাকলেও মূলত আবুল হুসেনেরই উদ্যোগে ও অর্থায়নে কাছাকাছি সময়ে অভিযান ও জাগরণ নামে আরও দুটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল। সবগুলো পত্রিকাই ছিল স্বল্পস্থায়ী কিন্তু খুবই দ্যুতিময়। উল্লেখ্য যে কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের যে-সব লেখা ঢাকা ও কলকাতার রক্ষণশীল মুসলমানদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল ও সে কারণে তাঁদের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল সে-সব লেখা অভিযান ও জাগরণ-এ মুদ্রিত হয়েছিল। তরুণ পত্র সহ এ দুটি পত্রিকাও ছিল শিখা-র সহযোগী।

কলকাতার সওগাত-ও ছিল প্রগতির ধ্বজাবাহী। শিখা-র যে জীবনদর্শন উদ্ভাসিত তার সঙ্গে সওগাত-এর গৃহীত নীতির মৌলিক কোনো পার্থক্য ছিল না, যদিও এতে ঢাকার তরুণদের মতো 'গরম গরম' লেখার প্রকাশ দেখা যায় না। নব্যচিন্তায় উৎসাহী যে-সকল তরুণ অন্য পত্রিকায় কাজ করতেন কিন্তু সেখানে তাদের অন্তরের কথা প্রকাশের সুযোগ ছিল না, তাঁরাও সন্ধ্যায় নিজেদের চাকরিগত দায়িত্ব সেরে সওগাত সাহিত্য মজলিসের আড্ডায় যোগ দিতেন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আয়নুল হক, হবীবুল্লাহ বাহার, কাজী নজরুল

ইসলাম, আবুল মনসুর আহমেদ প্রমুখ সাংবাদিক ও অন্য যাঁরা আসতেন তাঁরা সকলেই দৈন্যগ্রস্ত নিজেদের সম্প্রদায়ের মুক্তির আকাঙ্খায় উদগ্রীব ছিলেন। আবুল মনসুর আহমেদ লিখেছেন, '.... প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত পর্যন্ত যে কাজটি হইত, সেটা ছিল মুসলিম সমাজ সম্পর্কে বিপ্লবী চিন্তার আদান-প্রদান।' তাঁর লেখা থেকে আরও জানা যাচ্ছে তাঁদের মাথায় তখন এত চিন্তা 'গজগজ' করছে যে সম্পাদক নাসিরউদ্দীন তাঁদের জন্য সাপ্তাহিক সওগত প্রকাশ করলেন – মুসলিম-সম্পাদিত প্রথম সচিত্র সাপ্তাহিক।

মাসিক সওগাত-এর কথা অনেকের জানা থাকলেও সাপ্তাহিক খবর খুব কম লোক জানেন। মাসিকেরই পরিপূরক এটি, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে – বিশেষত প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্বজনিত ঘটনাচিত্র ধারণে সাপ্তাহিকটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৮ সালের ১১ মে প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ঘটে। অচিরে পত্রিকাটি এতোখানি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে প্রকাশের দিন অফিসের সামনে হকারদের ভিড় লেগে যেত।

১৯২৭ সালে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকারও প্রগতির ধারায় একটা ভূমিকা আছে। চরিত্র বিচারে পত্রিকাটি ছিল মধ্যপন্থী। মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য ইসলামের সঙ্গে আধুনিক পন্থার সমন্বয় সাধনকে তিনি বাঞ্ছিত ও সঠিক পথ বলে মনে করেন। প্রথম সংখ্যার 'আত্মনিবেদন'-এ ধর্মপন্থীদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন – 'দ্বার খোল!', আর আধুনিকপন্থীদের বলেন – 'চোখ মেলো!'

আকরাম খাঁ উপলব্ধি করেন একশ্রেণির শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মাওলানা-মৌলবির (সওগাত-এ এদের বলা হতো মোল্লা) গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা থেকে ইসলামকে বিচার-বুদ্ধির আলোয় না আনতে পারলে সমাজকে গতিশীল করা যাবে না। দেশ-কালের পরিবর্তিত অবস্থাকে তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মওলানার চেয়ে তাঁর পড়াশোনাও ব্যাপক ছিল। এর ফলে মোহাম্মদী-তে 'সমস্যা ও সমাধান' নামে ধারাবাহিক ভাবে ব্যাঙ্কিং সুদ, ছবি আঁকা, গান গাওয়া ইত্যাদি যে ইসলামে 'নাজাএজ' নয়, তা প্রচুর যুক্তি-প্রমাণ সহযোগে প্রতিপন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। নবি মুহম্মদ (সা.)-এর জীবনের সঙ্গে যুক্ত অলৌকিক ঘটনাবলিকে যুক্তি-বিচারের আলোকে যথাসম্ভব পরিহার করে লেখা মোস্তফা চরিত ওই একই মনোভঙ্গিজাত। এ সবের ফলে অন্ধ গোঁড়াদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটেছে। তাঁর

বিরুদ্ধে বহু বিষোদগার করা হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ তাঁকে 'কাফের' আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হননি।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে সওগাত ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের লেখকেরাও আকরম খাঁর মতোই ইসলাম ধর্মকে বিচার-বুদ্ধির আলোয় দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁরাও মনে করতেন এ না হলে মুসলমান সমাজকে গতিশীল করা যাবে না। সওগাত-এ এমন একটি লেখা খুঁজে পাওয়া যাবে না যাতে ইসলামের প্রতি বিরূপতা আছে। শিখা গোষ্ঠীর লেখকরাও ধর্ম-বিরোধী ছিলেন না। তবে তাঁদের কারো কোন কোন লেখায় ঝাঁঝ একটু বেশি প্রকাশ পেয়েছে। এ হয়ত অস্বাভাবিক ছিল না। যেহেতু তাঁরা ছিলেন খোলাচোখ, সেহেতু নগ্ন-বাস্তবতার প্রতি চোখ ঠারেননি। আবুল ফজল লিখেছেন প্রায় সর্বাংশে পতিত নিজেদের সমাজের দুঃখ ও লজ্জাজনক চালচিত্র তাঁদের মনে এতটা ক্ষোভের জন্ম দিত যে সে কারণে তাঁদের হয়তো না চটে উপায় ছিল না। উদার দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে তাঁরাও কল্যাণকামী ছিলেন। তবে একথা সত্য যে ধর্মের বাহ্যিক আচরণের চেয়ে তার মর্মার্থের প্রতি তাঁরা অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন।

মুসলমান সমাজের বৃহদাংশের এ এক গেরো যে গোঁড়াদের কাছে সমশ্চয়পন্থা ইসলামী-বিচ্যুতি, আবার সমন্বয়বাদীদের কাছে আধুনিকপন্থা ইসলাম-দ্রোহ। অর্থাৎ আধুনিকতা গোঁড়া ও সমন্বয়পন্থী দুই শ্রেণির কাছেই শত্রুভাবাপন্ন। এ জায়গায় এরা একাট্টা। বাংলার মুসলমান সমাজেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেজন্য গোঁড়াদের দৃষ্টিতে আকরম খাঁ কাফের, আবার গোঁড়া ও আকরম খাঁ তথা মোহাম্মদী-র কাছে 'সওগাতী দল' ও 'শিখাপন্থী'রা (মোহাম্মামী-র দেওয়া নাম) কাফের, মুরতাজ, ইবলিশ ইত্যাদি। মোহাম্মদী গর্বের সঙ্গে ইসলাম-প্রদত্ত নারী-অধিকারের ফিরিস্তি দিতে পারে, কিন্তু সওগাত-এর মতো 'নারী না জাগনে জাতি জাগবে না' এই বাণী লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। কিংবা মেয়েদের ছবিসহ বিশেষ নারী সংখ্যাও (ভাদ্র ১৩৩৬) প্রকাশ করতে পারে না। কেবল এ-ই নয়, উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ড গমন উপলক্ষে সওগাত অফিসে আয়োজিত ফজিলতুন নেসার সংবর্ধনা- অনুষ্ঠান বানচাল করতে নাসির উদ্দীনের ওপর লেলিয়ে দিয়ে আহত করা এবং তাঁর নামে চরিত্রহননকারী বাজে খবর প্রকাশ করতেও মোহাম্মদী-র বাধেনি। এসব বিবেচনায়, আনিসুজ্জামান যেমন বলেছেন, এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় থাকে না যে '...প্রাচীনপন্থীদের তুলনায় মওলানা আকরাম খাঁর ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল; আর আধুনিকদের তুলনায় তিনি ছিলেন রক্ষণশীল।'

এনামুল হকের মন্তব্যের দিকে এবার ফিরে তাকানো যাক। বাংলার বাইরে ভারতের অন্য অঞ্চল ও বিদেশ থেকে যে সকল মুসলমান এ দেশে থিতু হয়েছিলেন তাদের বংশধররা দু-তিন পুরুষে বাঙালি বনে গিয়েছিলেন বলে যে মত তিনি প্রকাশ করেছেন তাকে আংশিক সত্য না বলে উপায় নেই। তাঁর মত পুরো সত্য হলে বাঙালি মুসলমানের একটা অংশ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের (Cultural identity) সংকটে ভুগত না। বাংলার অন্নে প্রতিপালিত ও তার ভূমিতে বসবাস করে আরব-ইরান-তুরানের স্বপ্ন দেখা, মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও তাকে স্বীকার না করা বা করলেও তাকে পুরোদস্তুর 'মুসলমানি' রূপ দেওয়া, সন্তানের নামকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাকে কোন সমস্যায় ভুগতে হতো না। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় স্ববিরোধ। কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত সৈয়দ ইসমাইল হোসেন মিরাজীর মতো জাতীয়তাবাদী লেখককে বলতে শোনা যায় কোমল বাংলা ভাষাকে 'উর্দ্দুর তাজি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার' করিয়ে 'বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ট' করার আবশ্যকতার কথা। মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে নিঃসংশয় ও সুদৃঢ় রায় ঘোষণা করেও আকরম খাঁ তাকে বাঙালি মুসলমানের, 'জাতীয়' ভাষা বলতে নারাজ। কেননা মুসলমানের জাতীয় ভাষা তাঁর মতে আরবি এবং সত্য ভুলে যাওয়া হবে মুসলমানের জন্য সমূহ সর্বনাশের। সেদিনও যেমন, তেমনি আজও বহু বাঙালি মুসলমানের কাছে সন্তানের বাংলা শব্দে নামকরণ হিন্দু নাম বলে বিবেচিত। এমনকি বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি বা ফারসি শব্দ। মিলিয়ে নামকরণেও তাদের আপত্তি। সন্দেহ নেই এরা ধর্মীয় ভাবাবেগ দ্বারা চালিত বলে নিজের দেশ ও ভাষাগত জাতিত্ব-চেতনাকে গুরুত্ব দেয় না।

একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে মোশাররফ হোসেন থেকে শুরু করে ইতিহাসের ঘুম-ভাঙানিয়া নেতা-কর্মী লেখকদের বেশির ভাগেরই পদবি বিদেশি। এদের মধ্যে 'কাজী' পদবি নয়, পদ; কিন্তু পরবর্তী কালে পদবি। এই পদ বহিরাগত মুসলমানেরাই পেতেন। আবুল হুসেনের পদবি সৈয়দ, যদিও তিনি তা ছেটে ফেলেছিলেন। মোতাহের হোসেন আগে নাম লিখতেন সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী। বাংলা চালচিত্র-খ্যাত আবদুল জব্বার তাঁকে লিখেছিলেন তিনি সৈয়দ হলে চৌধুরী হন কী করে? এর পর থেকে মোতাহের হোসেন বিদেশি সৈয়দ বর্জন করে দেশীয় চৌধুরী পদবি কেবল ব্যবহার করতেন। তাহলে কি এই সিদ্ধান্তে যেতে হবে যে আমাদের এই বিশিষ্ট লেখকেরা সবাই যদি নাও হন, তবুও অধিকাংশ বহিরাগত মুসলমানের বংশধর? বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই, কিন্তু মানতেই হয় যে এঁদের অধিকাংশই বহিরাগতদের অধস্তন।

ইতিহাসের ঘুম-ভাঙ্গা বলতে এই আলোচনায় যা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, তার শ্রেষ্ঠ কুশলবরা তাঁদের আগের প্রজন্মের লেখক বুদ্ধিজীবীদের মতো সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের সংকটে ভোগেননি। তাঁরা ধর্মীয় ভাবাবেগে দ্বারাও চালিত হননি, প্রায় সর্বত্র আশ্রয় করেছেন যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধিকে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে কী করে এটা সম্ভব হলো? আমাদের বিচারের একটা বড় কারণ এই যে এঁরা প্রায় সবাই আধুনিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং রেনেসাঁসের প্রাণ-চেতনায় উজ্জীবিত। এঁদের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসেননি বটে, কিন্তু নিজেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসের ঘুম ভাঙাতে এঁরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এ. এফ. পোলার্ডের বিখ্যাত উক্তিটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে : 'Where you had no middle class, you had no renaissance and reformation.' বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আগে-পরের জাগরনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

জীবনকে এখন, জাগরণপর্বের মুসলিম লেখকেরা, বাস্তবতার নিরিখে কীভাবে খোলাচোখে দেখতে চাইলেন তা আগের আলোচনার কিছুটা সূত্র ধরে কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে।

প্রথমে রহস্য-সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলা যাক। আগে দেখেছি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা উপন্যাস, নাটক ও কবিতা লেখার বিরোধিতা করেছেন। সমন্বয় পন্থীরা যুক্তি দেখিয়ে বললেন উপন্যাস রচনার মাধ্যমে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ ও রাশিয়া অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সুতরাং সমাজ-গতির প্রয়োজনে উপন্যাস লেখা দরকার। এমন কথাও বলা হলো যে ধর্মের বিধান অভিনয়ের বিরুদ্ধে থাকতে পারে, কিন্তু সমাজের উন্নতির স্বার্থে অভিনয় করা দরকার। আবুল ফজল 'পর্দাপ্রথার সাহিত্যিক অসুবিধা' শীর্ষক এক অচিন্তপূর্ব প্রবন্ধে বললেন মেয়েদের যদি ঘেরাটোপের বন্দি করে রাখা হয় তাহলে নারী-বর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহিত্য রচনা সম্ভব হবে কী করে? বাদ গেল না ভাষাপ্রসঙ্গও। সমন্বয় পন্থীরা আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের অযথা ব্যবহারের বিরোধিতা করলেন। সাহিত্য সৃষ্টিতে ভিন্ন ভাষার শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রয়োজনে তাহাতেও আপত্তি নাই, নিষ্প্রয়োজনে আপত্তি' তত্ত্বের অনুসারী অর্থাৎ উপযোগিতাবাদী।

শিল্পসৃষ্টির মানুষের যে সহজাত আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা এবং আনন্দময় জীবন যাপনের অন্যতম মাধ্যম, মুসলমান সমাজে প্রায় সার্বিকভাবে তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা। বাঙালি মুসলমান সমাজেও একই চিত্র। এখনো তা দুর্লক্ষ নয়। ইতিহাসের ঘুমভাঙার আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ'। 'নিষেধের বিড়ম্বনা',

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'আদেশপন্থী ও অনুপ্রেরণাপন্থী', কাজী মোতাহার হোসেনের 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' প্রভৃতি প্রবন্ধে এই নিষেধাজ্ঞার ফলাফল নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে আলোচনা করা হতে লাগল। খুব স্বল্পমাত্রায় হলেও সমাজে গান-বাজনা, চিত্রকলাচর্চাসহ অন্যান্য কলাবিদ্যার অনুশীলন হতে লাগল। চলচ্চিত্রকে কেবল শিল্প হিসেবে নয়, ব্যবসায়ের একটা মাধ্যম হিসেবেও কেউ কেউ বিবেচনা করলেন। অর্থনৈতিক ভিত্তি রচনার জন্য সৎভাবে যে-কোনো পেশা বা কর্মোদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলো। কাজী ইমদাদুল হকের আব্দুল্লাহ উপন্যাসের জনৈক পিরের উক্তি – 'দুনিয়াদারি সামলাতছে হাম লোগ ফারেগ রহনা চাহাতে হ্যায়' – গুরুত্ব হারিয়ে দুনিয়ার উপর দৃষ্টি নিপতিত হতে লাগল। এমন হলে একটা সমাজের গতিহীন চাকা কীভাবে গতিপ্রাপ্ত হতে পারে, ওই উপন্যাসে তার ঐতিহাসিক চালচিত্র চমৎকার বাস্তবতায় বিধৃত আছে।

খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি বাঙালি মুসলমানের সমাজে ইতিহাসের ঘুমভাঙার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে প্রায় একই কালে, বাংলার দুই প্রধান শহর কলকাতা ঢাকা উভয়ত। এই প্রক্রিয়া দু'জায়গাতেই সবচেয়ে বেশি গতিপ্রাপ্ত হতে থেকেছে ১৯২৬ সাল থেকে। হতে পারে দিনটি কাকতলীয়, কিন্তু এও বিবেচ্য যে সময়ের জাগরণী গান অন্তত শিক্ষিত শহরবাসীর শ্রুতিতে একই বা কাছাকাছি কালে ধ্বনিত হয়।

সিজার বাগচীর মুখোমুখি : প্রসঙ্গ নলিনী বেরা

মুখোমুখি : উজ্জ্বল প্রামাণিক

সম্প্রতি 'আনন্দ পুরষ্কার' প্রাপ্ত কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরা(১৯৫২-) বাংলা সাহিত্যে আজ বহু চর্চিত একটি নাম। তাঁর ১৫টির বেশি উপন্যাস, ১৫০টির কাছাকাছি গল্প নিয়ে প্রায় ৭খানা গল্পগ্রন্থ এবং বেশ কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গুলি মধ্যে হল-'শবরচরিত', 'অমৃত কলস যাত্রা', 'ভৌত খামার', 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' প্রমুখ। আশির দশক থেকেই তিনি বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম নাম। ২০০৮ সালে 'শবরচরিত' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'বঙ্কিম স্মৃতি সাহিত্য পুরুস্কার' দেন। নলিনী বেরার লেখায় উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশার সীমান্তবর্তী সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী জনপদ। আজ নানান পরিবর্তনের পরেও তিনি স্বজন-স্বভূমিকে ত্যাগ করেননি। ২০১৯ সালে 'আনন্দ' পুরুস্কার নেওয়ার সময় তিনি সগর্বে ঘোষণা করেন-'এই পুরুষ্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে আমারই চর্চিত সেই সমস্ত অন্ত্যজ, অপাঙক্তেয় ও তথাকথিত 'সাবলর্টান' মানুষদেরই যেন জয়যুক্ত করা হল।...আমার নয়,এ জয় তাদেরই।'

এই ব্রাত্যজন-সখা নলিনী বেরা প্রসঙ্গে সমকালীন অনুজ কথাকার সিজার বাগচীর মুখোমুখি হই গত ১০ শে মে সন্ধ্যায়। এই লকডাউনেও মুঠো ফোনের মাধ্যমে আমি নলিনী বেরা সম্পর্কে অনিঃশেষ কৌতূহল নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। উনি ছোট ভাইয়ের এই আর্জিটুকু রেখে ছিলেন।

সাহিত্যিক সিজার বাগচী(১৯৭৭-) সম্পর্কে যতই বলি ততই কম বলা হয়। তিনি অত্যন্ত সুন্দর মনের মানুষ। জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে তিনি বড় কাছ থেকেই দেখেছিলেন। সাহিত্য সংস্কৃতি মনস্ক পরিবারে জন্ম সুবাদে খুবই অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ। ফিচার, গল্প, উপন্যাস, চিত্রনাট্য প্রভৃতি

সাহিত্যের ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ আমাদের চোখে পড়ে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস গুলি হল- 'ভালোবাসার আলো', 'পুতুলখেলা', 'দু'জনের মুখোমুখি', 'পাঁচফোড়োন', 'মোহ' প্রভৃতি। সহজ সরল ভাষায় লেখা তাঁর ভিন্ন গল্প-উপন্যাসে উঠে আসে রোজকারের জীবন যাত্রা। বড়দের পাশাপাশি তিনি ছোটদেড় জন্যেও লিখেছেন। সাংবাদিকতার পেশায় দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন তিনি। বর্তমানে 'আনন্দমেলায়' পত্রিকায় তিনি মুখ্য ভূমিকায় কাজ করেন। লোকসাহিত্যের নান চর্চায় তিনি বিশেষ অনুরাগীও বটেন।

তাঁর কাছে নলিনী বেরার সাহিত্যের বিষয় ও রীতি নিয়ে বেশকিছু কৌতূহল উপস্থাপন করি। নিম্নে সেই সাক্ষাৎ পর্বটি তুলেধরার চেষ্টা করলাম---

কথক: আপনি তো কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরার পরবর্তী দশকের লেখক। এই সময়পর্বে যে ধরনের লেখালেখি হচ্ছে সেখানে বিশ্বায়নের ছাপ, প্রযুক্তির ছোঁয়া বেশি করে পাই। সেক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নলিনী বাবুর লেখা কতখানি প্রাসঙ্গিক বলে আপনার মনে হয় ?

লেখক: আজকের সময়েও নলিলী বেরার লেখা প্রাসঙ্গিক তো অবশ্যয়। তাঁর লেখার নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে-

প্রথমত, নলিনী বেরা এমন একটা সময় বা এমন একটা অঞ্চল নিয়ে মুখ্যত লিখে থাকেন যে অঞ্চলটা খুব একটা বাংলা সাহিত্যে আসেনেই। সুবর্ণরেখা তীরবর্তী জঙ্গলমহলের প্রান্তিক মানুষদের তিনি যে ভাবে দেখেছেন ঠিক সেই ভাবেই তুলে ধরেছেন তাঁর ভিন্ন গল্প উপন্যাসে। তাদের যে নিজস্ব আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং তাদের কথাবার্তার নিজস্ব শব্দকে, তাদের রোজকার জীবনকে তিনি যেভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন- এটাই উনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ এত সফল ভাবে করেছেন বলে আমার মনে হয় না।

দ্বিতীয়ত, যে কোন লেখককে আমি দুটো ভাগে ভাগ করি। হয় ভালো, নয় খারাপ। আপাত ভাবে বা অ্যাকাডেমিক ভাবে হয়তো দেখানো হয় -এটা আঞ্চলিক উপন্যাস, এটা নাগরিক উপন্যাস। কিন্তু মুখ্যত লেখাকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করে থাকি- লেখাটা ভালো নয়তো লেখাটা খারাপ। লেখাটা পড়ে আমার মনে কিছু একটা হল। মনে হল 'বা'! আমি বইটা বন্ধ করে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। অথবা, বইটা পড়ে আমার মনে হল ধূর! এতা কি পড়লাম। এটা না পড়লেই বা কি এসে যায়। নলিনী বেরা হচ্ছেন সেই মাপের লেখক, সেই ধরণের লেখক যার লেখা পড়লে আমি কিছু পাই -তা ওনার 'শবরচরিত' হতে পারে বা 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা'ও হতে পারে।

আমার ভালো লাগে বিশেষ করে ওনার ছোটগল্পগুলো। আমি জানি না সেটা নিয়ে কতটা কাজ হচ্ছে বা আলোচনা হচ্ছে। ওনার ছোটগল্পগুলো অসামান্য। অসামান্য তিনটি কারণে--

১. যে বিষয় বা অঞ্চলকে তিনি বেছে নিয়েছেন সেই কারণে।

২. ওনার নিজস্ব ধারাল গদ্য আছে। সেটা চমৎকার গদ্য।

৩. লেখার বিষয়ও অনেকের থাকে ভাষাও অনেকের থাকে কিন্তু বিষয় ও ভাষাকে যুগল বন্দী করে একটা গল্প গল্প হয়ে উঠল কিনা সেটাও একটা বড় ফ্যাকক্টার। নলিনী বেরার গল্পগুলো শুধু যে গল্প হয়ে উঠেছে তা নয় খুব উঁচু দরের গল্প হয়ে উঠেছে। সেখানেই তাঁর অভিনবত্ব। সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। আমার মনে হয় আজকের সময়ে নলিনী বেরার লেখার প্রাসঙ্গিকতা সেইখানেই। নলিনী বেরা এমন একটি অঞ্চল বা এমন একদল মানুষের কথা বলেছেন যে মানুষের কথা বিশেষ করে আর কেউ বলেননি। এমনকি তাদের মতো করে বলা অর্থাৎ ওই লেখাটা যদি কেউ অন্যভাবে লেখার চেষ্টা করত তা হলে হয়তো ওই লেখাটার এত মাটির গন্ধ পাওয়া যেত না। নলিনী বেরা যেহেতু ওই অঞ্চল থেকে উঠে এসেছেন তাই লেখার মধ্যে ওই অঞ্চলের

ভাষাকে মিশিয়ে দিয়েছেন। আঞ্চলিক বাংলায় তিনি বারবার লিখেছেন বলে লেখাটা ওই অসামান্যতায় পৌঁছেছে।

কথক: ভার্চুয়ালিটির যুগেও লোকজীবন কোথাও যেন খুব বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। যে লোকজীবনের কথা নলিনী বেরার লেখায় বারবার ঘুরে ফিরে আসে। সত্তরের দশকে 'ফিরে চলো মাটির টানে' অর্থাৎ গ্রামকে নতুন করে দেখার যে প্রবণতা শুরু হয়েছিল আজও কি সেটা কোথাও না কোথাও গুরুত্ব পাচ্ছে বলে অপনার মনে হয়?

লেখক: যে কোন জাতির ক্ষেত্রেই সেটা বাঙালি বলো, কী রুশ বলো? কী ফরাসী বলো? তাদের যে দেশজ সংস্কৃতি থাকে (আমাদের যেমন পালাগান রয়েছে, বাউল গান রয়েছে, কথকতা রয়েছে), সেই দেশজ সংস্কৃতি যে জাতির যত strong হবে, যত জরালো হবে সেই জাতির ততই গৌরব। অর্থাৎ শিকড়টা যত গভীরে যাবে গাছটা তত উপরে উঠবে। বাংলার সেই দেশজ সংস্কৃতি বা লোক সংস্কৃতির বিস্তার বহুদূরে। আমরা বাংলার লোকগান বলতে বুঝি বাউল আর লোকনাচ বলতে বুঝি ছৌ। কিন্তু এর বাইরেও বাংলায় অন্ত্যত ৩০-৪০ প্রকারের লোকগান রয়েছে এবং অন্ত্যত ৫০ রকমের লোকনাচ আচে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, সুন্দরবন এবং উত্তরবঙ্গেও লোকগান ও লোকনাচের সংখ্যাটা কম নয়। এমনকি হাওড়ার মতো জায়গা যাকে আমরা বাইরে থেকে অনেক ঝাঁ চকচকে ভাবি সেখানেও কালিকাপাতারির মতো লোকনাচ রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যক অঞ্চলেরই নিজস্ব লোকজ উপাদান রয়েছে। ফলে লোক সংস্কৃতি যে কোন একটা সময়ে উঠে এসেছে তেমনটা কিন্তু নয়। যেমন ছোটগল্পের সংজ্ঞা যুগে যুগে পাল্টেছে। রবীন্দ্রনাথের আমলে ছোটগল্প বলতে যা বুঝতাম আজকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলে এসে সেই ছোটগল্পের সংজ্ঞা অনেকটাই পাল্টে গেছে। ঠিক সেইরকম লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞাও যুগে যুগে পাল্টেছে। আমেরিকার যারা ফোকলোরিস্ট রয়েছে তাদের উদাহরণ টানলে দেখা যায় তদের মতে- যে কোন সম্প্রদায়ের যদি কোন মানুষ একই জায়গায় থাকে তাহলে তাদের একই ভাষা হয়, একই সংস্কৃতি হয়, তাহলে সেটাই 'লোক'।

তাহলে পুরুলিয়ার একই সংস্কৃতিতে বসবাসকারীরা যেমন 'লোক' ঠিক তেমনি কলকাতায় যারা একই সংস্কৃতিতে আছে তারাও লোকের মধ্যেই পরে। যার ফলে 'ফিরে চল মাটির টানে' অর্থাৎ লোক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান যে ঠিক ঐ সময় থেকেই শুরু হয়েছিল তা নয়, চিরকালেই ছিল। তারাশঙ্করের লেখার মধ্যে যেমন প্রচুর লোকজ উপাদান পেয়েছি, সমরেশ বসুর লেখায় পেয়েছি আবার একই ভাবে নলিনী বেরার লেখাতেও সেই লোকজ উপাদান পাচ্ছি। সাহিত্যে প্রতিমহূর্তে এই কাজটা সমান্তরাল ভাবেই হয়ে এসেছে। এখন আলাদা করে হচ্ছে বলেও আমার মনে হয় না। তবে বিশ্বায়নের চাপে আমাদের লোক সংস্কৃতির ভিন্ন ধারা কিন্তু মরে যাচ্ছে। যারা বিশ্বায়নের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে তারা টিকে যাচ্ছে। যেমন বাউল পেরেছে, ছৌ পেরেছে। কিন্তু যারা পারে নি তারা ক্রমশ বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে।

কথক: নলিনী বেরার গল্প উপন্যাস পড়ে মনে হয়েছে ওনার বেশির ভাগ লেখাই আত্মজৈবনিক মূলক। তাঁর আত্মজীবনের কথায় বারবার উঠে এসেছে। সাহিত্যেরক্ষেত্রে এই আত্মজীবনী লেখা উঁচুদরের কিনা এই নিয়ে সমালোচকদের নানা মতভেদ রয়েছে? আপনার কী মনে হয় এ ব্যাপারে?

লেখক: এই নিয়ে কোন বিতর্ক থাকা উচিত নয়। 'পথের পাঁচালী' আত্মজীবনীমূলক লেখা। অনেকটাই বিভূতিভূষণের নিজের জীবন মিশে আছে 'পথের পাঁচালী'তে। আমি যদি অন্য উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও দেখি, যেমন- 'ঘরে বাইরে'। 'ঘরে বাইরে' রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক লেখা নয়। তিনি একটি সময়কে বেঁধেছেন, সেই সময়ের তিনটি প্রধান চরিত্রকে আমরা সেখানে পড়ি, যাদের আত্মকথাকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। প্রত্যকে কিন্তু এক একটা সময়ের এক একটা ইজম বা এক একটা দিকের প্রতিরূপ হয়ে দেখা দেয় আমাদের কাছে। সেটা আত্মজীবনীমূলক লেখা নয়। কবি যা দেখেছেন সেটাই লিখেছেন। তাহলে কি আমরা বলব 'ঘরে বাইরে' উঁচু দরের লেখা আর 'পথের পাঁচালী' লেখাউঁচু দরের নয়? দিনের শেষে আত্মজীবনী হল কি হল না সেটা বড় কথা নয়। জেমস জায়েসের 'ইউলিসিস', আর্নেস্ট

হেমিংওয়ের 'ফর হোম দ্য বেল টোলস' -এগুলির সবকটাই আত্মজীবনীমূলক লেখা। তাই, আত্মজীবনীমূলক লেখা হলো কি হলো না তার চেয়ে বড় কথা হলো লেখাটা ভালো কি খারাপ? হয় লেখাটা আমার ভালো লাগছে, লেখাটা আমাকে কিছু দিচ্ছে, আমি সমৃদ্ধ হচ্ছি বা লেখাটা আমার ভালো লাগছে না। সেটা আত্মজীবনীমূলক হলো তো হলো, না হলো তো না হলো। তাতে কিছু এসে যায় না। অন্ত্যত আমার তাই মনে হয়।

কথক: নলিনী বেরার গল্প উপন্যাসে দেখেছি একই বিষয় নিয়ে তিনি একবার গল্প লিখেছেন আবার সেটাকেই উপন্যাস করে তুলেছেন। যেমন-'মাটির মৃদঙ্গ' গল্প লিখেছেন আবার 'মাটির মৃদঙ্গ' উপন্যাসও লিখেছেন। গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে একই রকম হয়ে যায়। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটলে আজকের পাঠকের কাছে তা কতটা গ্রহনযোগ্য হয়য় বলে আপনার মনে হয়?

লেখক: আসলে পাঠক মানে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি নয়। পাঠকের অনেক ধরন আছে। পাঠকের অনেক গ্রেড আছে। তুমি আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছে। তুমি এক ধরণের পাঠক। আবার তোমার বাড়িতে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে চাকরিবাকরি চেষ্টা করছে সেও বই পড়ে, ধরা যাক দক্ষিণ কলকাতার একটি ছেলে ফিজিক্সে অনর্স করে সেও বই পড়ছে। এই তিনটি পাঠক আলাদা আলাদা জায়গার লোক, আলাদা আলাদা মানুষ। এই তিনটি পাঠকের কিন্তু পাঠ্যাভাসটা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। ধরা যাক ওই দক্ষিণ কলকাতার ছেলেটা অনেক বেশী সুচিত্রা ভট্টাচার্য পড়তে ভালোবাসে আবার তোমার নলিনী বেরা পড়তে ভালো লাগছে , আবার তোমার ছোট ভাইয়ের মতো ছেলেটি যে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে তার প্রচেত গুপ্ত ভালো লাগছে। অর্থাৎ পাঠক মানে নির্দিষ্ট কিছু নয়, পাঠক নানন রকমের হতে পারে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি কাহিনিতে এবং সিনেমাতে আমরা বহু জায়গায় পেয়েছি। এই ধরণের লেখা অনেক সাহিত্যিকের লেখাতেই পাই। আব্রেল গার্সেজ মার্কেজের গল্প উপন্যাস পড়লে দেখা যায় গল্প উপন্যাস গুলি

একই ধাঁচের। এমন বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। অনেক দিকপাল সাহিত্যিকের লেখাগুলিই একই ধাঁচের। কিছু কিছু লেখক থাকেন যাদের কাহিনি আলাদা থাকে কিন্তু ভাবনাটা একই। গল্পগুলো আলাদা

আলাদা, যেমন- একটি গল্পে পার্কে বসে ছেলে মেয়ে প্রেম করছে আবার একটি গল্প বৃদ্ধ মানুশ পেনসেনের টাকায় জীবন কাটাচ্ছে। টাকা কম কি ভাবে সে জীবনে বাঁচবে? গল্পগুলি হয়তো আলাদা আলাদা, কিন্তু লেখকের যে দর্শণ বা লেখকের যে ভাবনা সেটা এক। অর্থাৎ বৃদ্ধের কাহিনির মধ্যে দিয়েও লেখক যে কাহিনির বা দর্শণের কথা বা ভাবনার কথা বলতে চেয়েছেন প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে দিয়েও সে ভাবনার কথাই বলতে চেয়েছেন। আবার কারও কারও লেখায় কাহিনি অংশগুলি হয় খুব কাছাকাছি। যেটা তুমি নলিনী বেরার গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে বলতে চেয়েছ। একই নামের বা কাছাকাছি একই রকম গল্পের লেখার বহু উদাহরণ আছে। যারা একটু দীক্ষিত পাঠক তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় না কিন্তু যারা একটু চতুর পাঠক হয় তাদের মনে হয়-এ কি? এই গল্পগুলি তো খুব কাছাকাছি।

কথক: সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের থেকে নলিনী বেরাকে আপনি কী ভাবে আলাদা করবেন বা আপনার কাছে লেখক নলিনী বেরার স্বাতন্ত্রতা কোথায়?

লেখক: দু তিনটি কারণে আমি নলিনী বেরাকে আলাদ ভাবে দেখব। প্রথম আমি দেখব ওনার লেখার বিষয় নির্বাচনের জন্য। জঙ্গলমহল ও সুবর্ণরেখা তীরবর্তী মানুষ মূলত তাঁর লেখার বিষয়। হয়তো ওনার মতো আরও কেউ কেউ লিখে থাকবেন কিন্তু এমন নিপুণ লেখা ওনার মতো বোধ হয় আমার হয়তো চোখে পরেনি। উনি গল্পগুলি যেখান থেকে তুলে এনেছে তাতে মেধার সঙ্গে হৃদয়ের এত সুন্দর মিশিয়েছেন। সেই অঞ্চলের গন্ধ তিনি সে ভাবে তুলে এনেছেন লেখায়। আমার মনে হয় এখানেই তাঁর অভিনবত্ব, এখানেই ওনার বিশেষত্ব। দ্বিতীয় করণ, উনি খুব কুশলী গল্পকার। দিনের শেষে গল্পটা গল্প হল কি না সেটাই বড় কথা। সেটা ওনার লেখায় পাই। ওটাতো প্রবন্ধও হতে পারত। উনি খুব সুন্দর বিষয় দিয়ে প্রবন্ধও

লেখেন। ওটা গল্প হল না কি সেটাই প্রথম কথা। সে দিক থেকে উনি খুব কুশলী গল্পকার। তিনি খুব সুন্দর সুন্দর গল্প লিখেছেন।

কথক: নলিনী বেরার লেখায় একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপন আর তাদের সংস্কৃতির কথায় উঠে এসেছে। তাহলে স্যার, তাঁর সাহিত্যে কী আঞ্চলিকতাবাদ ফুটে উঠেছে?

লেখক: যে কোন লেখাতেই আঞ্চলিকতার ছাপ থাকে। কারণ, যে কোন লেখকই একটা অঞ্চল নিয়ে লেখেন। যেমন সমরেশ মজুমদার হয় কলকাতা নয়তো দক্ষিণবঙ্গ নিয়ে লিখেছেন, সতীনাথ ভাদুড়ীও লিখেছেন বিহারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে। সে ক্ষেত্রে লেখা আঞ্চলিকতাবাদ বা আঞ্চলিকতার দোষে দুষ্ট এই বিশেষণে আমার আপত্তি আছে। নলিনী বেরার সব থেকে বড় গুণই হল তিনি ঐ অঞ্চলের জায়গা থেকে সাহিত্য উপাদান তুলে এনেছেন। ওই অঞ্চলেই জন্মগ্রহন করেছেন। এতে আঞ্চলিকতা দোষ নয় বরং এটাই ওনার প্লাস পয়েন্ট। সেই অঞ্চলটাকে সাহিত্যের পরিসরে জায়গা দিয়েছেন এটাই তাঁর বিরাট গুণ। যত এইসব অঞ্চল থেকে ভালো ভালো গল্প উঠে আসবে, নতুন নতুন শব্দ উঠে আসবে সেটা বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে। শুধু নাগরিক গদ্যে যদি বাংলা লেখা হয় তাহলে যে সমস্যাটাহয় তা হল-ভাষার পরিসর কমে আসে। ভাষায় নতুন নতুন শব্দ যত আসবে , নতুন Expression যত আসবে, যত নতুন নতুন বিষয়, নতুন অঞ্চলের মানুষের কথা উঠে আসবে ততই ভাষা সমৃদ্ধ হবে। সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে।

তারিখ : ১০.০৫.২০২০